গৃহীর গাইড
দুর্গা বসু
N
CK

গৃহীর গাইড

[প্রথম খণ্ড]

শ্রীদুর্গা বসু

বি. আর্চ (১ম শ্রেণী) ; এ-আই. আই. ডি. ; এফ-আই. আই-এ. ; এল. বি. এ
(ক-শ্রেণী) ; রেজিঃ আরকিটেক্ট ও ভ্যালুয়ার ; প্রাক্তন ভিজিটিং
লেকচারার, আই. আই. টি. খড়্গপুর।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
অরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৮৯
পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৯৫

মূল্য : ২৫·০০

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার রায়
শ্রীসারদা প্রিন্টিং
৩১/১, ঘোষ লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

দীর্ঘ আট বছর ধরে যাঁর কাছে অনেক শিখেছি সেই ভারত-বিখ্যাত স্থপতি **অমিতাভ সেনগুপ্তর** হাতে তুলে দিলাম 'গৃহীর গাইড' [১ম খণ্ড]—তাঁর দেওয়া শিক্ষার প্রমাণ হিসেবে।

৭এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলকাতা-৭০০০১৩
দোল পূর্ণিমা
২০শে মার্চ, ১৯৮১

দুর্গা বসু

বিষয়-নির্দেশিকা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

প্লেট / নকশা

প্লেট ঃ

বিবেকানন্দ পল্লী, রামবাগান। সত্যব্রত রায়বর্ধনের বাড়ী, গাঙ্গুলীবাগানে। কাকা-কাকীমা জোড়া ডাক্তারের বাড়ী সল্টলেকে। বসবার ঘর। ফুলের রং ও ফোটার সময়।

নকশা ঃ

গোবিন্দ দত্তের বাড়ী, গড়িয়া, পৃ. ৫। ডঃ স্নেহলতা বসুর বাড়ী, 'পল্লবিনী', সল্টলেক, পৃ. ৮। সত্যব্রত সরকারের বাড়ী, জংগীপুর, পৃ. ১০। সত্যব্রত রায়বর্ধনের বাড়ী, পৃ. ১২। আদর্শ বাড়ীর নকশা পৃ. ২৭। অতিথির শোবার ঘর, আদর্শ নকশা অনুযায়ী, পৃ. ২৮। বাথরুমে মানুষ ঢুকছে, সদর দরজায় ঢুকছে আলমারী, পৃ. ২৯। আদর্শ নকশা ঃ কিন্তু ভুল জায়গায় দরজা জানালা বসিয়ে সব ভণ্ডুল, পৃ. ৩১। জানালার খাড়াই ঃ শোবার ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, পৃ. ৩২। মেজেনাইনের দরুন ফালতু গাঁথনী, পৃ. ৩৫। কম জায়গায় সিঁড়ির নকশা, পৃ. ৩৬। জানালার গরাদের রকমারী ডিজাইন, পৃ. ৩৭। চার ফ্ল্যাট ঃ এক-সিঁড়ি, পৃ. ৪০। সাত ভাইয়ের শোবার ঘর, পৃ. ৪২। ম্যাজিক ঃ ৬″ থেকে ১০″ বিম, পৃ. ৪৪। ঘরের দরজা-জানালায় খাড়াই, পৃ. ৫১। ঘরের পশ্চিমে বড় গাছ, পড়ন্ত রোদ আটকাবে, পৃ. ৫২। উঁচু ভিত ঃ দরমার হালকা দেয়াল, পৃ. ৫২। কানা বার করা ছাদ ঃ আয়ু বাড়াবে ৫ বছর, পৃ. ৫৩। উঁচু ভিতের দরমার ঘর, পৃ. ৫৫। পাকা দেয়াল ও ঢালাই ছাদ, পৃ. ৫৬। মাটির দেয়াল অ্যাসবেস্টসের ছাদ, পৃ. ৫৭। দুরমুশ পিটিয়ে শুকনো মাটির দেয়াল, পৃ. ৫৮। অগ্নিরোধক খড়ের চাল, পৃ. ৬০। নলকূপ পায়খানা পৃ. ৬৩। কুয়া পায়খানা, পৃ. ৬৪। গোবর সার ও সার তৈরি মেসিনের নকশা, পৃ. ৬৬। পল্লীমঙ্গল বাড়ীর নকশা, পৃ. ৬৭। নানান মাপের ভিত, পৃ. ৮০। ৩-৪-৫ এর নিয়ম, পৃ. ৮১। ১২৫ মিমি. দেয়ালে জালের ব্যবহার, পৃ. ৮৬। ২০০ মিমি. দেয়াল, পৃ. ৮৭। ইঁট সাজিয়ে লিনটেল, পৃ. ৮৯। ঢালাই লিনটেল, পৃ. ৮৯। দোতালা ঢালু চালের কাঠামো, পৃ. ৯১। কিং পোস্ট ট্রাস, পৃ. ৯২। কুইন পোস্ট ট্রাস, পৃ. ৯৩। সুরিয়া খোল, পৃ. ৯৪। বালীগঞ্জ টালী, পৃ. ৯৪। আর. বি. সি. পৃ. ৯৬। নলকূপের ৫টি ভাগ, পৃ. ১০৯। বাড়ীতে জল সরবরাহের পুরো চেন, পৃ. ১১৩। মাস্টার ট্র্যাপের গঠন, পৃ. ১১৪। অ্যাকোয়া প্রিভি, পৃ. ১১৬। সেপটিক ট্যাঙ্ক, পৃ. ১১৬, ১১৭। জলের পাইপে আর্থিং, পৃ. ১২৫। ইলেকট্রিক শকের চিকিৎসা, পৃ. ১২৬, ১২৭। ঘরের লে-আউট ঠিকভাবে ও বাঁকাভাবে, পৃ. ১৩৩। মজবুত টেবিল ঃ একপাশে ডাইস, পিছনের খোপে যন্ত্রপাতি, পৃ. ১৪৪। তাকের তলায় ঢাকনা আটকানো জার, পৃ. ১৪৫। কাঠের নানারকম জোড়াই, পৃ. ১৫১। কাঁচের সারসিতে পুটিং লাগানো, পৃ. ১৫২। সাবেক চৌকি থেকে আধুনিকীকরণ, পৃ. ১৬০। বাগানের নকশা, পৃ. ১৭২, ১৭৩, ১৭৪। লিলিপুলের গড়ন, পৃ. ১৮০। নক্শার এলবাম, ১৯৭-২০৮।

১

এই বই কেন ? কে পড়বে ?

● বিপদ ! দিগ্বিজয় বাবু বিষম বিপদে পড়েছেন !…………

মেসার্স ডেল্টা গম্ভীর কোম্পানীর ডাকসাইটে বড়বাবু দিগ্বিজয় হাজরা পৌনে উনচল্লিশ বছর বাঘ আর গরুকে একঘাটে জল খাইয়ে বাষট্টি বছর বয়সে রিটায়ার করলেন গত জানুয়ারী মাসে। সঙ্গে একাশী হাজার আটশো আঠাশ টাকা এগারো পয়সার একখানি চেক। বলতে গেলে আজীবন দারুণ দাপটে অথচ একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে চালিয়েছেন কোম্পানীর কাজ। তারই বদলা এই চেকখানা। রিটায়ারের দিন অফিসের সাথীদের দেওয়া শাল আর কোম্পানীর দেওয়া এই চেক নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তিনি ভাবছিলেন এবার কি করা যায়? হঠাৎ মনে পড়লো উত্তর বাংলার যেখানে তাঁর দেশ, সেই জঙ্গীপুর শহরে এস. ডি. ও. বাংলোর পূর্বদিকে তাঁর আটকাঠা ডাঙ্গা জমি আছে। এই থোক পাওয়া টাকাটা দিয়ে একটা খাসা বাড়ী বানাবেন সেখানে……জীবনের বাকী ক'টা দিন চিন্তাহীনভাবে ধিন্‌তা ধিন্‌তা বোলে কাটিয়ে দেবেন সে বাড়ীতেই। ছেলে রণবিজয় আলীপুর কোর্টের উকিল। জঙ্গীপুরে গিয়ে কখনো থাকবে কি ? বৌমাও চাকুরে। তায় আবার তাদের ভালবাসার বিয়ে। হাজরা মশায়ের অমতেই হয়েছে সে বিয়ে। হারামজাদারা আলাদা বাসা করেছে। ছেলের বিয়ের কথা ভাবতে গেলে হাজরা মশায়ের মনে থাকে না ছেলেকে হারামজাদা বলে গাল পাড়লে কাকে কি বলা হল। গিন্নীর মুখে শুনেছেন বৌমার বোধহয় বাচ্চা হবে। কিছুদিন বউমাকে আলাদা বাসার পাট তুলে এসে আড্ডা গাড়তে হবে শাশুড়ির কাছে। এই তো মওকা ! কান টানলে মাথাও আসে। এই বেলা জঙ্গীপুরে সট্‌কে পড়তে পারলে বাছাধনকে কিছু না হোক বউয়ের টানেও বার কয়েক কোলকাতা-জঙ্গীপুর টানাপোড়েন করতে হবে। আর যদি ভগবান মুখ তুলে চান হয়ত ছোকরার ভালও লেগে যেতে পারে জঙ্গীপুর আর সেখানকার নতুন বাড়ী। জঙ্গীপুরেও কাছারী-আদালত আছে। আর হাজার হোক, দাদাঠাকুরের দেশ। রণবিজয়ের মত তুখোড় উকিলের ভাত-কাপড়ের

অভাব হবে না। কলকাতার মত গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়ার বিপদ নেই, সেটাই কি কম কথা !

দিগ্বিজয় বাবুর যা ভাবনা, তা কাজ। জঙ্গীপুরে বাড়ীভাড়া, আসবাব পাঠানো, কোলকাতার সংসার গুটানো, চেনা-জানা মানুষের কাছে বিদায় নেওয়া—হাজার রকম ঝামেলা মেটাতে তাঁর আড়াই মাসের বেশী সময় লাগলো না। এপ্রিলের এক কাকডাকা ভোরে তিনি হাজির হলেন জঙ্গীপুরে। সঙ্গে বৌ, বৌমা তার ছোঁড়া ছাকর কন্যা। এতদিন দাপটেই চালিয়ে এলেন, কিন্তু এই বারেই হল ঝামেলা। রীতিমত আক্কেল গুড়ুম করা ঝামেলা। হাজরার পাঁজরা ঢিলে হয়ে এল। বাড়ী করবেন তিনি—কিন্তু শুরু করবেন কি করে ! বাড়ী করার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানেন না তিনি। ভেবেছিলেন…বাড়ী করবে মিস্ত্রী, টাকা যোগাবেন আর তদারক করবেন তিনি—ছাতা মাথায় দিয়ে হুঁকো খেতে খেতে। কেল্লা ফতে ! এই ভেবে মোল্লাপাড়া থেকে ধরে এনেছিলেন রহমন মিস্ত্রীকে। রহমন আবার একটু তেরিয়া মেজাজের লোক। এসেই হাঁক পাড়ল, "বাড়ী হবেক, পেলেন কোথায় ?" হাজরা মশাই জানেন বাড়ী হয় মাটিতে, 'পেলেন' ওড়ে আকাশে – এদুয়ের সম্বন্ধ কোথায় ? মনে দারুণ হোঁচট খেলেন যখন শুনলেন, 'পেলেন' বা নকশা না হলে বাড়ী হবে না। আর সেটা তৈরী করা রহমনের কর্ম নয়। ইঞ্জিনিয়ার বাবুরা ওসব করেন। ছুটতে হল কলকাতায়। শুনেছিলেন শালার ভায়েরাভাই ইঞ্জিনিয়ার—তাঁকে ধরতে। ভায়েরাভাই ট্যুরে গিয়েছিলেন। পনেরো দিন শেয়ালদার হোটেলে লঙ্কা গোলা ঝোল খেতে খেতে হাজরা মশায়ের ধাত ছাড়বার জোগাড়। তারপর ভায়েরাভাই এসে একগাল হেসে বললেন, "আমি তো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বাড়ীর নকশা আমি কি করে করবো ?" দিগ্বিজয় বাবুর তখন চোখে জল এসে গেছে। শেষে এক উপায় বাতলালেন ওই ভায়েরাভাই। তাঁর বন্ধুর বড়শালা আরকিটেক্ট। বাংলায় যাকে বলে বাস্তুবিদ। তাঁকে ধরে তৈরী করিয়ে দিলেন দিগ্বিজয় বাবুর সাধের বাড়ীর নকশা।

● নকশা বানানোর পরের 'নকশা'

হাজরা মশাই খুব গর্বের সঙ্গে নকশা তুলে দিলেন রহমনের হাতে। রহমন নকশা দেখতে দেখতে দু নম্বর হাঁক পাড়ল "ইস্টিমেট" কোথায় ?

হাজরা মশায়ের ইস্টিম প্রায় বেরিয়ে যাবার যোগাড়। যা হোক, এস্টিমেটটা পাওয়া গেল জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির ওভারশিয়ার বাবুর দয়ায়। একমাস সময় আর একশো টাকার বদলে তিনি আড়াইপাতা কি সব হিজিবিজি লিখে দিলেন যার এক বর্ণও দিগ্বিজয় হাজরার মগজে ঢুকল না। এবার রহমনের তিন নম্বর হাঁক, "সিমেন্টের জন্য দরখাস্ত করেছেন? পারমিট না পেলে সিমেন্ট যোগাড় হবে কি ভাবে? বাড়ী কি বিনা সিমেন্টেই হবে?" সিমেন্টের ঝামেলা চুকতে না চুকতেই চার নম্বর হাঁক, "লোহা? বলি কলম ঢালাই হবে কি বিনা লোহার ছড়ে?" উনচল্লিশ বছর কলম পিষেও দিগ্বিজয় বাবু জানতেন না লোহার ছড় না দিলে কলম (column) ঢালাই হয় না। আর কলম ঢালাই না হলে বাড়ী হয় না। লোহার ছড় যোগাড় করতে গিয়ে দিগ্বিজয় বাবুর টাক আরও চকচকে হয়ে উঠলো। ছেঁড়া চটি আর পামশুতে ঝুড়ি ভর্তি হয়ে উঠল। সেই ঝুড়ি বেচে গিন্নী অ্যালমনি ডেকচি কিনে ফেললেন। এদিকে রহমনের হাঁক পাড়ার কামাই নেই—"ওভারশিয়ার বাবুকে ডাকুন, লে-আউট দিয়ে যাবেক।" "একি, আমা ইট আনিয়েছেন, এতে গাথনি হবে?" "এ তো চিকন বালি—ইট পোড়ানোর কাজে লাগে।" "ঢালাই-এর তক্তা আনাননি কেন?" "বল্‌লাম একশো বাঁশ চাই, মোটে তিরিশ-খানায় কি হবে?" "পেরেক আনলেন না?" "ছড় বাঁধার তার?" "আরো দু জোড়া বেলচা চাই।" "ঝুড়ি ফেঁসে গেছে—ঝুড়ি আনান।" "মনে হচ্ছে এ সিমেন্টে ভেজাল আছে।" "আধঘন্টার মধ্যে দশ কেজি নারকেল দড়ি না হলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।" "লিস্ট দিলাম সোলিংয়ের ইট আর আপনি আনলেন এক নম্বর পিকিট?" "এ শালবল্লিতে কি ঢালাইয়ের খুঁটি হয়—এতে ঝাঁটা বাঁধুন গে যান; কত্তা, আপনি একটি গম্বোল।"...গম্বোল অবধি শুনে কম্বল চাপা দিলেন হাজরা মশাই। ডাক্তার এসে ঘুমের ওষুধ দিয়ে বলে গেছেন, "খুব সাবধান। বাড়ী করতে গেলে আয়ু কমে যায়। এঁর আবার হার্টটা দেখছি সুবিধের নয়।" অর্থাৎ দারুণ বিপাকে পড়লেন হাজরা মশাই!

● বিপদের ফাঁদ পাতা ভুবনে

শুধু দিগ্বিজয় হাজরা নন। ভারতের কোণে কোণে গাঁয়ে গঞ্জের··· শহরের আধা-শহরের পাড়ায় পাড়ায় হাজার হাজার মানুষ এমনি বিপদে

পড়ছেন সকাল-বিকেল। তাঁদের একটাই ছোট্ট ইচ্ছে—মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই গড়ে তোলা : ছোট একটা নিজের বাড়ী! দুটো ঘর, একটা বারান্দা, বাথরুম, পায়খানা, একটা রান্নাঘর আর খুব বেশী তো সিঁড়ির চিলে কোঠায় এককালি পুজোর জায়গা। অথচ কারিগরী খুঁটিনাটি জানা না থাকায় জীবনের এইটুকু চাহিদাও তাঁদের মিটতে চায় না। দিগ্বিজয় বাবুর মতোই দিশেহারা হয়ে পড়েন তাঁরা। দিগ্বিজয় বাবুর মিস্ত্রী রহমন মেজাজী আর খুঁত খুঁতে হলেও সৎ লোক। কিন্তু বেশীর ভাগ মিস্ত্রীই হয় অসৎ আর দারুণ ধান্ধাবাজ। এরা সহজেই বুঝে নেয় বাড়ী করানেওয়ালা বাবুটির কারিগরি বিষয়ে দৌড় কতদূর। সাধারণ মানুষ—চাষী, খুদে দোকানদার, ইস্কুলের মাস্টার, কবিরাজ, কেরানী, এমনকি উকিল, ডাক্তার, মোক্তারদেরও বাড়ী করার বিষয় বিশেষ কিছুই জানা থাকে না। অথচ সকলেরই বাড়ীর দরকার। ফলে সুযোগ নেয় মিস্ত্রী আর কনট্রাক্টারের দল। নানা ছুতোয় অকারণ কাজ বাড়ায়, বিল বাড়ায়। 'সাতাশ' এদের হাতে পড়ে হয় 'একশো সাতাশ।' এদের "টাকা হয় মেলা"। আর বাস্তু-অভিলাষী মানুষটি সব হারিয়ে, সব ঘুচিয়ে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েন দিগ্বিজয় বাবুর মত। তার একটুকু বাসার সাধ হারিয়ে যায় চিরকালের মত। হতাশ মনে ভাড়াটে বাড়ীর দাওয়ায় বসে বিড় বিড় করেন, "বাড়ী করতে গেলে নাকি আয়ু কমে যায়! ও আমার কম্মো নয়।" অনেক আশা আর ভরসা নিয়ে যাঁরা কাজে নেমেছিলেন তাঁদের কারু জমি পড়ে থাকে ভিতটুকু বুকে নিয়ে, কারু বা বাড়ী ওঠে লিনটেল অবধি বা ছাদ থামাল; যার ছাদ ঢালাই হল তার আর পলেস্তারা করা হয়ে ওঠে না। আমার এক মামা স্রেফ বাড়ী করার ভয়ে সব টাকা পোস্টাফিসে ফিক্সড্ ডিপোজিটে রেখে সুদের টাকায় সারা জীবন বাড়ী ভাড়া গুণে গেলেন, প্রায় বস্তির মত একটা অন্ধকার ঘরে থেকে। অথচ এঁর মরবার পর শ্রাদ্ধ করতে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল—পোস্ট অফিস থেকে টাকা তুলে নগদ ৫০০০ টাকায়।

কারিগরী জানকারীর অভাবে আর এক ভাবে বিপদে পড়েন আমাদের দেশের মানুষ। হাতুড়ে মিস্ত্রী আর তার থেকেও হাতুড়ে বিন্‌পয়সার উপদেশদাতাদের পাল্লায় পড়ে এঁরা বাড়ী করার সময় এমন সব ভুল করে বসেন যার ফলে বছর না ঘুরতে বাড়ী বসে যায়, ফাটল ধরে, ছাদ দিয়ে শুরু হয় জল পড়া, মেঝে হয় চৌচির, দেয়ালে নোনা ধরে, চৌকাঠে ঘুন
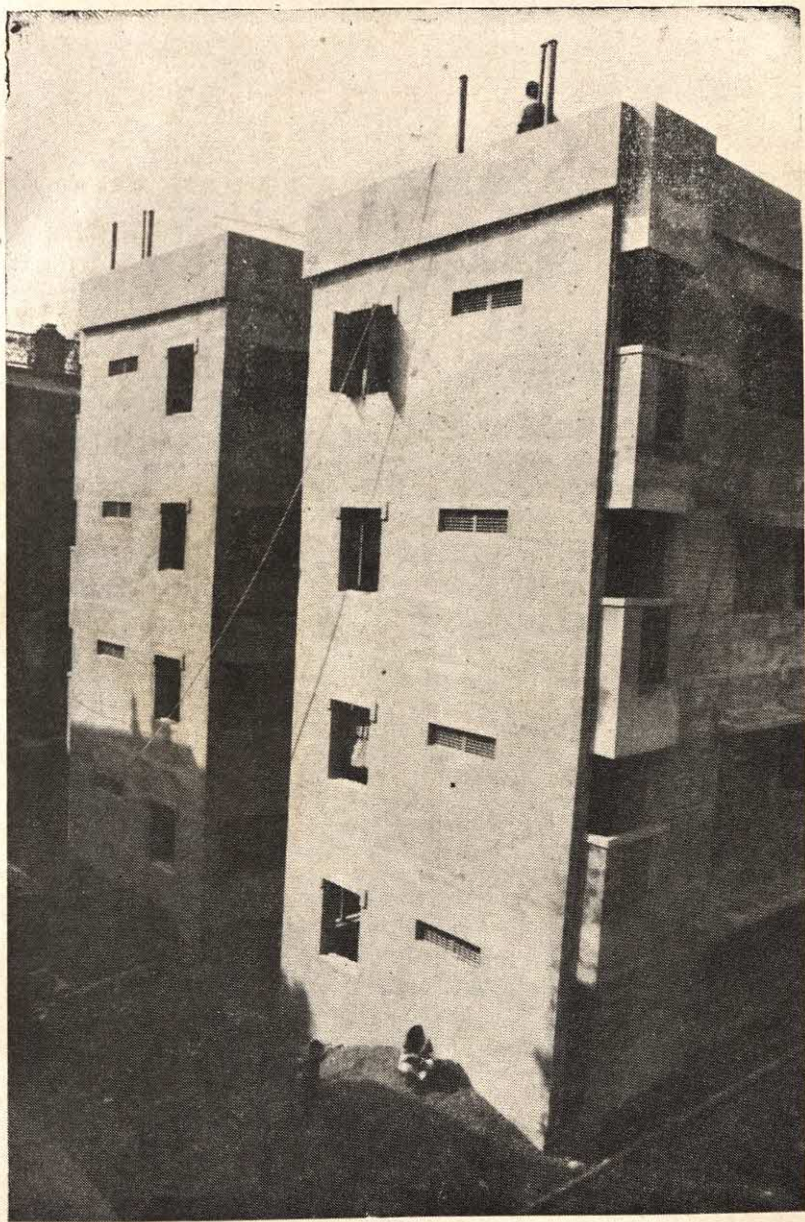
১নং চিত্র : রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে রামবাগানে গড়ে ওঠা চারতলা শিল্পী আবাসন : বিবেকানন্দ পল্লী
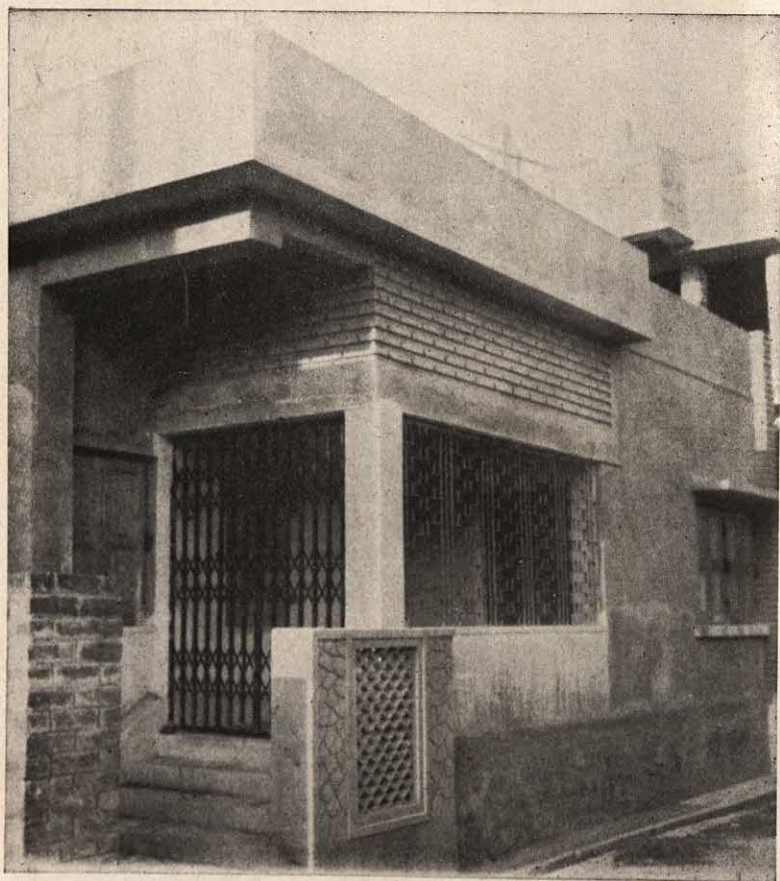
২নং চিত্র : সত্যব্রত রায় বর্ধনের বাড়ী : গাঙ্গুলীবাগান
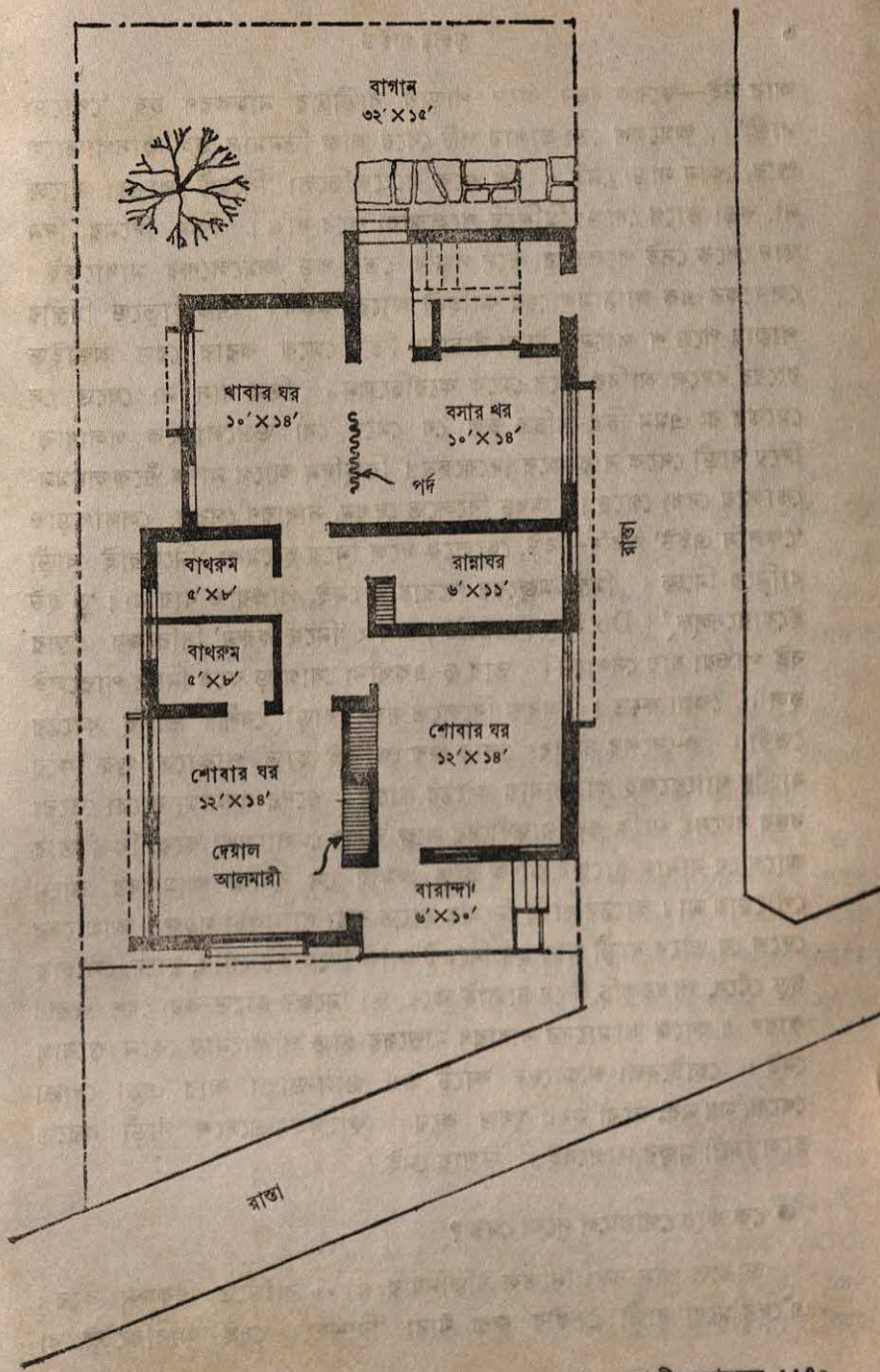
১.১—গোবিন্দ দত্তের বাড়ী, গড়িয়া কর্নার প্লট—৩২´×৫১´। বাড়ীর আয়তন ১১৭০ স্কোয়ার ফিট। রাস্তা দক্ষিণ ও পূবে।

আর উই—কয়েক বছর বাদে পাড়ায় বাড়ীটার নামকরণ হয় 'পোড়ো বাড়ী'। অমলেশ তো মাথায় পটি বেঁধে আজ তিনমাস হল হাসপাতালে শুয়ে, কোন সাড়া নেই। কে ওকে বাৎলেছিলো সিমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না, কড়া ভাগে সোডা মিশিয়ে পলেস্তারা করে দাও। তিন দিনের দিন ছাদ থেকে সেই পলেস্তারা খসে পড়বি তো পড় অমলেশের মাথাতেই। লেখকের এক জ্যাঠামশায়ের কাহিনী আরো করুণ। এক হাতুড়ে মিস্ত্রীর পাল্লায় পড়ে শ' খানেক টাকা বাঁচাতে তিনি মেঝে করার রেড অক্সাইড রংয়ের বদলে আবির দিয়ে মেঝে করেছিলেন। তিন মাস না যেতে সে মেঝের রং এমন চিত্র-বিচিত্র হল যে মেয়ে বৌ ভদ্রলোককে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছেন। কিছুদিন আগে নাকি ওঁকে লছমন-ঝোলায় দেখা গেছে। অথচ বিলেতে দেখুন, সাধারণ গেরস্থ, লেখাপড়াও 'কেলাস এইট' অবধি—বউ, ছেলেকে দলে নিয়ে হামেশা নিজেরাই বাড়ী বানিয়ে নিচ্ছে। মিস্ত্রী মজুরের পরোয়াও নেই, পাওয়াও যায় না। 'ডু ইট ইয়োরসেল্‌ফ্' (Do it yourself) অর্থাৎ 'নিজে করুন' সিরিজের এন্তার বই পাওয়া যায় সেখানে। তার দু-একখানা যোগাড় করে নিতে পারলেই হল। কেল্লা ফতে! অবশ্য বিলেতে সস্তা বাড়ী বেশীর ভাগই কাঠের তৈরী। ও-দেশের সাধারণ লোক জন্ম থেকেই হাত পাকাতে শুরু করে বাড়ীর গ্যারেজের কারখানায় কাঠের কাজে। ওদের বদনাম, বারো তেরো বছর বয়সেই নাকি ওরা বান্ধবীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে, কিন্তু তার আগে যে নানান হাতের কাজে হাত জমায় সে সুনাম আমাদের কানে পৌঁছোয় না। কাঠের বাড়ী নিজের হাতে করা খানিকটা সহজ। আমাদের দেশে যে ভাবে বাড়ী গড়া হয় সিমেন্ট বালি দিয়ে ইট গেঁথে, ছাদে লোহার ছড় বেঁধে, পাথরকুচি দিয়ে ঢালাই করে, তা নিজের হাতে করা বেশ শক্ত। কারণ এ কাজে আমাদের সাধারণ মানুষের হাত পাকানোর কোন সুযোগ নেই। ছোটবেলা আমাদের কাটে হয় গুলি-ডাণ্ডা আর এক্কা দোক্কা খেলে, নয় নরঃ নরৌ নরাঃ মুখস্থ করে। কাজেই এদেশে বাড়ী করতে হলে মিস্ত্রী-মজুর লাগবেই। উপায় নেই।

● কে কার গোয়ালে ধুনো দেয় ?

ভারতে পাস-করা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ৪০০০ বাড়িতে একজন করে। এঁদের মধ্যে বাড়ী তৈরীর জন্য যাঁরা 'বিশেষজ্ঞ' সেই আরকিটেক্ট বা

বাস্তুবিদ মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ। তাঁদের শতকরা নব্বই জন থাকেন কোলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও বোম্বায়ে। বাকি দশ জন ছড়িয়ে আছেন বাঙ্গালোর, চণ্ডীগড়, পাটনা, এলাহাবাদ, শিলং, কটক ও আমেদাবাদের মত বড় বড় রাজধানীতে। ফলং-বৈচি, জয়নগর, বাঁশবেড়ে, কুলতলী, ময়না, ডায়মণ্ড হারবার, জংগীপুর, আমতা, বিষ্ণুপুর, ফলতা, বরাকর, মধ্যমগ্রাম, কুচবিহার, গোঘাট, পুরুলিয়া, মালদা ও রাজারহাটে যে হাজার হাজার বসত বাড়ী তৈরী হচ্ছে বা হবে তার কারিগরী তদারকি করবার মত নির্ভরশীল কেউ নেই। আগামী বিশ-তিরিশ বছরেও থাকবে না। এ ভার নিতে হবে বাস্তু-অভিলাষীদের নিজেদেরই। কোন্ কোন্ জায়গায় তদারককারীকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে, কোন্ কাজটা ঠিক কিভাবে করলে সেটা ভালভাবে করা হবে, এইটুকু জানলেই কিন্তু মোটামুটি সঠিক ভাবে বাড়ী নির্মাণ কাজের তদারকি করা চলে। এইটুকু জানবার মত কোন বাংলা বই আছে বলে লেখকের জানা নেই। ইংরেজীতে হয়ত আছে, এদেশে হয়ত পাওয়া যায়। কিন্তু যে দেশে নিজের ভাষা পড়তেই সত্তর শতাংশ লোক হিমসিম খায় সেখানে ইংরেজী বই কোন্ উপকারে আসবে? বাংলায় আজকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কিছু কিছু বই বেরুচ্ছে। কিন্তু তার সবই কারিগরী ইস্কুল-কলেজে পঠনীয়। সরল করে সাধারণ মানুষের বোঝবার মত করে লেখা তো নয়ই, ইঞ্জিনিয়ারিং পরিভাষা আর অংকের কচকচিতে সেগুলো হবু ইঞ্জিনিয়ারদের মাথাতেও ঢোকে না। 'শুচি প্রযুক্তিবিত্তার কার্যক্ষেত্রের পরিধি নিঃসারণ ও বাতানুকলকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত!'—এর নাম পরিভাষা! বুঝলেন কিছু? আম্মোও না। অথচ আমি, আপনি, দিগ্বিজয়বাবু, মায় ফত্নাও বোধহয় খানিকটা আন্দাজ করতে পারবে যদি বলা যায় 'স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং ভেনটিলেশন ও এয়ার কণ্ডিশনিংএও কাজে লাগে'।

● **পরোপকারের বাতিক**

কাকা ও কাকিমা জোড়া ডাক্তার। মেলাই লেখাপড়া করেছেন। তার এক একটা বই আমাদের থান ইটের থেকেও অনেক ভারী। অথচ ইট দিয়েই তাঁদের সল্ট লেকের বাড়ী 'পল্লবিনী' করতে গিয়ে হিমসিম খেয়েছে লেখক। এক বছর ধরে সকাল-সন্ধ্যে (এবং মাঝরাতেও) মোট ১৩৪২ বার ফোন করেছেন ওঁরা। ১৩৪২ দফা উদ্ভট সব প্রশ্ন করেছেন। উত্তর
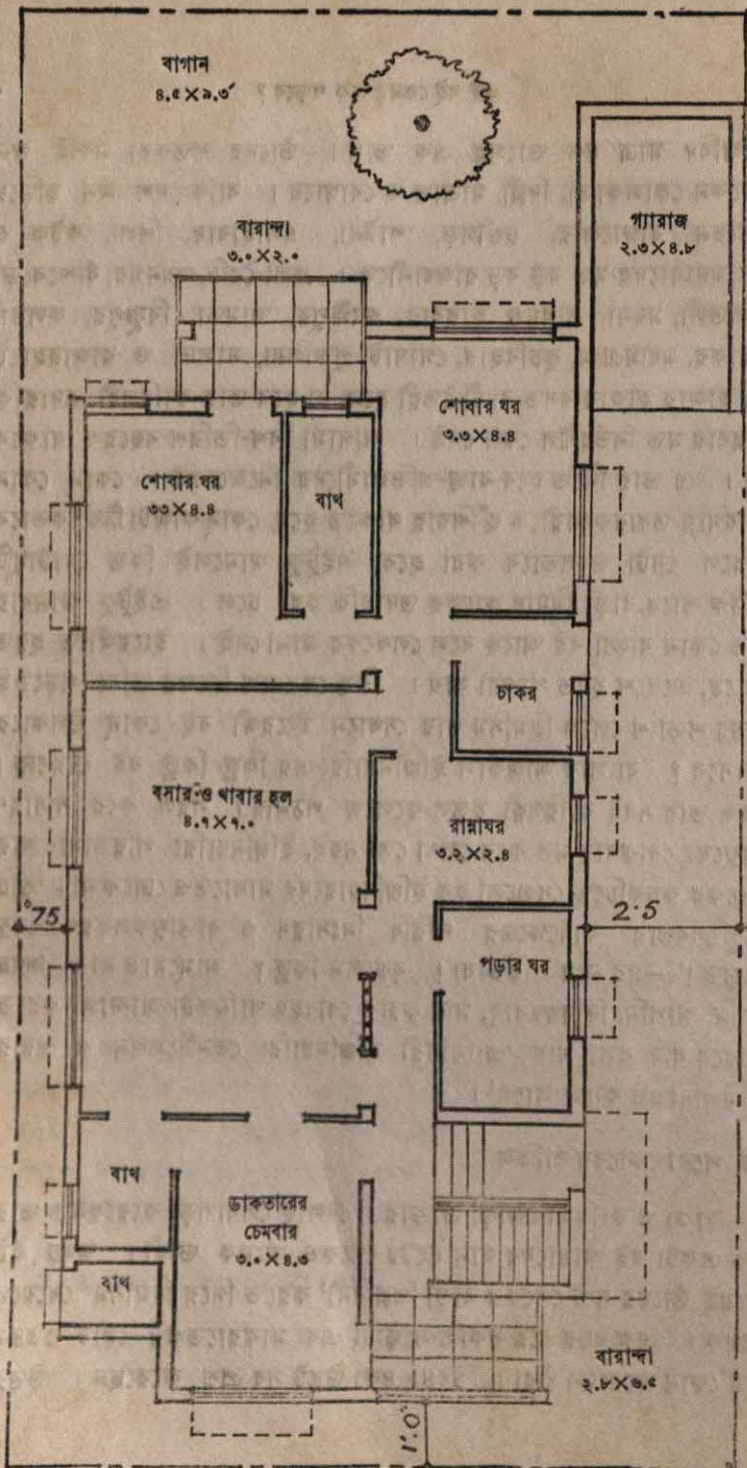
১.২—ডঃ স্নেহলতা বসুর বাড়ী 'পল্লবিনী', সল্ট লেক। জমি ২৭.১৫ মি.×১২ মি.—বাড়ীর আয়তন ১৪৭ স্কোয়ার মিটার। পথ বাড়ীর উত্তরে।

৩নং চিত্র : কাকা-কাকীমা জোড়া-ডাক্তারের বাড়ী : সল্টলেকে
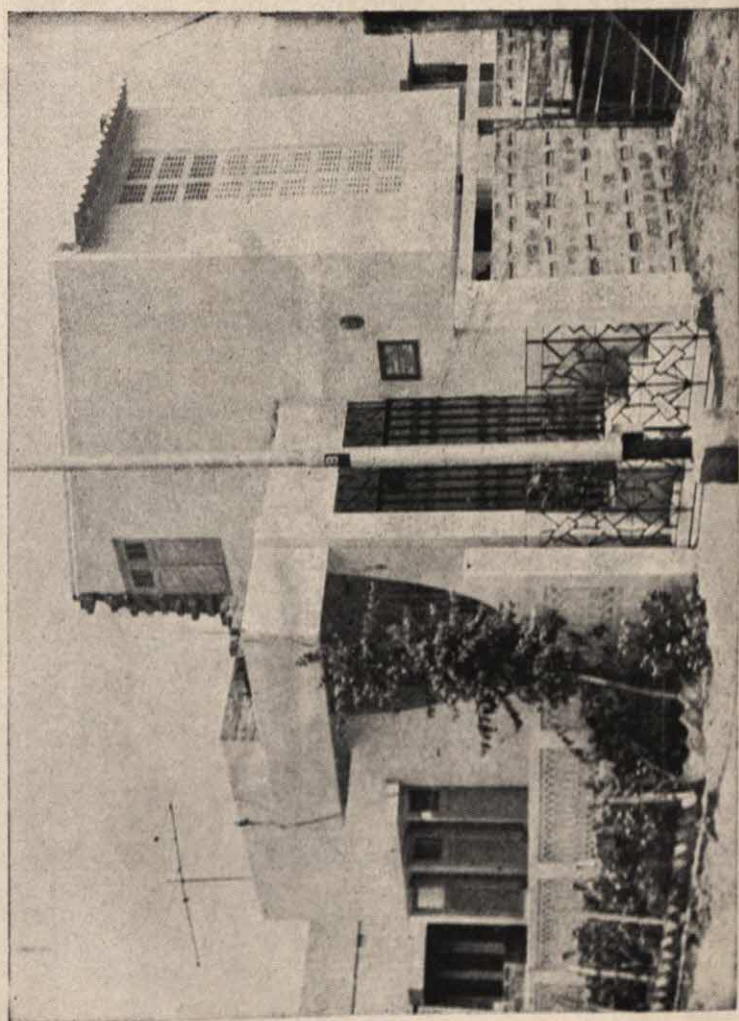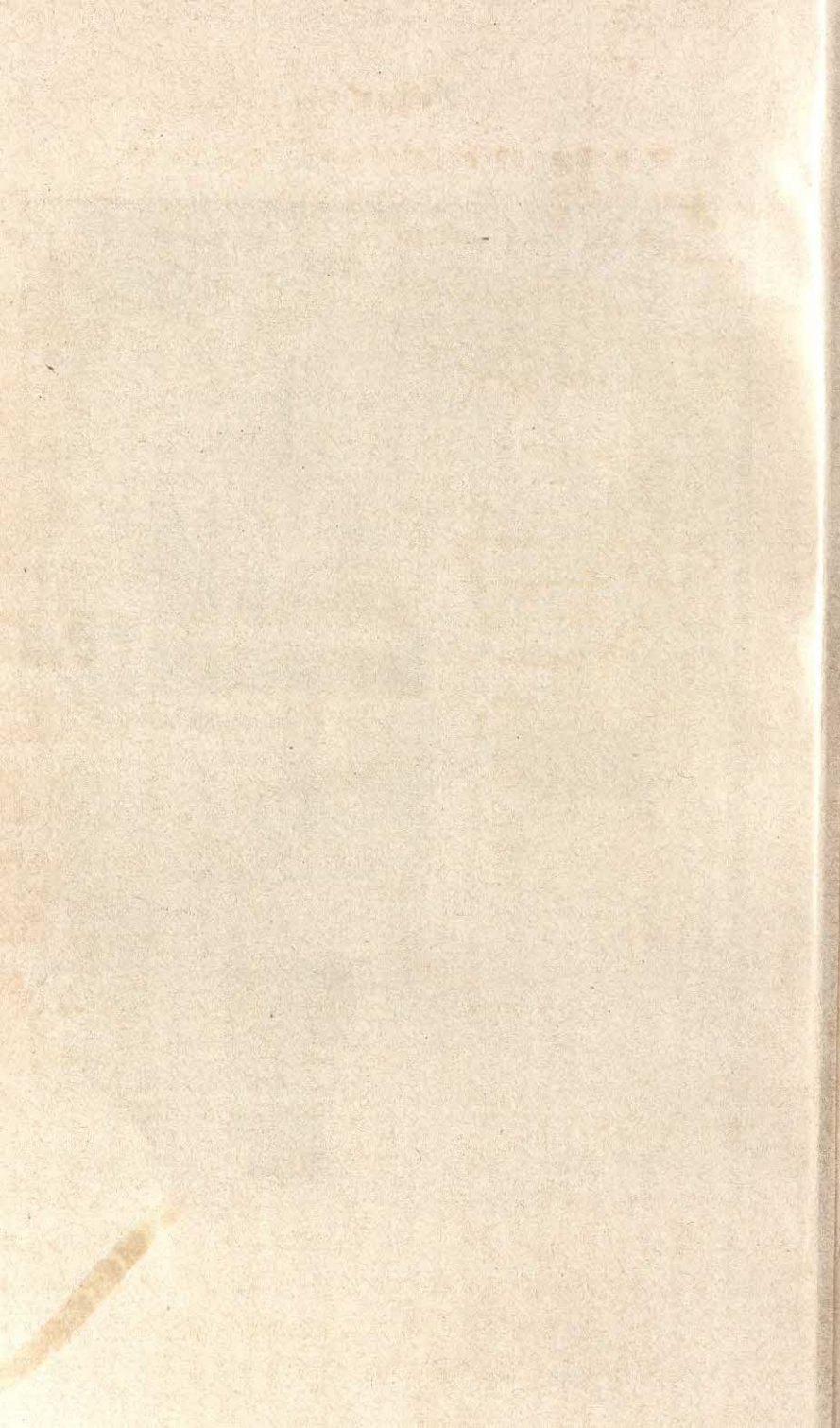
দিতে দিতে লেখকের ১৩৪২টা চুল উঠে গেছে আর ১৩৪২টা চুল পেকে গেছে। তাই সাংবাদিক বন্ধু ডঃ রমেন মজুমদার যখন সল্ট লেকে (বিবেচনা করুন, আবার সেই সল্ট লেক! লেখকের মাথায় আর হাজারখানেক কাঁচা চুল আছে মাত্র) বাড়ী করবে বলে নকশা করাতে এল তখন লেখক শুরু থেকেই শেখাতে শুরু করল কেমন করে বাড়ী করা তদারকি করতে হয়। রমেন বুঝল লেখক কি ভাবে তাকে এড়াতে চাইছে। বদলা নিল অরুণ পুরকায়স্থ মশায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে! তিনি বই ছাপেন, তায় পরোপকারের বাতিক আছে। চেপে ধরলেন—"রমেনবাবুকে যা শিখিয়েছেন, বই করে তা ছড়িয়ে দিন বাস্তু-অভিলাষী বাঙ্গালীর হাতে। ওঁদের কাজে লাগবে। দেশের উপকার হবে।"

পরোপকার করাটা ছোঁয়াচে। উৎসাহটা চাগিয়ে উঠল। দেখাই যাক না চেষ্টা করে। কনসালটেন্ট বা উপদেষ্টা হিসেবে দেশের হাজার হাজার মানুষ যারা বাড়ী করতে চান, তাদের কোন সাহায্য করা দূরের কথা, তাঁদের কাছে পৌঁছতেই পারব না। এই বইয়ের ভিতর দিয়ে যদি তাঁদের একটুও উপকার হয়, বুঝব আমার বাস্তুবিদ হওয়া সফল হয়েছে। মৌলিক বিজ্ঞান দূরের কথা, জ্ঞান বিতরণ করতেও বসিনি। যদি কোনদিন নিজের বাড়ী করতে পারি, যে যে বিষয় নিয়ে যে যে ভাবে ভাবব, এগোব, তদারকি করব বা মিস্ত্রী-মজুরকে যেমন করে হুঁশিয়ার করব এবং বাড়ী তৈরীর শেষে যে ভাবে তাকে সুন্দর করে সাজাব শুধু সেই ভাবনাচিন্তাগুলোকেই লেখায় রূপ দিয়েছি যাতে যে-কেউ এই পথ ধরে এগিয়ে একটা ভাল ও পোক্ত বাড়ী গড়ে, তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে গর্ববোধ করতে পারেন। তাঁর গর্ব হবে লেখক হিসেবে আমার গর্ব। 'তোঁহারি গরবে, গরবিনী হাম।' ফার্স্ট এড শেখানোর মানে যেমন ডাক্তার তৈরী করে দেওয়া নয়, এই বই পড়েও তেমনি কেউ ডাকসাইটে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উঠবে না। তদারকি কাজে ইঞ্জিনিয়ার না জুটলেও যাতে সাংঘাতিক কোন ভুল না করে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, মিস্ত্রী-মজুরের ফাঁকি ধরে ফেলা যায়, কাজের শেষে বিল নিয়ে তারা ঠকাতে না পারে এবং শেষমেষ বাড়ীকে যাতে সুন্দর করে সাজানো এক আবাসিক রূপ দেওয়া যায় এটুকুর জন্যই এ বই। এ বই হচ্ছে যে-কোন মানুষের—যদি তাঁর বাড়ী করার দরকার থাকে। এ বইয়ের বিষয়বস্তুকে তাই ইঞ্জিনিয়ারিং না বলে, বলা উচিত ঘর বাঁধার গান এবং তা সাধারণ মানুষের মনের মত সহজ ও সরল সুরে বাঁধা। এই সাধারণ

মানুষের বেশীর ভাগই হয়ত লেখাপড়ায় বেশী দূর এগোতে পারেন নি। তাই এ বই চলতি বাংলায় লেখা। গালভরা পরিভাষার বদলে প্রায় বাংলা-হয়ে-যাওয়া ইংরেজী শব্দগুলোকেই আঁকড়ে রাখা হয়েছে।
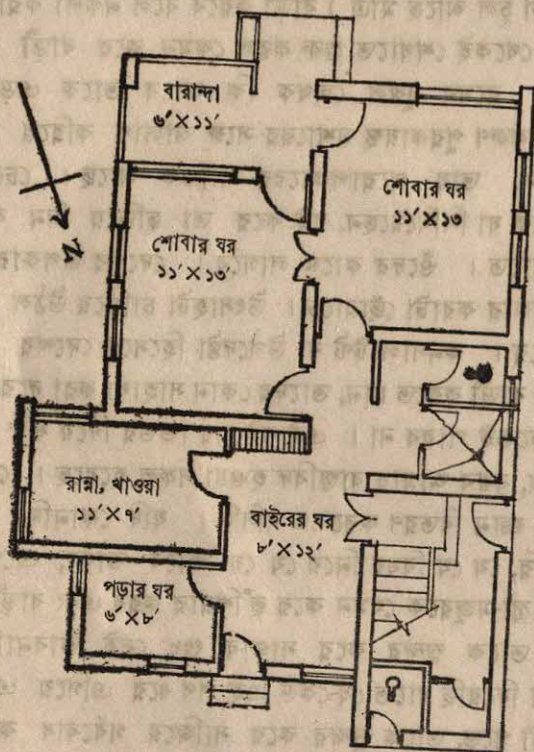
১.৩—শ্রীসত্যব্রত সরকার-এর বাড়ী, জংগীপুর। বাড়ীর আয়তন ৮৬৪ স্কোয়ার ফিট। সত্যব্রত বাবু প্রফেসার···বাড়িতেও ছাত্র পড়ান।

● ইচ্ছা-পূরণ [২য় সংস্করণ]

যেহেতু বই-এর কিছু কিছু আলোচ্য বিষয়ে লেখকের জ্ঞান নেহাতই সীমাবদ্ধ তাই প্রথম সংস্করণে 'ইচ্ছা পূরণ'-উপ-অধ্যায়ে পাঠকদের আহ্বান করেছিলাম ভুলচুক বা ফাঁকিবাজি ধরিয়ে দিতে। ওয়াদা ছিল গুণী পাঠকের নাম জানিয়ে তা শুধরে নেওয়া হবে। ভেবেছিলাম দু পাঁচটা চিঠি এলেও আসতে পারে! চিঠি এসেছে বন্যার মত—শয়ে শয়ে; প্রকাশকের দপ্তর হিমসিম খেয়ে গেছেন সেগুলি রিডাইরেক্ট করতে।

প্রথম দিকে ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করে শেষে বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি।

অসংখ্য আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রশ্ন, ক্রটি সংশোধন···এক একটি চিঠি তো প্রায় পূর্তবিদ্যার থিসিস ! কিছু শক্ত শক্ত অঙ্ক-মঙ্কও রয়েছে যেগুলি আমার মগজে ঢোকে নি। ভুলচুক যতটা পেরেছি শুধরে দিয়েছি কিন্তু এই বিপুল পত্র-সমারোহের তথ্য ও তত্ত্ব গৃহীর গাইডের ২০০ পৃষ্ঠা আয়তনের মধ্যে তুলে ধরা অসম্ভব। শ্রীভূমি রাজী থাকলে দশ-ভলুমে 'গৃহীর এনসাইক্লোপিডিয়া' বের করতে পারি যদি আমার জীবদ্দশায় এই পত্রকুলের সম্পাদনা শেষ করা যায় !

● বিন্-সিমেণ্টের বাড়ি

পাঠকদের বেশ কয়েকটি চিঠিতে এক নবতর আকুতি—সিমেণ্ট পাওয়া যাচ্ছে না, বাড়ী করব কি করে ? প্রশ্নটা মনকে নাড়া দিয়েছিল বলে কয়েকজন পূর্তবিদ গবেষকের সঙ্গে আলাপ করেছি। তারই ফলশ্রুতি এই নতুন উপ-অধ্যায়টি।

তেলের মতই সিমেণ্টের অভাব এক জাতীয় সংকটে পরিণত হয়েছে আমাদের দেশে। বড় বড় সরকারী প্রকল্প প্রায় আটকেই গেছে সিমেণ্ট পাওয়া যাচ্ছে না বলে। ব্যক্তিগত স্তরেও বহু মানুষ অফিস থেকে হাউস বিল্ডিং লোন পেয়ে গেছেন, জমি রেডি, নকশাও পাস হয়ে গেছে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ; কেবল সিমেণ্টের জোগাড় হয় নি বলে বাড়ী তৈরীর কাজে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। এদিকে বাড়ী করার খরচ মাসে মাসে বেড়ে চলেছে লাফে লাফে। ৬১ সালে যে ইটের দাম ছিল ৬০ টাকা হাজার, ৮৮-তে সেই ইট ১০০০ টাকা হাজার। ২৭ বছরে মূল্যের সতেরো গুণ বৃদ্ধি। এই সময়ের মধ্যে কাঠের দাম বেড়েছে ২২ গুণ, সিমেণ্ট ৯ গুণ, লোহা ৯ গুণ, স্যানিটারী জিনিপত্র ১২ গুণ। গৃহাভিলাষী মানুষ অসহায়ের মত দিন গুনছে আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার বাড়ী করার স্বপ্ন কিভাবে খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। আর এই দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে সিমেণ্টের অভাব যা বিহীনে চলতি পদ্ধতিতে বাড়ী বানানো অসম্ভব।

তাই আজকের গৃহ-বিজ্ঞানী, পূর্তবিদ, স্থপতি ও বাস্তুকারেরা ভাবতে শুরু করেছেন সিমেণ্টে তৈরী বাড়ীর নানান বিকল্প নিয়ে। এখানে একটি বিকল্প বাড়ীর পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে যা ওই সব ভাবনা চিন্তারই

ফসল। এই প্রযুক্তিগত পদ্ধতিতে অন্ততঃ ৭৫% সিমেন্ট বাঁচানো যাবে। ১০০০ বর্গফুটের একটি বাড়ী করতে চলতি-পদ্ধতিতে যেখানে ২৫০ ব্যাগের মত সিমেন্ট লাগে, এই পদ্ধতিতে সেখানে লাগবে ৬৩ ব্যাগ।
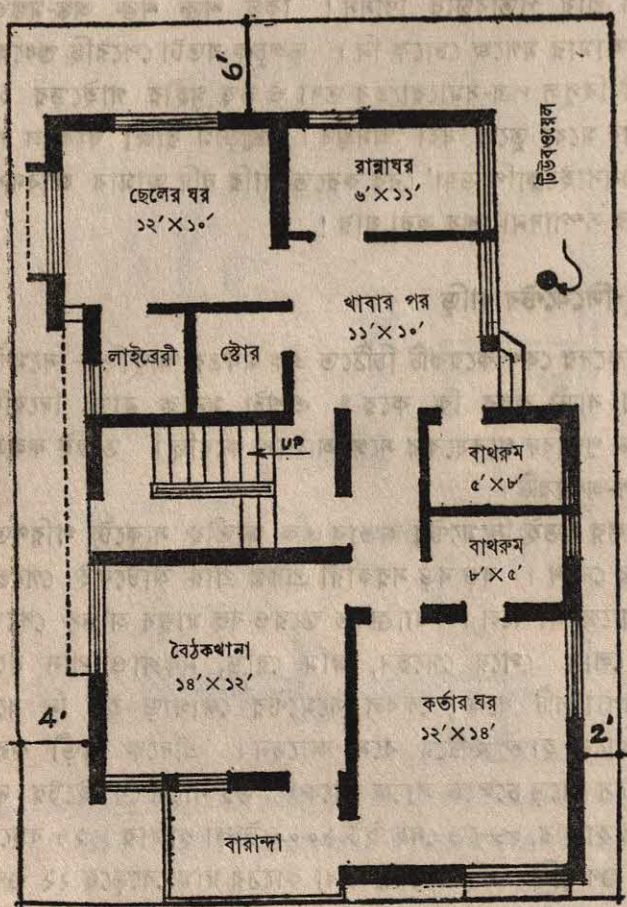
১.৪—শ্রীসত্যব্রত রায়বর্ধনের বাড়ী, গাঙ্গুলীবাগানে,···অঞ্চল-পঞ্চায়েতের অধীনে। কর্তা-গিন্নী ছু'জনেই চাকুরে। ছেলের বইয়ের শখ। রান্না করে রাঁধুনী। বাড়ির আয়তন ১১৪০ বর্গ ফুট, জমির ১৭০০ বর্গ ফুট।

পদ্ধতিটি সম্বন্ধে একটু দফাওয়ারী আলোচনা করা যাক্। আমরা শুধু সেইসব আইটেম নিয়েই মাথা ঘামাবো প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী যেগুলিতে সিমেন্ট ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

[১] **ভিত**—ভিত বা ফাউণ্ডেশনের দুটি অংশ। নীচের কংক্রিটের স্তর এবং উপরের ধাপে ধাপে সরু হয়ে আসা গাঁথনী (৬·১নং নক্শা) দুটি অংশেই সিমেন্টের বদলে চুন ব্যবহার করা যায়। সিমেণ্ট কংক্রীটের স্তর সাধারণতঃ চার ইঞ্চি পুরু হয়। চুন, সুরকী ও খোয়ার (ভাগ ১ : ২ : ৪) পেটাই কংক্রিট ৬ ইঞ্চি পুরু করা ভাল। এক হিসেবে চুনের কংক্রিট পেটাই করতে হয় বলে তা সিমেন্ট কংক্রিটের থেকে মজবুত ও ভিতের পক্ষে বেশী উপযোগী। চুণ-সুরকীর গাঁথনী (ভাগ ১ : ৪)-ও ভিতের পক্ষে অতি চমৎকার। তবে দেখে নিতে হবে সুরকীটা ১নং বা ফার্স্ট ক্লাস ইটের সুরকী এবং তাতে মাটি বা আমাইটের গুঁড়ো মেশানো নেই। গুঁড়ো চুনের থেকে পাথর চুন কিনে যদি চৌবাচ্চার জলে ফুটিয়ে নেন—ডবল শক্তিশালী তাজা চুন পাবেন।

[২] **ড্যাম্প প্রুফ কোর্স**—সিমেণ্ট, বালি ও পাথর কুচির বদলে মোটা পরিষ্কার বালির সঙ্গে ফুটন্ত পিচ (ভাগ ১ : ১) মিশিয়ে সিকি ইঞ্চি পুরু করে ভিতের উপর ঢেলে দিলে একই কাজ হবে। ভিত বেয়ে মাটির ড্যাম্প পিচ ভেদ করে উঠতে পারবে না (৬·১নং নকশা)।

[৩] **মেঝের উপরের দেওয়াল**—শক্তি উপাসক বলে কিনা জানি না, আমাদের শক্তির উপর অহেতুক একটা আকর্ষণ আছে। আমাদের মিস্ত্রী-মেকানিকরা বিশ্বাস করেন কোন নাটবল্টু আঁটতে হলে, এমন বজ্র আঁটুনী দরকার যাতে তা 'জিন্দেগীতে' খোলা না যায়। আমাদের গ্রীল, গেট জেলখানাকে হার মানায়। যেকোন বস্তু মাত্রাতিরিক্ত মজবুত হলেই আমাদের হাসি ফোটে। পশ্চিমবঙ্গে পাথর নেই, থাকলে নিঃসন্দেহে পাথর দিয়েই গাঁথনী করতাম। যাঁরা মজবুতির দোহাই দিয়ে সিমেণ্টের গাঁথনী করতে চান, তাঁদের বলি একতলা দোতলা বাড়ীতে চুন-সুরকীর (ভাগ ১ : ৪) মশলা দিয়েও যথেষ্ট মজবুত বাড়ী হয়। চুনটা পাথর ফুটিয়ে তৈরী করলে তো কথাই নেই। বড়জোর তেতলা বাড়ীর এক তলাটাতে ১৫ ইঞ্চি মোটা দেয়াল গাঁথবেন। চিন্তা করুন, কুতুব, তাজ, লালকেল্লা, মীনাক্ষী মন্দির, গোপুরম সবই চুনের মশলায় গাঁথা !

[৪] **লিণ্টেল ও ছাদ**—যেহেতু লোহার ছড় ব্যবহার করতেই হবে অতএব চুন চলবে না। চুন লোহা খেয়ে দেবে। তবে ঢালাইয়ের বদলে আর. বি. (রিইনফোর্সড ব্রিক) কংক্রিট ব্যবহার করলে (৬.৭নং চিত্র দেখুন) সিমেন্টের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে যাবে। আমেদাবাদের স্থপতিরা

এক ধরনের কম উচ্চতার খিলান ছাদ নিয়ে নানান গবেষণা চালাচ্ছেন—এতে লোহারও প্রয়োজন হয় না। অ্যাসবেস্টসের ঢালু বা ভল্টের ছাদও বিনা সিমেন্টের ছাদ হিসেবে চমৎকার। তবে তাতে ফল্‌স সিলিং দিয়ে নিতে হবে এবং ছাদটা ব্যবহার করা চলবে না। কার্নিশ করুন কাঠের ফ্রেমে অ্যাস্‌বেস্টস লাগিয়ে। তাতেও সিমেন্ট বাঁচবে।

[৫] **প্লাস্টার**—টাটকা পাথুরে চুন হলে ঘরের ভিতর দিকে চুন সুরকীর (ভাগ ১ঃ৩) প্লাস্টার চলতে পারে। তবে বাইরের দিকে সিমেন্ট বালির প্লাস্টারই বেশী টেঁকসই হবে। বাজারে লিমপো, সেমিক্স বা মটারেক্স ইত্যাদি নানান নামে প্লাষ্টিসাইজার পাওয়া যায়। প্লাস্টারের মশলায় এক ব্যাগ সিমেন্টের বদলে ১ প্যাকেট প্লাস্টিসাইজার মিশিয়ে প্লাস্টারের চলতি ১ঃ৬ ভাগকে ১ঃ১২ ভাগ অনায়াসে করা যায়। এতে প্রতি ১০০ ঘন ফুট প্লাস্টারে ২ ব্যাগ সিমেন্ট বেঁচে যাবে। মজবুতী একই থাকবে।

[৬] **দরজা-জানালা**—এর চৌকাঠ পরে না বসিয়ে গাঁথনী ওঠার সাথে সাথে যদি বসান, বেশ কিছুটা সিমেন্ট বাঁচাতে পারবেন।

[৭] **মেঝে**—আমার একটি শিল্পী বন্ধু পোড়ামাটির কাজ করেন। তাঁর শিল্পকর্মকে টেঁকসই করতে এঁটেল মাটির সঙ্গে মেশান অল্প চীনে মাটি। তিনি এর নাম দিয়েছেন সেরাক্লে। চীনে মাটির গ্লেজড টাইল্‌সের তুলনায় সেরাক্লে অনেক সস্তা। ভাটির উত্তাপ অনেক কম হলেও কাজ চলে যায়। আমার মনে হয় চীনে মাটির অনুপাত আর একটু বৃদ্ধি করে (চীনে মাটি ৩৫ ভাগ, মাটি ৬৫ ভাগ) প্লেন টালি করলে (উত্তাপে অপরিবর্তিত থাকে এমন রং মিশিয়ে রঙ্গীন টালিও করা চলে) তা দিয়ে খাসা মেঝে করা যায়। ইউরোপে মেঝেতে আন্‌গ্লেজড সেরামিক টাইল ব্যবহার করা হয় বহুল পরিমাণে। মাটির উপর সোলিং বিছিয়ে তার উপর একটা পলিথিন চাদর বিছিয়ে দিতে হবে। এর উপর সুরকীর আস্তরণের উপর সেরাক্লে টালি সাজিয়ে জোড়গুলি সিমেন্ট দিয়ে ভরে দিতে হবে—যেমন মোজেকের টালি বসানো হয়। উদ্যোগী পুরুষ সেরাক্লের টালির কারখানা করতে চাইলে যাদবপুরের গ্লাস ও সেরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রযুক্তিগত সাহায্য করবেন।

[৮] **উঠোন**—উঠোন বাঁধাতে হলে খাড়া করে (খাদরিতে) ইট সাজিয়ে সিমেন্ট বালি দিয়ে জোড় ভরে দিন। রেলের স্টেশন ফ্ল্যাটফর্মে

এই মেঝে অটুট থাকে বছরের পর বছর। আপনার বাড়ীতে তো কয়েক পুরুষ কেটে যাবে। চলতি সান-বাঁধানো উঠোনের থেকে সিমেন্ট খরচা হবে সিকির সিকি।

[৯] **সেপ্টিক ট্যাঙ্ক ও ছাদের চৌবাচ্চা**—যে কোন নামী অ্যাসবেস্টস প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে আপনার প্রয়োজন মাফিক মাপের সেপ্টিক-ট্যাঙ্ক কিনে জমিতে বসিয়ে নিন। এক কনিক সিমেন্টও লাগবে না। অথচ সিমেন্ট গাঁথনীর ট্যাঙ্কের তুলনায় কোন অংশে নিকৃষ্ট হবে না। ছাদে জল স্টোর করতে জি. আই. (গ্যালভানাইজ্‌ড আয়রন) ট্যাঙ্ক ফিট করুন। জল গরম হলে, গ্রীষ্মে একটা খড়ের ছাউনী দিয়ে নেবেন।

[১০] **লীন (Lean) কংক্রিট বা মাডম্যাট (Mudmat)**—এই ধরনের ঢালাইয়ে চলতি ভাগ হচ্ছে: সিমেন্ট—১, বালি—৩, খোয়া—৬। লীন কংক্রীটের যা কাজ তাতে এই পরিমাণ সিমেন্ট দেওয়া সিমেন্ট নষ্ট করার নামান্তর। ন্যাশানাল বিল্ডিং অর্গানাইজেসান পাতিয়ালা ও মাদ্রাজে পরীক্ষা করার পর জানাচ্ছেন লীন কংক্রীটের ভাগ এই রকম হলেই যথেষ্ট: সিমেন্ট—১, বালি—৮, খোয়া—১৬। এতে অর্থ ও সিমেন্ট দুয়েরই সাশ্রয় হবে।

ওপরের ১০ দফায় কত সিমেন্ট বাঁচল জানেন? ১০০০ বর্গফুটের বাড়ীতে (২.১নং নকশা) সিমেন্ট বচতের খতিয়ানটা দেখুন পরের পাতায়।

সিমেন্ট বাঁচতে পারে শতকরা ৭৫ ভাগ! আমাদের জাতীয় বার্ষিক সিমেন্টের অনটন ৩৫ লক্ষ টনের মত। দেখুন, বাড়ী বানাতে গিয়ে এ ব্যাপারে কতটা সাহায্য করতে পারেন দেশকে!

● ইস্টকহীন যজ্ঞ

বৈদিক রীতি অনুসারে হোমানলের বেদী তৈরী হত নির্দিষ্ট সংখ্যক ইট গেঁথে। 'মানসার' নামক পুঁথিতে নাকি এই ধরনের প্রায় আড়াইশো বেদী তৈরীর নির্দেশিকা রয়েছে—ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ সহস্রভুজ অবধি, গোলাকার বেদীতে অষ্টদল, ষোড়শদল থেকে সহস্রদল পদ্মাকৃতি। পরম নিষ্ঠার সাথে রীতি মেনে এই সব বেদী গড়া না হলে যজ্ঞ পণ্ড হত সে যুগে।

কিন্তু যুগ পাল্টেছে। টাকায় একটা করে ইট! আপনার আমার গৃহ নির্মাণের যজ্ঞ এমনিতেই পণ্ড হতে চলেছে। সরকার এবং পরিবেশ

কাজের দফা	সিমেন্টের খরচ (ব্যাগে)		কত সিমেন্ট বাঁচল ?
	প্রচলিত পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি	
ভিতের কংক্রিট	২০ ব্যাগ	০ ব্যাগ	২০ ব্যাগ
ঐ গাঁথনী	২৩ „	০ „	২৩ „
ডি. পি. সি.	২ „	০ „	২ „
মেঝের টালি	৩৫ „	০ „	৩৫ „
মেঝে-র লীন কংক্রিট	১৩ „	৩ „	১০ „
উপরের দেয়াল	৪৮ „	০ „	৪৮ „
লিনটেল ও কার্নিশ	১৬ „	৮ „	৮ „
চৌকাঠ ফিটিং	২ „	১ „	১ „
ছাদ	৫৫ „	৪০ „	১৫ „
প্লাস্টার	২৯ „	৮ „	২১ „
সেপ্টিক ও জলের ট্যাঙ্ক	৩ „	০ „	৩ „
উঠোন	৪ „	২ „	২ „
মোট	২৫০ „	৬২ „	১৮৮ „

বিজ্ঞানীরা কৃষিজমি, গোচারণ ও বনভূমি বাঁচাতে মোটেই ইট শিল্পের বাড়-বাড়ন্ত চাইছেন না। ফলে ইট ক্রমশ অদৃশ্য হচ্ছে বাজার থেকে। দামও বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কোনদিন হয়ত দেখব আধুনিক রামচন্দ্ররা মা দুর্গার আরাধনা করছেন একশো আট নীলোৎপলের বদলে একশো আটটি লাল থান ইট দিয়ে!

এ হেন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীরা চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন। তাঁরা লেগে পড়েছেন মাঠের মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরীর বিকল্প প্রযুক্তি সন্ধানে। ফলশ্রুতি হিসাবে বাজারে এসেছে ফোমব্লক, হল কংক্রিট ব্লক, স্ল্যাগউল ব্রিক, জিপসাম বোর্ড, সিণ্ডার ব্লক ও ফ্লাই অ্যাশ ব্রিক। শেষোক্তটি ইতিমধ্যেই ব্যবহারিক সাফল্যের মুখ দেখেছে। উত্তর

২৪পরগনা ও হুগলীতে একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ফ্লাই অ্যাশ (Fly Ash) থেকে ইট তৈরী করে বাজারে ছাড়ছেন। সল্ট লেকে কালো রংয়ের ফ্লাই অ্যাশ ব্লক দিয়ে তৈরী একাধিক বাড়ী চোখে পড়েছে। এটি বামুনের গরু বিশেষ। দামে সস্তা, পোড়ামাটির ইটের থেকে অধিক ভার বহনে সমর্থ, কৃষিজমি নষ্ট হওয়ার ভয় নেই, মশলা ও প্লাস্টারের খরচ অনেক কম, দেয়ালে নোনা লাগে না। বরানগরের ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটে যদি ঢোকেন, দেখবেন ডঃ প্রশান্ত মহলানবীশের আমলের সাবেকী বাড়ীগুলি সবই সিণ্ডার ব্লক দিয়ে তৈরী। বাইরের দিকে কোন প্লাস্টার করা নেই। বয়স কম বেশী অর্ধশতাব্দী পুরতে চলল...আই. এস. আই-এর ফাইল তাই বলে। কিন্তু দেয়ালের গায়ে বয়সের ছাপ কোথাও খুঁজে পাবেন না আপনি। ফ্লাই অ্যাশ সিণ্ডারেরই উন্নত সংস্করণ। অতএব এ ধরনের ইট (আপাততঃ নির্মাণকার্য বারাসত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ) সুলভে পেলে ব্যবহার করতে ইতস্তত করবেন না। আর শেষ কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তবাবুর বাড়ীতে সিণ্ডার ব্লক ব্যবহারের কথা শুনে শান্তিনিকেতনে তা ব্যবহারের উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বীরভূমের রাঙ্গামাটিতে সেদিন সিণ্ডার সৃষ্টি করার মত কোন কল-কারখানা গড়ে ওঠে নি। কবিগুরুর সার্টিফিকেট রয়েছে, আর দোনামনা হবার তো প্রয়োজন নেই। আপনি কি বাঙ্গালী নন ? শুরু করুন ইস্টকহীন গৃহযজ্ঞ।

ফ্লাই অ্যাশ হচ্ছে কলকারখানাজাত খুব মিহি ছাই। এত মিহি যে জোরে বাতাস দিলে তা উড়তে শুরু করে। তাই এর নাম ফ্লাই অ্যাশ বা উড়ুক্কু-ছাই। ফ্লাই অ্যাশ ইট তৈরী হয় ৯২ ভাগ ছাই, ৪½ ভাগ গুঁড়ানো কাঁকর চূণ ও ৩½ ভাগ জিপসাম পাউডার মিশিয়ে। উপাদানগুলি শুকনো অবস্থায় খুব ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর নির্দিষ্ট পরিমাণ জল দিয়ে মেখে নিলে কালচে রংয়ের কাদা তৈরী হবে। এই কাদা ছাঁচে ফেলে বানাতে হবে চৌক ব্লক যার মাপ হয় সাধারণত ৪″ × ৮″ × ৮″। ছাঁচের মধ্যে খানিকটা শক্ত হয়ে এলে ব্লকগুলিকে ছায়ায় সাজিয়ে ২০ দিন জলের ছিটে দিয়ে ভেজাতে হবে। এরপর আরো দশ দিন লাগবে শুকোতে। শুকনো ব্লকগুলি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৫০-৬০ কেজি চাপ শক্তি অর্জন করবে যা পোড়ামাটির ইটের সঙ্গে চমৎকার ভাবে তুলনীয়। ফ্লাই অ্যাশ ব্রিকের তাপরোধক ক্ষমতাও চমৎকার, ঘর ঠাণ্ডা রাখার পক্ষে সহায়ক।

ফ্লাই অ্যাশ ব্রিক যাঁরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বানাতে চান তাঁরা নেভেলী লিগনাইট কর্পোরেশানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এই সংস্থা তাঁদের ঘরবাড়ীর জন্য নিয়মিত ফ্লাই অ্যাশ ব্রিক তৈরী করে থাকেন।

● **ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে**

'৮৩'-য়ের গোড়ার দিকে গৃহীর গাইড (১ম খণ্ড)-এর ২য় প্রকাশ উপলক্ষে কলম ধরতে হয়েছিল, ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত কিছু কিছু উন্নত প্রযুক্তিকে ২য় সংস্করণে সামিল করতে। এর পর সাড়ে চার বছর কেটে গেছে। পাঠকদের আশীর্বাদেই ৮৪ সালে আমার জীবনের পরমতম প্রাপ্তিটুকু ঘটে গেছে সবার অলক্ষ্যে। পেশাগত জীবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দয়ামৃত সরাসরি বর্ষিত হয়েছে আমার উপর। প্রিয় পাঠকদের সঙ্গে সে আনন্দ-অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবার সুযোগ পেলাম আজ যখন অরুণবাবু বইয়ের ৩য় সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে বইটিকে পুরোপুরি পরিমার্জিত করার আদেশ দিলেন। আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ইতিহাস।

উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ রোডের উত্তরে লিবার্টি সিনেমার পিছনে নন্দ মল্লিক লেন, যোগেন দত্ত লেন ও রমেশ দত্ত স্ট্রীট জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এক বস্তি—রামবাগান ডোমপাড়া। ছিটে বেড়ার ঘরে আড়াই হাজার মানুষ দমবন্ধ করা ধোঁয়াশা আর আলোহীন পরিবেশে সৃষ্টি করত বাঁশ ও বেতের অপূর্ব শিল্পসুষমা আর ঢাক-ক্ল্যারিওনেটে বুনত সুরের মায়াজাল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য অর্থবল কিছুই ছিল না, তবু পঙ্কে জন্মাত পঙ্কজ। চল্লিশ বছর আগে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর হাত দিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর করুণা বর্ষিত হল ডোম শিল্পীদের মাথায়। স্বামীজীর চেষ্টায় বস্তিতে গড়ে উঠল বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, বাঁশ বেতের ট্রেনিং-কাম-প্রডাকসন সেন্টার, বাল-বিদ্যালয়, শিল্পসমবায়, ফ্রি-ডিস্পেন্সারী, ডোম যুবকদের নিজস্ব সমাজসেবী সংঘ জনকল্যাণ সমিতি। বহু শতাব্দী বাদে আবার 'আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজল, ঢাল মিরগেল বাদ্যি বাজল।'

১৯৮৩-তে রামকৃষ্ণ মিশান ও জনকল্যাণ সমিতি হাতে নিল এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। ছিটেবেড়ার দম আটকানো খোপগুলোর বদলে গড়ে তুলতে হবে আধুনিক পাকা আবাসন—৩৫০ শিল্পী পরিবারের জন্য ৩৫০ ফ্ল্যাট। এই সময় প্রকাশিত হয়েছে গৃহীর গাইডের প্রথম খণ্ড।

শ্রদ্ধেয় পাঠকদের এক অংশ রামকৃষ্ণ মিশানের সন্ন্যাসীদের কাছে প্রস্তাব রাখলেন আমাকে দেওয়া হোক এই প্রকল্প রূপায়ণের প্রযুক্তিগত দায়িত্ব। প্রকল্পের নামকরণ হল বিবেকানন্দ পল্লী। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার—শ্রীপ্রশান্ত সুর ও শ্রীবিনয় চৌধুরীর মাধ্যমে, হাত বাড়িয়ে দিলেন কলকাতা কর্পোরেসান—মেয়র শ্রীকমল বসু ও ডঃ পূর্ণেন্দু ঝায়ের মাধ্যমে। কে বলে লালে গেরুয়ায় খাপ খায় না ? বেদান্তবাদ ও মার্কসিজম মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে রামবাগানের চারতলা শিল্পী আবাসনে (১ নং চিত্র দেখুন)। দু' কোটি টাকার প্রোজেক্ট। সারা পৃথিবী টাকা যোগাচ্ছে জনকল্যাণ সমিতির মুষ্টি ভিক্ষার পাশে পাশে। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ও প্রশান্তবাবু দুজনেই মন্তব্য করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক নতুন ঘটনা। রাম-বাগানের ডোমরা প্রমাণ করে দিল কলকাতা মরে নি, মরবে না।

প্রকল্পের প্রযুক্তিগত কর্তৃত্ব হাতে পেয়েই ঠিক করেছিলাম সারা জীবনের সঞ্চিত ও গৃহীর গাইডে পরিবেশিত তত্ত্বগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে হবে এখানে। মোট বাইশটি বাড়ীতে সাড়ে তিনশো দু কামরা ফ্ল্যাট হবে। প্রতিটির আয়তন ৩০০ বর্গ ফুট। আজ অবধি ৯৬টি ফ্ল্যাট তৈরী হয়ে গেছে। খরচ প্রতি বর্গ ফুটে ১৫০ টাকার জায়গায় কমাতে পারা গেছে ১১০ টাকায়। ফলে আজ সারা দেশের পত্র-পত্রিকা রেডিয়ো টিভির নজর পড়েছে রামবাগানের উপর।

যে সব প্রযুক্তিগত কৌশলে সাতাশ শতাংশ সাশ্রয় করা গেছে তার অধিকাংশই গৃহীর গাইডের অন্তর্গত। তবে যেহেতু এই প্রকল্পে সেগুলিকে প্রমাণ করা হয়েছে পরীক্ষিত সত্য বলে তাই আর একবার আওড়াচ্ছি তার তালিকাটি আর সেই সঙ্গে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কৌতূহলী পাঠককে, চলে আসুন রামবাগানে। নিজের চোখে দেখুন কি কি কৌশলে কমানো হচ্ছে খরচের বহর। গৃহীর গাইডের থিয়োরীর প্র্যাকটিকাল ডেমনস্ট্রেশান। রামবাগানে যদি আসেন, দেখা করবেন জনকল্যাণ সমিতির প্রধান শ্রী পান্নালাল মানিকের সঙ্গে। উনি ঘুরে ঘুরে সব দেখবার বন্দোবস্ত করে দেবেন। সচক্ষে দেখে ঠিক করে নেবেন নিচের তালিকার কোন্ কোন্ কৌশল আপনার নিজের বাড়িতে লাগাতে পারেন :

(১) চারতলা জুড়ে বাইরের দিকে দশ ইঞ্চি ভারবাহী দেয়াল।

(২) প্রতি ফ্ল্যাটে মাঝখানে একটি করে ঢালাই পিলার দিয়ে হয়েছে ৩ ইঞ্চি পার্টিশানের মাধ্যমে তৈরী ঘর, বাথরুম, বারান্দা।

(৩) ঘরের উচ্চতা কমিয়ে সাড়ে আট ফুট করা হয়েছে।

(৪) প্রতি ঘরে একটি করে দেয়ালে প্লাস্টার বাদ দিয়ে ইট বার করা অংশ গাঢ় রং করে আর্থিক সাশ্রয়ের সাথে সৃষ্টি হয়েছে সৌন্দর্য।

(৫) দরজার মাপ ৩′ × ৭′ এর জায়গায় ২′-৯″ × ৬′-৪″ করা হয়েছে।

(৬) মধ্যবর্তী (অর্থাৎ এক, দুই ও তিন তলার) ছাদগুলি ঢালা হচ্ছে ঝামা খোয়া দিয়ে অথবা ইট সাজিয়ে আর. বি. ছাদ হিসেবে (এ বইয়ের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে পাবেন আর. বি. ছাদের বিবরণ)।

(৭) জোড়া জানালা (৩য় অধ্যায়ের 'ক' দ্রষ্টব্য) ব্যবহারে কমান হয়েছে কাঠের পরিমাণ।

(৮) চারতলায় (সর্বোচ্চ তলা) দেয়াল ১০ ইঞ্চির বদলে ৮ ইঞ্চি চওড়া করা হয়েছে (৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(৯) প্রতি তলায় ৪টি ফ্ল্যাটের জন্য রয়েছে ১টি মাত্র সিঁড়ি।

(১০) বারান্দার রেলিংয়ে গ্রীলের বদলে কংক্রীট জালি ব্যবহার করা হয়েছে। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়েও। বাথরুমেও।

(১১) জলের পাইপে গ্যালভানাইজড লোহার বদলে লাগানো হয়েছে রিজিড পি. ভি. সি. পাইপ।

(১২) ইলেকট্রিক লাইনের দৈর্ঘ কমানো হয়েছে কনসিলড লাইন করে।

(১৩) ছাদে জলছাদের বদলে হয়েছে ঢালাই মেঝে।

২২টি বাড়ীর মধ্যে ১৬টি এখনও বাকি। ন্যাশানাল বিল্ডিং অর্গানাই-জেশানের সহায়তায় আরো যে-সব প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে তা হল:

(১) কংক্রীট পিলারের জন্য প্যারাবোলিক ফাউণ্ডেসান ব্যবহার (ব্যাপারটা একটু জটিল; কোন পাঠক যদি জানতে সত্যই আগ্রহী হন, ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। বইয়ে লিখে বোঝানো সম্ভব নয়।)

(২) ৮″×৪″×৪″ মাপের সরকারী মেসিনে তৈরী উন্নত মানের ইটের ব্যবহার (মজার ব্যাপার এই ইটগুলির মান উন্নততর অথচ দামে সস্তা। মশলা ও প্লাস্টারের ক্ষেত্রেও সাশ্রয় শতকরা ৫০% !)।

(৩) রেন ওয়াটার ও ওয়েস্ট (waste) ওয়াটার পাইপ হিসাবে অ্যাসবেস্টস পাইপ লাগানো (কেবল সবচেয়ে নিচের অংশটিতে ঢালাই লোহার পাইপ লাগানো হবে)।

(৪) দরজা ও জানলার ফ্রেমে কাঠের বদলে কংক্রীটের ফ্রেম লাগানো (এটি কেবল সেখানেই সম্ভব যেখানে ফ্রেমের সংখ্যা কয়েক শ'। তা নাহলে সাশ্রয় সম্ভব হবে না)।

গৃহীর গাইড আজ আর ঠিক বই নয়। প্রকাশক-লেখকের সাথে গৃহাভিলাষী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক মিলে এটি একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের প্র্যাকৃটিকাল মডেল হাউস হচ্ছে বিবেকানন্দ পল্লী। গৃহীর গাইড পাঠের পুরোপুরি ফায়দা ওঠাতে হলে ঠাকুরের আশীর্বাদ ধন্য বিবেকানন্দ পল্লীর বাড়ীগুলি আপনাকে সচক্ষে দেখতেই হবে।

২

বাড়ী তৈরীর বীজমন্তর—নকশা

● **ঝেড়ে কাশতে হবে**

বাড়ীটি যদি কনে বউ হয় তো, নকশা,—রহমনের ভাষায়—'পেলেন' হচ্ছে বাড়ী তৈরীর, বাড়ী সাজানোর আয়না। ঘরের মানুষটির কাছ থেকে গোপনে জেনে নিতে পারেন রোজ সকালে বিকেলে যে তিনি অপরূপা হয়ে উঠেন তা আয়নারই দৌলতে। আয়না বিনা তার জীবন অচল। ঠিক আয়নার মতোই হচ্ছে নকশা। তাই রহমনের দল বাড়ী করতে করতে অনবরত তার ছাপ দেখে নকশায়—কেমন সাজছে তাদের কনে বউ! কেমনটি সাজা উচিত। বউ পছন্দ করার হক আপনার নিশ্চয় আছে কিন্তু তাকে সাজাতে গিয়ে আয়নাতো আর আপনি তৈরী করেন না। উচিত হচ্ছে নকশা তৈরীর 'কম্‌মোটি' বাস্তুবিদ্ বা নকশাকারের (Draughtsman) হাতে ছেড়ে দেওয়া। তবে নকশাটি যাতে আপনার দরকার মেটাতে পারে, হতে পারে আপনার রুচিমাফিক, যাতে আপনার বাজেটের বাইরে না যায়—আপনাকে সব সময় সজাগ থাকতে হবে। গোড়ার দিকে নকশার খস্‌ড়া (Sketch) তৈরী হয়। তখনই নকশাকারকেও সজাগ করে দিতে হবে, সাবধান করে দিতে হবে আপনার দরকার, রুচি ও বাজেটের বিষয়।

নির্মল বাবুর ছোটপিসি নকশা বানাবার সময় কিছু বললেন না! অথচ তৈরী বাড়ীতে শোবার ঘরের লাগোয়া বাথরুম দেখে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে গেলেন বাস্তুকারকে। এমন 'অনাচার' নাকি তিনি 'সাত জন্মেও' দেখেননি। আপততঃ সে বাথরুমের কল-পায়খানা-বেসিন খুলে নিয়ে তাকে বড় খোকার পড়ার ঘর করা হয়েছে। বাথরুমের ছোট জানালা দিয়ে আলো বড়ই কম আসে। বড় খোকার চশমার পাওয়ার বাড়ছে। এদিকে পূর্বের আলোবাতাস-ওয়ালা যে ঘর নকশাকার ছকেছিলেন বড় খোকার ঘর হিসেবে, সেটা খালিই পড়ে ছিল। পাশের বাড়ীর দিগ্বিজয়বাবু সেটা ভাড়া নিয়ে নিয়েছেন তাঁর চাকর ফত্নার ঘর হিসেবে। দিগ্বিজয়বাবুর নকশায় চাকরদের ঘর ছিল না। ফত্নার চশমা নেই। কাজেই জানা যাচ্ছে না যে তার চোখের পাওয়ার কমছে

কিনা। ঠিক সময় বাস্তুকারের কাছে সব ইচ্ছে ও ধারণার কথা খুলে না আলোচনা করলে এমনি ধারার অনেক গোলমাল হয়ে যেতে পারে। চাকরদের ঘর, রান্নাঘরের লাগোয়া ভাঁড়ার, পুজোর ঘর, বাসন মাজার, কাপড় কাচার জায়গা, মায় দখিনা বারান্দা অবধি বাদ পড়ে যেতে পারে। আমার এক খদ্দের, নেপালের কোন মিল মালিক বাড়ী তৈরী হবার পর আবিষ্কার করেছিলেন দোতালায় যাবার কোন সিঁড়ি রাখেন নি। সেই সিঁড়ির সমাধান করতেই তাঁর সঙ্গে আমার চেনা-জানা।

পয়লা ঠিক করতে হবে খরচের দিক দিয়ে আপনি কতবড় বাড়ী করতে পারবেন। ধরা যাক, বাড়ীর খাতে আপনার কাছে ১,৫০,০০০ টাকা আছে (লুকোছাপা করতে যাবেন না, আজকাল টাক্স-ওয়ালারাও চালাক হয়ে গেছে। তাদের নিজেদের ইঞ্জিনিয়ারিং সেল হয়েছে। নিজেদের বাস্তুবিদ্, নকশাকার, ওভারশিয়ার দিয়ে আপনার বাড়ী মাপজোথ করে ঠিক দামটি বের করে ফেলবেই)। এখন ধরা যাক আপনি আপাততঃ তিন তলার ভিত দিয়ে একতলা একটি বাড়ী করতে চান। বাস্তুবিদ্ আপনাকে জানিয়ে দিলেন এ জাতের বাড়ীর ভিতসমেত একতলা শেষ করতে প্রতি বর্গ মিটার ১,৫০০ টাকা খরচ পড়বে। মানে আপনার বাড়ীটি ১০০বর্গ মিটারের হতে হবে। (কি যেন বিড়বিড় করে শুধালেন আপনি ? বর্গ মিটার ? বর্গ মিটার হচ্ছে একমিটার × একমিটার জায়গা, এক বর্গ মিটার হচ্ছে ১০·৭৬ বর্গ ফুটের সমান।) এরপর হিসেব করুন আপনার ক'টি ঘর দরকার ও চাই—যেগুলি এই একশ' বর্গ মিটারের ভিতর আঁটাতে হবে। আঁটাতে গিয়ে হয়ত ঘরগুলির মাপে উনিশ-বিশ করতে হবে।

এর সাথে নকশাকারকে সরবরাহ করতে হবে জমির দলিলের নকশা অথবা তার মাপ। দলিলের নকশা দিতে পারলেই ভাল। এতে জমির কোন্ দিকে পথ বা নালা আছে ও আশেপাশে কোথায় গাছ, বাড়ী, পুকুর আছে তাও অনেক সময় দেখানো থাকে। না থাকলে নকশাকারকে একবার জমি দেখিয়ে নেওয়া উচিত। জমির চৌহদ্দি নকশাকারের চোখে দেখা থাকলে সঠিক নকশা করার সুবিধে হয়। যেমন ধরুন দুটি একই মাপের জমি—একটার পূব দিকে ঝিল বা জলা, অপরটির পূব দিকে একটা সাত-তলা বাড়ী। নকশাকারের দেখা থাকলে তিনি বুঝবেন পয়লা জমিতে সকালের রোদ আসবে খুবই বেশী, দুসরাতে সে রোদ আটকা পড়বে

সাত-তলা বাড়ীতে। তেমনি এই তলা বা বহুতল বাড়ী যদি দক্ষিণ দিক জুড়ে থাকে তা হলে আপনার জমিতে হেরফের হবে দক্ষিণা বাতাসের। পূবের রোদ, দক্ষিণা বাতাস যেমন দরকারী তেমনি উত্তুরে বাতাস (বিশেষ করে শীতকালে) এবং পশ্চিমে রোদ (গরমকালে) এড়াতে পারলেই ভাল। জল-হাওয়ার সঙ্গে নকশার একটা নিবিড় যোগ রয়েছে। কাজেই নকশাকারের জানা দরকার জমির কোন্ দিকটা উত্তর। এটা দলিলের নকশায় সাধারণতঃ একটা তীর এঁকে বোঝানো থাকে। নকড়ি মামার বাড়ীর নকশা করা হয়েছিল যথারীতি দলিলের নকশার তীর দেখেই। বাড়ী করতে গিয়ে বোঝা গেল দলিলের নকশায় ভুল ছিল। যেদিকটাকে উত্তর বলে দেখানো আছে সেটা আসলে পূব। খুব তুচ্ছ একটা ভুলে নকড়ি মামার সারা বাড়ীটাই বাজে হয়ে গেল। বাতাস আসার দিক জুড়ে রইল সিঁড়ি-পায়খানা আর চাকরদের ঘর। কাজেই দলিলের নকশায় পুরো ভরসা করবেন না। সরেজমিনে গিয়ে দেখে নেবেন, আশে-পাশের লোকের কাছ থেকে জেনে নেবেন উত্তর কোন্‌টা।

এই সব বিচারবিবেচনার পর নিচের তালিকাটি তৈরী করা হলো ঃ

		আয়তন	মাপ (লম্বা × চওড়া)
(১)	বসার খাবার ঘর—	১৮ বর্গ মিঃ	১৮ ফুট × ১০ ফুট
(২)	নিজের শোবার ঘর—	১২ „ „	১২ ফুট × ১০ ফুট
(৩)	অতিথির শোবার ঘর—	১০ „ „	১০ ফুট × ১০ ফুট
(৪)	রান্না ও ভাঁড়ার—	৬ „ „	৬ ফুট × ১০ ফুট
(৫)	বাথরুম, পায়খানা—	৫ „ „	৫ ফুট × ১০ ফুট
(৬)	পাম্প ও মিটার ঘর—	৬ „ „	৭ ফুট ৬ ইঞ্চি × ৮ ফুট
(৭)	সিঁড়ি (উপরে যাবার)—	১২ „ „	১৬ ফুট × ৮ ফুট
		৬৯ বর্গ মিটার	
(৮)	ঘরের দেয়াল বাবদ মোট আয়তনের ৩০ শতাংশ হিসাবে—	৩০ „ „	
	মোট	৯৯ বর্গমিটার	
	বা	১০০ বর্গমিটার	

তালিকা তৈরী, দিকনির্ণয় আর জলবায়ুর বিষয়টা মিটলে নকশাকারের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করতে হবে আপনার পরিবারের সামাজিক রীতি-নীতি নিয়ে। যেমন ধরুন:

(ক) কোন্ কোন্ ঘরে জুতো পরে যাওয়া চলবে অথবা বাড়ীতে ঢোকার মুখেই রাখতে হবে জুতোর আলমারী?

(খ) আপনার বাড়ীতে রান্না করা, কুট্নোকোটা, বাটনাবাটা হয় কি দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর, না মেঝেতে বসে? রান্নায় আঁশ-নিরামিষের বিচার আছে?

(গ) রান্না হয় গ্যাস, কয়লা অথবা ইলেকট্রিকে? কয়লায় হলে সে কয়লা কোথায় জমা করে রাখা হয়?

(ঘ) বাথরুম ঘরের লাগোয়া না উঠোনের এককোণে—কোন্টা আপনার বেশী পছন্দ? পায়খানায় কমোড, না প্যান চাই?

(ঙ) চানঘর আর পায়খানা কি আলাদা আলাদা চান?

(চ) পূজোর কুলুঙ্গী বসার ঘরে, শোবার ঘরে অথবা ছাদের চিলে-কোঠায়—কোন্টা আপনার মনোমত?

(ছ) চাকরদের আলাদা ঘর চাই, না সিঁড়ির তলায় ম্যানেজ হয়ে যাবে?

(জ) অতিথি শোবেন কোথায়—বসার ঘরে বেড-কাম-সোফায়, না আলাদা ঘর চাই? অতিথি না থাকলে কি সে ঘরে ছেলেরা পড়তে পারবে? ছেলে ও মেয়ে কি একই সঙ্গে পড়বে? তাদের আলাদা মাস্টার?

(ঝ) আপনার কি বই জমানোর বাতিক আছে? বই কোথায় থাকবে? বসার ঘরে, না শোবার ঘরে? কিম্বা গান-বাজনার চর্চা? বাড়ীতে মজলিশ বসে নাকি? বাগানের শখ?

(ঞ) আপনার কত বয়েস? ছেলে-মেয়ে ক'টি? আর হবে কি? (দোহাই দাদা, রেগে যাবেন না, ডাক্তারের কাছে রোগ লুকানো সাংঘাতিক রকম ভুল।)

● হাফ্-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া শক্ত নয়

আলোচনা থেকে নকশাকার সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন আপনার চাহিদা। তা মেটাবার মত করেই তৈরী করবেন আপনার নকশার খসড়া।

এবার কিন্তু আপনাকেও যাচাই করতে হবে এই খসড়া। পারলে ঘরের মানুষটিকে দিয়েও যাচাই করিয়ে নিন। এটুকু করতে আপনাকে নকশা দেখা শিখতে হবে। জানতে হবে অতবড় বাড়ীটাকে কিভাবে হাতে-ধরা ওইটুকু কাগজের মধ্যে আঁটিয়ে দেওয়া হল। বিরাট বাড়ীটার অনুপাত ঠিক রেখে ছোট করে আঁকা হয় নকশা। একে বলা হল স্কেলে (Scale) আঁকা। আপনার একশ বর্গ মিটারের তালিকা মাফিক বাড়ীর নকশাটি এই ফাঁকে এঁকে ফেলা হয়েছে—একমিটার সমান একশো মিটার স্কেলে। মানে দাঁড়াল মাপকাঠির ১০ মিলিমিটার আসলের একমিটারের (বা ১০০০ মিলিমিটারের) সমান। মাপকাঠি দিয়ে মাপলে সিঁড়ির চওড়াটা যদি দেখা যায় ২৫ মিলিমিটার, বুঝে নিতে হবে আসল সিঁড়ির ঘরটা হবে ২·৫ মিটার বা ৮ ফুট চওড়া। মাপকাঠিতে যে জানালাটা ১৮ মিলিমিটার চওড়া, আসলে তা হবে ১·৮ মিটার বা ছ' ফুট। নকশার ৩০ মিলিমিটার মানে আসলের ৩ মিটার (দশ ফুট)। জানালা, দরজা, পায়খানা, চানের জায়গা, রান্নাঘরের উনুন, সিংক্—এ সব যে রকম সঙ্কেতে দেখানো হয় তার তালিকাও রয়েছে। ওগুলো একবার নজর বোলালেই বুঝতে পারবেন, শক্ত কিছু নয়—একটু মন দিয়ে বুঝুন, সব জল হয়ে যাবে। মিসেসকে যখন বোঝাবেন, গেঞ্জীতে টান পড়বে, নিজেকে হাফ-ইঞ্জিনিয়ার মনে হবে!

কয়েকটি বিষয় নিয়ে নকশাকারের সঙ্গে তকা-তকি লাগতে পারে, যেমন ধরুন, বিধিমাফিক জমি ছাড়া, ঘরের আয়তন; দরজা-জানালা কোথায় বসবে; কেন বসবে; কত বড় হবে; কেমন করে মিউনিসিপ্যালিটি বা করপোরেশনের পারমিশন পাওয়া যাবে; সস্তায় কিস্তিমাত করতে হলে কি করতে হবে—এরকম নানান বিষয়। এর ভেতর বেশীর ভাগ বিষয়েই নকশাকার ভাল জানেন: তাঁর উপর নির্ভর না করা বোকামি। তবে মোটামুটি দু'চার কলম জেনে রাখতে পারেন, তাতে কোন অপকার হবে না। নকশাকারও মানুষ; নেহাৎই যদি আচম্কা ভুল করে ফেলেন, ভুল ধরা বা শোধরানো সহজ হবে। এমন কি আপনি হয়ত নিজের অজান্তেই দু একটা ভাল সমাধান দিয়ে বসতে পারেন।

● বার হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি হয়?

ধরুন, আপনার জমি ছিল আড়াই কাঠা (এক কাঠা মানে সাতশো কুড়ি বর্গ ফুট)—মানে ১৮০০ বর্গ ফুট (১৬৫ বর্গ মিটার) বা ১১ মিটার

(৩৬ ফুট) চওড়া ও ১৫ মিটার (৫০ ফুট) লম্বা। এবার নকশায় দেখুন ৩ মিটার (দশ ফুট) পেছনে ছাড়া হয়েছে, দু পাশে ১·২ মিটার (চার ফুট)। এটা কলকাতা করপোরেশনের বা মিউনিসিপ্যালিটির নিয়ম-মাফিক। সামনের ছাড়টা হয়ত আপনার বাগানের সখ মেটাবে। পেছনের আর পাশের ছাড় কিন্তু কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন এবং

২·১। আদর্শ বাড়ীর নকশা - ১০০ বর্গমিটার আয়তন

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল্ আইন মোতাবেক। সল্ট লেকের আইন-কানুন আর একটু গোলমেলে। সেখানে জমির মাপের উপর ছাড়ের কমবেশী হয়। অঞ্চল পঞ্চায়েতের এলাকায় চারপাশ থেকে তিনফুট ছাড় দেওয়ার আইন বলবৎ হয়েছে সম্প্রতি। এসব এলাকায়, নকশাদারদের উচিত পঞ্চায়েতী আইন মেনে চলা। আর বাস্তু-অভিলাষীর উচিত তাতে

নকশাকারকে উৎসাহ দেওয়া। তাতে করে ঘরে যে আলোবাতাস আসবে তাতে নিরোগ হয়ে বড় হবে বাড়ীওয়ালারই ছেলেমেয়েরা। ইংল্যাণ্ডের শক্ত মানুষ মিস্টার উইন্‌স্টন চার্চিল বলেছিলেন, "We shape the building and then the building shapes us." (মানুষ বাড়ী গড়ে তোলে, পরে বাড়ীই মানুষ গড়ে)। নকশা করানোর সময় মনে রাখবেন কথাটা। কাজে দেবে। এরপর আসুন ঘরের আয়তন, দরজা-জানালার মাপ আর জায়গা নিয়ে আলোচনা করা যাক। ঘরের আয়তন নির্ভর করে যে সব বিষয়ের উপর তা হল ঃ

(১) ঘরে যে সব আসবাব থাকবে ও তার যেরকম মাপ হবে।

(২) আসবাবের মাঝে যাতায়াতের জন্য যে পরিমাণ জায়গা ছাড়া হবে। নিচের ২'২ নং ছবিতে দেখুন কিভাবে ঘরের মাপ বার করা হয়েছে।
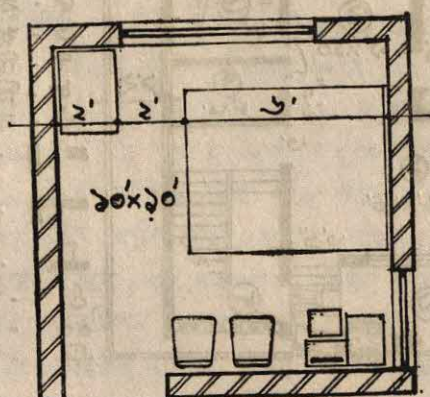
২.২—অতিথির শোবার ঘর—আদর্শ নকশা অনুযায়ী ঃ ঘরের মাপ বেরিয়েছে আসবাবের মাপ থেকে।

(৩) মিউনিসিপ্যাল আইনে ঘরের ব্যবহার-ভিত্তিক সবচেয়ে কম (Minimum) যে মাপ দেওয়া থাকে।

(৪) নকশা করার সময় ঘরগুলি একটার সঙ্গে আরেকটা খাপ খাওয়াতে গিয়ে যে ধরনের মাপ দরকার হয়। দেখুন, তালিকায় ঘরের যে মাপ ছিল—নকশায় তার বেশ খানিকটা বদল হয়ে গেছে। এটা নকশাকার করেছেন ভেবে-চিন্তেই, যাতে দরকারী আসবাব ঘরে

যথারীতি এঁটে যায়, আবার দেয়ালে দেয়ালে বাঁধন দিয়ে বাড়ীর কাঠামোটা (structure) যথাসম্ভব পোক্ত করে তোলা যায়। ঘরের আয়তন ঠিক করার সময় নকশাকারকে নিজের দরকারটুকু জানান কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে পীড়াপীড়ি করবেন না বা মনের ভিতর কোন গোঁড়ামি রাখবেন না। নকশাকারকে নিজের মতে কাজ করতে দিন। আপনি ঠকবেন না।

দরজা দিয়ে মানুষ, আসবাব; আর জানালা দিয়ে আলো-বাতাস ঘরে ঢোকে। এই অতি সাধারণ নিয়মটার ভিতরই লুকিয়ে আছে দরজা-জানালার কি মাপ হবে, কোথায় তাদের বসানো হবে তার সব ছকটাই। দরজা দিয়ে ঢুকবে মানুষ, খাট, টেবিল, আলমারী ঘরে এবং
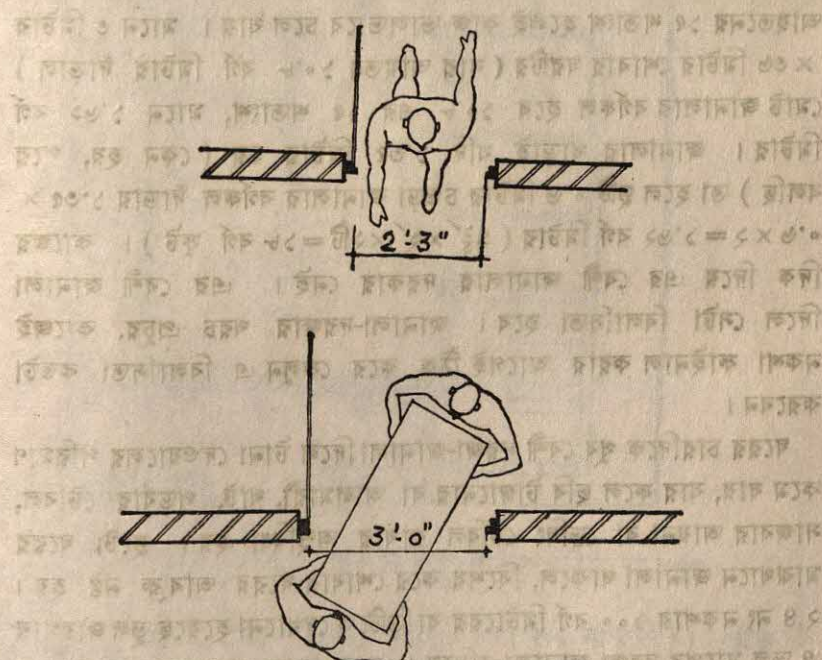
২.৩—বাথরুমে মানুষ ঢুকছে: সদর দরজায় আলমারী।

রান্নাঘরে। বাথরুমে বা মিটার ঘরে কেবল মানুষ ঢুকবে। ২.৩. নং ছবিতে দেখুন কেবল মানুষ ঢুকতে ২ ফুট ৩ ইঞ্চি বা ২৭ ইঞ্চি দরজাই যথেষ্ট। এই মাপের দরজাই, দেখুন ২.১ নং নকশায় বাথরুম ও মিটার ঘরে লাগানো

হয়েছে। যেসব ঘরে আসবাব থাকবে সেখানে লাগানো হয়েছে বড় দরজা। আসবাবের মধ্যে আলমারী ঢোকাতেই সব চেয়ে বেশী জায়গা লাগে : দরজার মাপ হওয়া উচিত ৩৩ ইঞ্চি থেকে ৩৬ ইঞ্চি চওড়া। খাড়াইয়ে দরজার মাপ সাড়ে ছয় ফুট হলেও চলে। তবে মাথায় সুটকেস বা কোন জিনিস নিয়ে সহজে ঢুকতে হলে খাড়াইটা সাত ফুট হওয়াই ভাল। জানালার মাপ ও কোথায় জানালা বসালে সবচেয়ে বেশী কাজে দেবে, এ নিয়ে বাস্তুবিদ্‌রা অনেক গবেষণা করেছেন। জানালার মূল কাজ ঘরের ভিতর আলো-বাতাস ছড়িয়ে দেওয়া। দোসরা কাজ ঘরের মানুষকে বাইরের লোকজন, খালবিল, বাগিচার শোভা দেখতে দেওয়া। গবেষণায় রকমারী জানালা পরখ করে দেখা গেছে মোট জানালার মাপ ঘরের আয়তনের ১৫ শতাংশ হলেই কাজ ভালভাবে চলে যায়। মানে ৩ মিটার × ৩৬ মিটার শোবার ঘরটির (যার আয়তন ১০·৮ বর্গ মিটার দাঁড়াল) মোট জানালার বর্গফল হবে ১০·৮ এর ১৫ শতাংশ, মানে ১·৬২ বর্গ মিটার। জানালার খাড়াই যদি ১·৩৫ মিটার হয় (কেন হয়, পরে বলছি) তা হলে দুটি ০·৬ মিটার চওড়া জানালার বর্গফল দাঁড়ায় ১·৩৫ × ০·৬ × ২ = ১·৬২ বর্গ মিটার (৪½´ × ২´ × ২টি = ১৮ বর্গ ফুট)। কাজের দিক দিয়ে এর বেশী জানালার দরকার নেই। এর বেশী জানালা দিলে সেটা বিলাসিতা হবে। জানালা-দরজার খরচ প্রচুর, কাজেই নকশা ফাইনাল করার আগেই ঠিক করে ফেলুন এ বিলাসিতা কতটা করবেন।

ঘরের চারদিকে খুব বেশী দরজা-জানালা দিলে টানা দেওয়ালের পরিমাণ কমে যায়, যার ফলে ছবি টাঙ্গানোর বা আলমারী, খাট, পড়বার টেবিল, সাজবার আয়না বা ড্রেসিং টেবিল রাখার অসুবিধা হয়। দুটো ঘরের মাঝখানে জানালা থাকলে, বিশেষ করে শোবার ঘরের আব্‌রু নষ্ট হয়। ২.৪ নং নকশায় ১০০ বর্গ মিটারের বাড়িটিকে দেখানো হয়েছে ভুল জায়গায় ও ভুল মাপের দরজা-জানালা বসিয়ে। ফলে দেখুন রান্না ঘর থেকে খাবার ঘরে যেতে হলে বসবার ঘরে অতিথিদের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। দুই শোবার ঘরের মাঝে জানালা দুই ঘরেরই আবরু শেষ করছে। জানালা ঘরের কোণে দেয়াল ঘেঁসে হলে, আলো ঘরে ঢুকে দেয়ালে ঠিকরে পড়ে সারা ঘরে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে (২.১ নং ছবি)। মাঝ দেয়ালে (২.৪ নং ছবি) হলে শুধু জানালার সামনাটুকুতেই আলো হয়, ঘরের

কোণা অন্ধকার থেকে যায়। জানালার খাড়াই সাধারণতঃ ১'৩৫ মিটার বা সাড়ে চার ফুট (আবাসিক ঘরের বেলায়) এবং ০'৭৫ মিটার বা
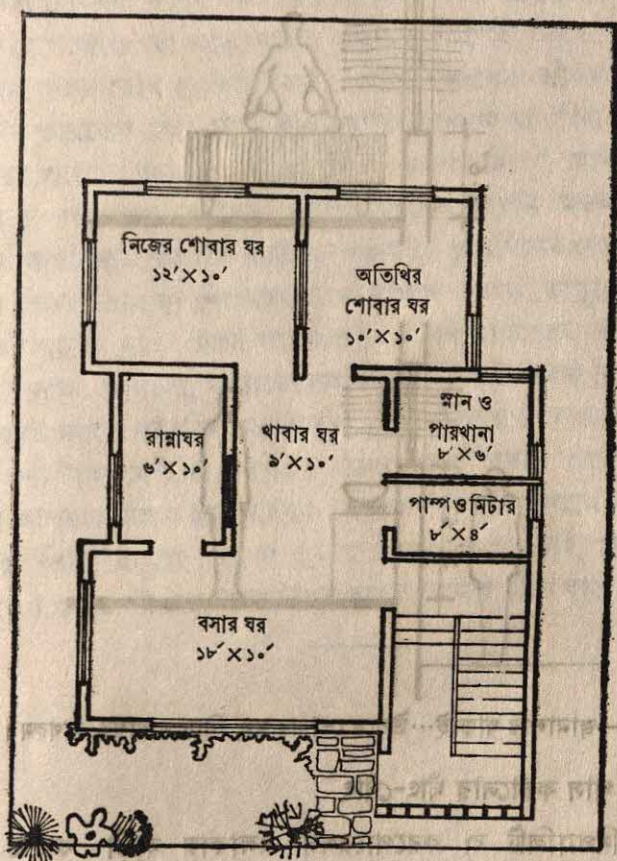
২.৪—আদর্শ নকশা…কিন্তু ভুল জায়গায় দরজা-জানালা বসিয়ে সব ভণ্ডুল।

আড়াই ফুট (বাথরুম ও রান্না ঘরের বেলায়) হয় (২.৫ নং ছবি)। এতে আবাসিক ঘরের মেঝের ও খাটের উপর ভালোভাবে হাওয়া খেলে, রান্না ঘরে জানালার নিচে টানা দেয়াল পাওয়া যায় রান্নার জায়গা হিসাবে এবং বাথরুমে বাইরের থেকে নজর দিতে না পারায় আব্রু বজায় থাকে অথচ সব জায়গাতেই জানালার মাথা দরজার সঙ্গে এক লাইনে থাকায় ঘরের ভিতর থেকে বেখাপ্পা দেখায় না।
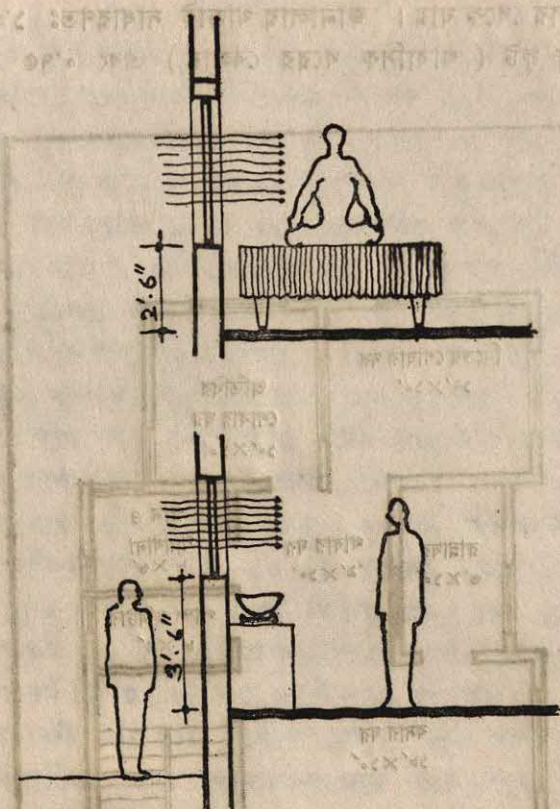
২.৫—জানালার খাড়াই···উপরে শোবার ঘর, নিচে রান্নাঘর, বাথরুম।

● নকশা পাস করানোর ঘাঁৎ-ঘোঁৎ

মিউনিসিপ্যালিটি বা করপোরেশন এলাকায় বাড়ী করতে হলে তাঁদের দেওয়া লাইসেন্স-ওয়ালা নকশাকার বা বাস্তুবিদ্‌কে দিয়ে নকশায় সই করিয়ে নিয়মমাফিক (মিউনিসিপ্যালিটির বেলায়) তিন বা ছয় (করপোরেশনের বেলায়) কপি নকশার ব্লু-প্রিণ্ট ও ফর্ম জমা দিতে হয়। ফর্ম মিউনিসিপ্যালিটির অফিসেই কিনতে পাবেন। অনুচিত হলেও বলতেই হচ্ছে নকশা পাস করাতে কিছু তদ্বির-তদারক করতেই হয়। নকশাকারের ঘাঁৎ-ঘোঁৎ জানা আছে, এ কাজের ভারটা তাঁর উপরেই ছেড়ে দেবেন। নকশা তাড়াতাড়ি ও সহজে পাস হবে। আপনারও সময় বরবাদ যাবে না। এখানে একটু নিজেদের ঢাক পিটিয়ে নিই। যেখানে

পয়সা দিয়ে নকশা করাতেই হচ্ছে, সেখানে হাতুড়ে নকশাকারকে দিয়ে কাজ না করিয়ে একটু বেশী পয়সা দিয়ে কোন ভাল বাস্তুবিদ্ বা আরকিটেক্টের অফিস থেকে নকশা করিয়ে নেওয়া অনেক পাকা মাথার কাজ হবে। অনেকটা চিকিৎসা করার সময় বেশী ফী দিয়ে ভাল ডাক্তার ডাকার মত। তাতে রোগ আশু ধরা পড়ে, জটিল হওয়ার আগেই সেরে যায়। তাও বিবেচনা করুন রোগ হয় বার বার ; বাড়ী করবেন জীবনে একবারই। বাস্তুবিদ্ ভারতের সেরা কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এ বিষয়ে পড়াশুনো করেছেন পাক্কা ছ বছর বা তারও বেশী। নকশা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন অহরহ। পড়াশুনো করছেন, গবেষণা করছেন, নানান মতলব ভাঁজছেন, কাজে লাগাচ্ছেন শত শত বাড়ীর নকশায়। এতদিনের লেখাপড়া, কাজ-কর্মের ভিতর তিনি যা শিখেছেন তার নাগাল কোন হাতুড়ে নকশাকার পেতেই পারেন না। ধরুন আপনার ১০০ বর্গ মিটারের নকশাটা। এ বাড়ীর দরজা, জানালা, কাঠামো সবকিছুর খুঁটিনাটি সমেত বিশদ নকশা ও এস্টিমেট করতে বাস্তুবিদ্ যে-কোন হাতুড়ে নকশাকারের থেকে হয়ত সাত আট শো টাকা বেশী ফী নেবেন। কিন্তু জোর গলায় বলতে পারি, এ টাকা আপনার উশুল হয়ে যাবে। সস্তায় কিস্তিমাত করার যে হাজারটা উপায় তিনি বাৎলে দেবেন (এর কেবল কয়েকটাই পরের অধ্যায়ে রয়েছে) তাতে ফী-এর টাকা উশুল হয়েও অনেক বেঁচে যাবে।

৩

সস্তায় কিস্তিমাত

● ওঁচা আরকিটেক্টের কেরামতি

রাজা হবুচন্দ্র আর তার সাকরেদ গবুচন্দ্রের মাঝে এক বিষম তর্ক—কে সস্তায় কিস্তিমাত করতে পারবে। সালিসী মানা হল অরণ্যদেবকে। অরণ্যদেব বাতলালেন—দুজনে এক আয়তনের দুটো ঘর বানাক। যার খরচা পড়বে কম—জিৎ তারই। ঘরের আয়তন ঠিক হল একশো বর্গমিটার। রাজবাড়ীর উঠোনে শুরু হল দুজনের ঘর। হবুচন্দ্র কাজে লাগালেন দিগ্বিজয় বাবুর মিস্ত্রি রহমনকে। আর গবুচন্দ্র লাগালেন কোলকাতার সবচেয়ে ওঁচা আরকিটেক্ট দুর্গা বোসকে। রহমনের ঘরের মাপ হল ৮ মিটার × ১২$\frac{১}{২}$ মিটার। ওঁচা আরকিটেক্ট বানাল ১০ মিটার × ১০ মিটার ঘর আর সেই সঙ্গে 'প্রাইজ' পাইয়ে দিলে গবুচন্দ্রকে। কেমন করে? সেই কথাতেই আসছি। রাজা মশায়ের ঘরে চার দেয়ালের লম্বা হল—১২$\frac{১}{২}$+১২$\frac{১}{২}$+৮+৮=৪১ মিটার। ইট লাগল দেদার। গবুর দেয়ালের মাপ হল ১০+১০+১০+১০=৪০ মিটার। ইট লাগল কম। সবচেয়ে ওঁচা আরকিটেক্টেরই কেরামতি দেখুন, গবু যদি আর একটু চৌকস আরকিটেক্ট লাগাত তাহলে আরো কত রকমে খরচা বাঁচত। যেমন ধরুন ঃ

(ক) দুটো একমিটার চওড়া জানালায় কাঠ লাগে চার দুগুণে আটটা। দুটো জোড়া দিয়ে দু মিটারের একটা জোড়া জানালা বানান। কাঠ লাগবে সাতটার সমান। মাঝের একখানা খাড়া কাঠ বেঁচে যাবে। রামবাগানে এ ভাবে সাশ্রয় হয়েছে অনেকটা।

(খ) দরজার খাড়াই সাত ফুট করার চালটা এসেছে বিলেত থেকে, যেখানে লোকেরা ষাঁড়ের ডালনা খেয়ে হরবখতই সাড়ে ছ ফুট লম্বা হয়ে যাচ্ছে। এদেশে পুঁটি মাছের ঝোলের দৌড় সাড়ে পাঁচ, বড়জোর পৌনে ছয়। দরজার খাড়াইটা সাড়ে ছয় করতে পারেন অনায়াসে। যেমন করা হয়েছে বিবেকানন্দ পল্লী, রামবাগানে। এক একটা দরজা এবং জানালার খরচ কমবে কম করে পঞ্চাশ টাকা।

(গ) ঢালাই ছাদ থেকে ঢালু ছাদটা হালকা হয়। দামেও সস্তা। আর হালকা বলেই ঢালু চালের বাড়ীতে ভিত লাগে কম। বাড়ীর সবচেয়ে

উপরের তলাটার মাথায় ঢালু চাল চাপান। খুত-খুতনি থাকলে তলায় ফলস্ সিলিং দিয়ে নিন। ঘরের ভিতর থেকে কিছু বোঝা যাবে না। ঘর গরম হবে না। ছাদ দিয়ে জল পড়বার ভয় কাকে বলে জানতেই পারবেন না অথচ জলছাদ করতে হবে না।

(ঘ) গাড়ী রাখবার গ্যারাজটা মূল বাড়ী থেকে আলাদা করে তৈরী করুন। মূল বাড়ীর একতলায় গ্যারাজ থাকলে তার উপর মেজেনাইন ঘর করার লোভ সামলাতে পারবেন না। এই ছোট্ট খুপরিটা পেতে সারা
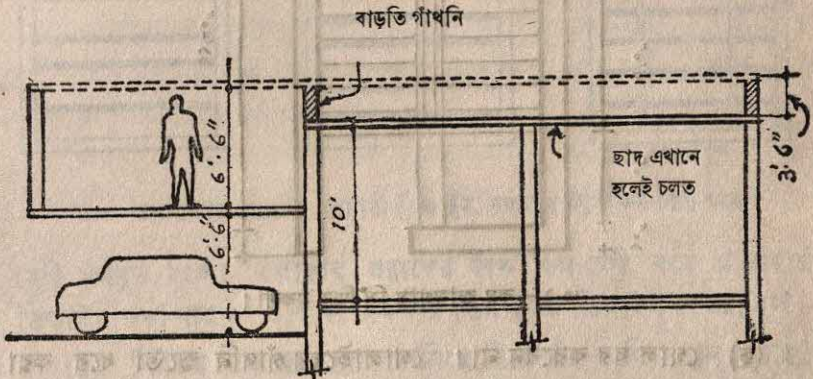
৩.১—মেজেনাইনের দরুন ফালতু গাঁথনি

একতলায় কতটা বাড়তি এবং ফালতু গাঁথনি করতে হয় ৩.১নং ছবিটায় তা দেখুন।

(ঙ) সিঁড়ির নকশাটা ভেবে-চিন্তে করলে পয়সা আর জায়গা দুই বাঁচে। ৩.২নং নকশায় সবচেয়ে কম জায়গায় করার মত সিঁড়ি এঁকে দেখানো হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে ঘরের ছাদ ৩ মিটার উঁচুতে।

(চ) ঘরের উঁচুর কথা বলতে মনে পড়ল, যদিও চল হচ্ছে ঘরের ছাদ ৩ মিটার (১০ ফুট) উঁচু করা, এ খাড়াই কমিয়ে ২·৭৫ মিটার (৯ ফুট) করতে পারেন। জাতীয় গৃহ সংস্থা (National Building Organisation) ও রুরকি ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে নানা জন গবেষণা করে দেখেছেন এতে ঘরের তাপ বাড়ে না, বাতাস একইভাবে পরিষ্কার থাকে এবং আবাসিকের স্বাস্থ্যের কোন হেরফের হয় না, অথচ গাঁথনির খরচ দশভাগের একভাগ কমে যায়। এ মতবাদ ভারতীয় মানক সংস্থা (Indian Standard Institute) এবং কোলকাতা করপোরেশনও

মেনে নিয়েছেন। রামবাগানে তাঁরা ঘরের উচ্চতা সাড়ে আট ফুট করার অনুমতি দিয়েছেন খরচ কমানোর খাতিরে।
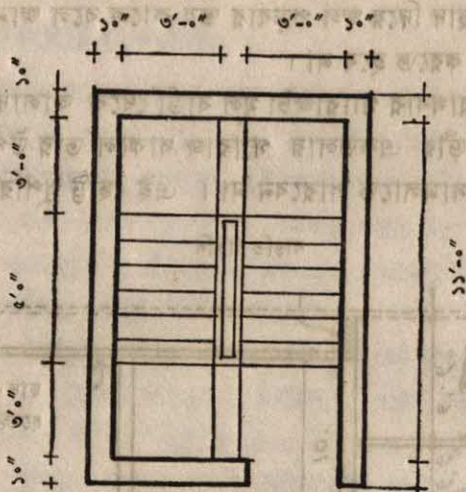
৩.২—কম জায়গায় সিঁড়ির নকশা।

(ছ) গোল ঘর করবেন না। গোলাইয়ের গাঁথনি সুতো ধরে করা যায় না বলে সময় এবং মশলা বেশী লাগে, খরচ বেড়ে যায়। এতে জায়গাও বরবাদ যায়। চৌকা ঘরে আসবাব সাজানো যায় ঠিক ঠিক ভাবে ও বেশী পরিমাণে।

(জ) বাথরুম, পায়খানা ও রান্না ঘর পাশাপাশি বা পিঠোপিঠি করুন। তাতে জলের পাইপ কম লাগবে। উদাহরণ ঃ রামবাগান আবাসন।

(ঝ) দরকারের অতিরিক্ত মাপে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক করবেন না। ওতে মেলাই খরচ। জল সরবরাহ অধ্যায়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্কের মাপ দেওয়া আছে। দেখে নিন। সেপ্টিক ট্যাঙ্কের ঢাকনিগুলো ঢালাই লোহার হলে হামেশাই চুরি যায়, দামও পড়ে মেলাই। বাজারে অর্ধেক দামে সিমেন্ট-বালি জমানো ঢাকনি পাওয়া যায়, তাই লাগান। চোরে ছোঁবেও না।

(ঞ) গাঁথনির সময় সরকারী ভাঁটার মেশিনে তৈরী ইট লাগান। এ ইটের সাইজ এক রকম ও তেড়া-বেঁকা নয় বলে জোড়াইয়ের কাজে সিমেন্ট-মশলা খুব কম লাগে। খরচ কমে। এ চেষ্টাও চলছে রামবাগানে।

(ট) জানালায় লোহার পাটির তৈরী গ্রীলের বদলে লোহার শিক লাগান। এক একটা জানালায় সাইজ হিসাবে ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা

বেঁচে যাবে। লোহার শিক উপর নিচে লম্বা-লম্বিভাবে না লাগিয়ে পাশা-পাশি আড়াআড়ি ভাবে লাগান। আড়াআড়ি শিক বেঁটে হওয়ায় অনেক
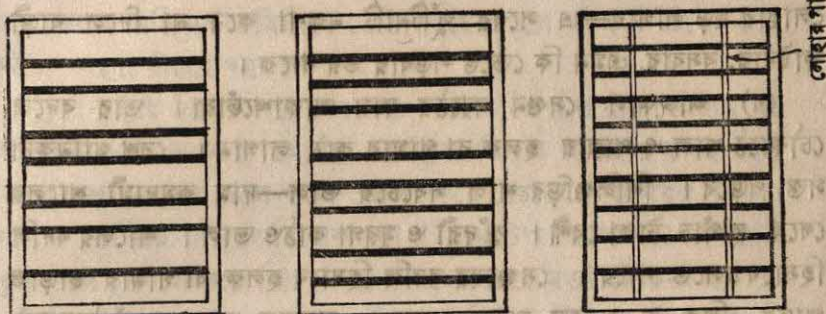
৩.৩—জানালার গরাদের রকমারী ডিজাইন, গরাদের ফাঁক কম-বেশী করে।

বেশী মজবুত হবে। লোহার গরাদের ফাঁক কম-বেশী করে মনোহারী ডিজাইন করা যায়। ৩.৩ নং নকশায় তিন রকম ডিজাইন দেওয়া হল।

(ঠ) সিঁড়ির ঘরে জানালা না বসিয়ে সিমেন্টের জালি বসান। বাহার খুলবে, আলো-বাতাসের সঙ্গে যে ছিটেফোঁটা বর্ষার জল আসবে তাতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। কিন্তু পুরো সিঁড়ির হিসেব ধরলে হাজার টাকা খরচ বাঁচবে। বারান্দায় লোহার রেলিং-এর বদলে জালির রেলিং করুন। ফাঁক দিয়ে বাতাস আসবে, দেখতে শোভন হবে, খরচ কমে যাবে তিন ভাগের দু' ভাগ। রামবাগানে ব্যবহৃত কৌশল এটি।

(ড) সাবেকি নিয়মে তিনতলা বাড়ীর একতলায় ২০ ইঞ্চি, দোতলায় ১৫ ইঞ্চি ও তেতলায় ১০ ইঞ্চি গাঁথনি করা হয়। এতে পয়সাও খরচা হয় বেশী, একতলা ও দোতলায় ঘরের আয়তনও ছোট হয়ে পড়ে অনেকখানি। আপনি তিনতলা অবধি ১০ ইঞ্চির উপর ১০ ইঞ্চি, তার ওপর ১০ ইঞ্চি—এই ভাবে সোজা গেঁথে যান। সল্ট লেকে ও রামবাগানে এভাবে করা হাজার হাজার বাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে—একেবারে নিরাপদে।

(ঢ) গাঁথনিতে আরো পয়সা ও জায়গা বাঁচানো যায় যদি ভেতরের ভারবাহী দেয়ালগুলির বদলে ঢালাইয়ের পিলার ও বিম দিয়ে ভার বহন করিয়ে, ভিতরের দেয়ালগুলিকে ১২৫ মিলিমিটার (৫ ইঞ্চি) বা ৭৫ মিলিমিটার (৩ ইঞ্চি) মোটা পার্টিশান দেয়াল হিসেবে গাঁথা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ দেখতে পারেন বিবেকানন্দ পল্লীর ডোমেদের ফ্ল্যাট। জিনিসটা একটু জটিল। ভাল ইঞ্জিনিয়ার বা বাস্তুবিদের সহায়তা দরকার। তিনি হিসাবমাফিক বিম ও পিলারের মাপ, কোথায় বসবে, ক'গাছা লোহার ছড় লাগবে—এ সবের খুঁটিনাটি নকশা করে না দিলে বাড়ী ফাটবার, বসবার, এমন কি ভেঙে পড়বার ভয় থাকে।

(ণ) আজকাল সেগুন কাঠের দাম আকাশছোঁয়া। তার বদলে চৌকাঠে শাল ও পাল্লায় হলক বা গামার কাঠ লাগান। বেশ খানিকটা সস্তা পড়বে। শিলিগুড়ির শাল সবচেয়ে ভাল—দাম কমদামী শালের থেকে দু'পাঁচ টাকা বেশী। সুঁদরী ও মুর্গা কাঠও ভাল। শালের বদলি হিসাবে চলতে পারে। সেগুনের বদলি হিসাবে হলক বা গামার ছাড়াও পাহুক, শিশু ও জারুল চালানো যায়। অনেকে আম ও কাঁঠালকাঠ লাগান। আম কাঁঠালে চট করে উই পোকা ধরে যায়। পারলে না লাগানোই উচিত।

(ত) জল-ছাদে মোটা খরচ হয়। আজকাল সিকো, রেলা, একোপ্রুফ বলে নানা-রকম জলরোধক কেমিক্যাল বাজারে পাওয়া যায়। ছাদ ঢালাইয়ের সময় কোম্পানীর নির্দেশ মাফিক এই কেমিক্যাল ঢালাইয়ের মশলায় মেখে নিলে ছাদ অনেক সস্তায় জলরোধক হয়ে যায়। এইসব কোম্পানী এ'বিষয়ে ৫ থেকে ১০ বছরের গ্যারান্টিও দিয়ে থাকেন। ঢালু-চালে ফুটো-ফাটা দিয়ে জল পড়লে আলকাতরা মাখানো চট বা টারফেল্ট লাগানো যায়। এটিও আমরা কাজে লাগিয়েছি রামবাগানে।

(থ) জলের পাইপ এতদিন লোহারই হত। এখন পি. ভি. সি.-র হয়েছে। পি. ভি. সি. পাইপ অনেক হাল্কা, বেশ মজবুত, অনেক চটপট কাজ সারা যায়, মরচে পড়ার কোন ভয় নেই অথচ দামে 'হাফ'! সরকারী পূর্ত বিভাগ ও সামরিক ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগে এ পাইপের বহুল চলন হয়েছে। পি. ভি. সি.-র টিউবওয়েলের ছাঁকনি (Strainer)-ও পাওয়া যায়। রামবাগানেও ব্যবহৃত হয়েছে এই প্রযুক্তি।

(দ) ঢালু চালে অ্যাসবেস্টস বা টিনের বদলে একরকম হাল্কা আলকাতরা মেশানো শিট (Asphaltic Roofing Sheet) বাজারে পাওয়া যায়—অনেকটা অ্যাসবেস্টসের মতই টেঁকসই, টিনের চালের মত মরচে পড়ে না অথচ দামে অনেক সস্তা। গোয়াল, খামার, রান্না বাড়ী, গুদাম প্রভৃতির ছাউনী হিসাবে খুব উপযোগী।

(ধ) ভিতের ঠিক উপরেই দেয়ালের নিচে একটা ২৫ মিলিমিটার (এক ইঞ্চি) পুরু ঢালাই দেওয়া হয় যার নাম ডি. পি. সি. (Damp Proof Course)। এখানে পয়সা বাঁচাতে হলে ঢালাইয়ের বদলে আলকাতরায় মিহি বালি মিশিয়ে মোটা করে ঢেলে দিন। কাজ হবে একই। পয়সা বাঁচবে অনেক।

(ন) বাইরে সিমেন্ট পলেস্তারা না করে যদি পয়সা বাঁচাতে চান তা হলে একটা কাজ করুন। গোবর বা তেঁতুল (যেটা আপনার কাছে সহজ প্রাপ্য) বেশ ঘন করে জলে গুলে ভাল করে দেয়ালের বাইরের দিকটা মাখান। শুকিয়ে গেলে আর এক দফা। এর উপর ভাল করে এলামাটি ও চুন গুলে চুনকাম করে দিন। প্রায় পলেস্তারার মতই টেঁকসই হবে।

(প) সমবায় ও কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে অনেকে মিলে বাড়ী করলে নানাভাবে পয়সা বাঁচানো যায়। যেমন ধরুন, বাস্তুবিদের ফী, তদারকী খরচ বা মাল পাহারাদারীর খরচ। একসঙ্গে বেশী মাল আনা হয় বলে মালের দাম ও পরিবহণ খরচও বেশ কিছু কম পড়ে। সমবায় বিষয়ে পরে আরো বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কি ভাবে গড়তে হয়, কিভাবে নানান সহায়তা পাওয়া যায়—এইসব।

(ফ) সমবায়ের বাড়ীতে নির্মাণ-কৌশলেও অনেক পয়সা বাঁচে। যেমন এক এক তলায় যদি চারটি করে বাসা বা ফ্ল্যাটের নকশা করা যায় তা হলে সিঁড়ি তৈরীর খরচাটা চার ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ৩.৪ নকশা দেখুন, অথবা দেখে আসুন রামবাগানের ফ্ল্যাট।

(ব) আরো কিছু খরচ এ ধরনের বহুতল বাসাবাড়ীতে ভাগ হয়ে যায়। অনেক জনের মাঝে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে জমির দামটা কারু গায়েই লাগে না।

(ভ) বহুতল বাসাবাড়ীতে জল সরবরাহ ও স্যানিটারী লাইনগুলি একসঙ্গে হওয়ায় তার খরচও বেশ খানিকটা ভাগ হয়ে যায়। বর্ষায় জল নামার পাইপ, সেপ্টিক ট্যাংক, আগুন নেবানোর জিনিস, জল সরবরাহের চৌবাচ্চা, সীমানার পাঁচিল—এ সবের খরচ তো ভাগ হয়ে নামমাত্র হয়ে যায়।

(ম) 'চার ফ্ল্যাট : এক সিঁড়ি' নকশাটা ভালভাবে নজর করে দেখুন। দুটি বাসার মাঝখানে একটি দেয়ালই দুই বাসার সীমানা রচনা করেছে। এই দুই কর্তা আলাদা আলাদা বাড়ী করলে দুজনকেই এই

দেয়ালের পুরো খরচ বইতে হত। ঐখানে দেখুন কেমন আধা-আধি ভাগ হয়ে গেল। দশের লাঠি একের বোঝা।

৩,৪—চার ফ্ল্যাট : এক সিঁড়ি
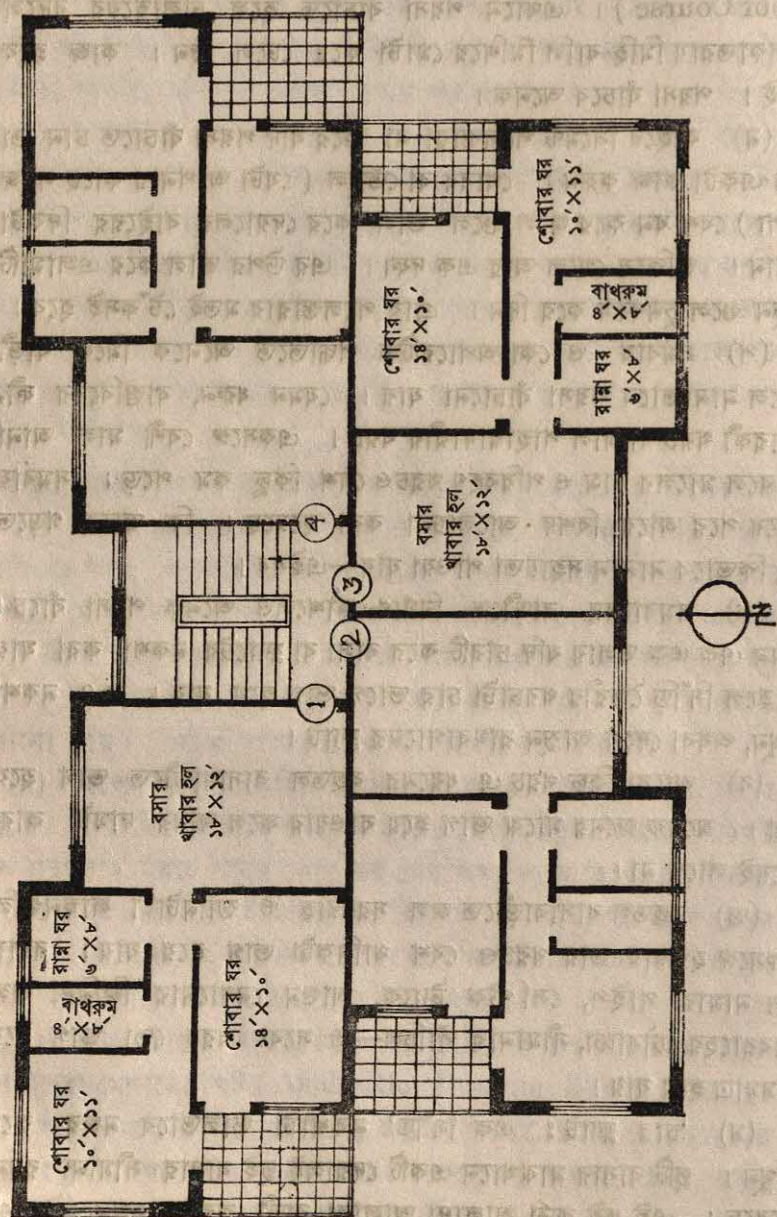
(য) বাড়ীর চারপাশটা, কলতলা, বাসন মাজার ও গাড়ী ঢোকানোর জায়গাগুলো শান বাঁধাতে হয়ই। এগুলো সিমেন্টের ঢালাই না করে ইটের ১২৫ মিমি. (৫ ইঞ্চি) দিকটা খাড়া করে (মিস্ত্রীকে বলবেন 'খাদ্‌রি'তে ইট বসাতে) সিমেন্ট-মশলা দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলুন—যেমন থাকে রেলের ইষ্টিশনগুলোতে। অযথা খরচ অনেক কমে যাবে। ইষ্টিশনে যখন টিকে আছে, আপনার বাড়ীতে তু'পুরুষ চমৎকার কেটে যাবে। ইটগুলো কেনার সময় এক নম্বর 'পিকেট' (Peaked) ঝামা দেখে নেবেন।

(র) সমবায়িক বাড়ীতে সময় ও খরচ কমানোর একটা বড় উপায় হচ্ছে 'প্রিকাস্ট' ঢালাই করা। এই পদ্ধতিতে ছাদের ঢালাইটা মেঝেতে করে নেওয়া হয় সমান মাপের তকতার মত করে। পরে এক এক করে পাশাপাশি সাজিয়ে ছাদ করে নেওয়া হয় দেয়ালের মাথায়। সময় বাঁচে, কারণ ছাদের ঢালাই হয়ে যায় দেয়াল গাঁথার সঙ্গে সঙ্গে। আর খরচ বাঁচার কারণ কয়েকটা, যেমন—খুঁটির উপর কাঠের তক্তা মেরে ঢালাইয়ের কাঠামো বা সাটারিং করতে হয় না বলে অনেক খরচ বাঁচে, সময় বাঁচার ফলে আনুষঙ্গিক খরচ (Overhead) বেঁচে যায়; সহজ তদারকীতে কাজ চলে বলে খরচ কম হয়! এ বিষয়ে যদি কোন সমবায় সমিতির কৌতূহল থাকে মেসার্স শালিমার টার প্রোডাক্টস লিঃ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এঁরা এ বিষয়ে ওস্তাদ।

(ল) জমির সীমানার দেয়ালটা (বাউণ্ডারী ওয়াল) খুবই খরুচে জিনিস। আপনার একশো বর্গ মিটার বাড়ীটা যে আড়াই কাঠা জমিতে তৈরী হবে তার ১·২ মিটার (চার ফুট) উঁচু বাউণ্ডারী দিতে গেট বাদেও বর্তমান দরে ১০,০০০ টাকা খসে যাবে। শাল কাঠের খুঁটিতে কাঁটা তার আটকে মেহেদির বেড়া দিয়ে তাকে ঢেকে দিন। খরচ হবে খুব জোর তো ২,৫০০ টাকা। মেহেদি বড় হতে লাগবে বছর তু তিন। বেড়াল, কুকুর, গরু, মানুষ—সকলের ঢোকা বন্ধ। মাঝে মাঝে গাছগুলোকে সমান করে ছেঁটে দেবেন। অপূর্ব দেখতে লাগবে।

(ব) ঘরের ভেতর রং করতে হলে সাধারণতঃ ডিসটেম্পার বা প্লাস্‌টিক রং লাগানো হয়। এ ধরনের রং খুব দামী। এর বদলে বাজারে বাইরে লাগাবার যে সিমেন্ট পেন্ট (যেমন স্নোশেম, সিশেম, সোয়েডশেম—নানা কোম্পানীর নানা নাম) পাওয়া যায় তাই লাগাতে পারেন। দেয়াল
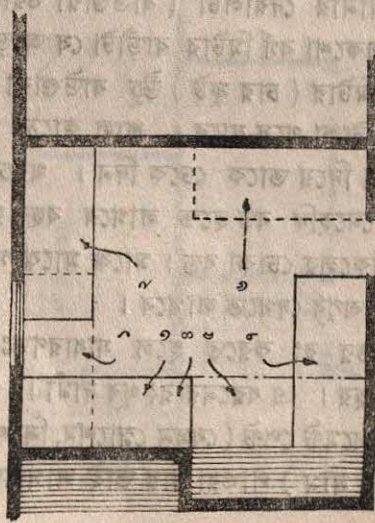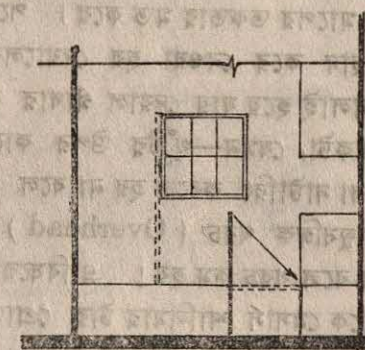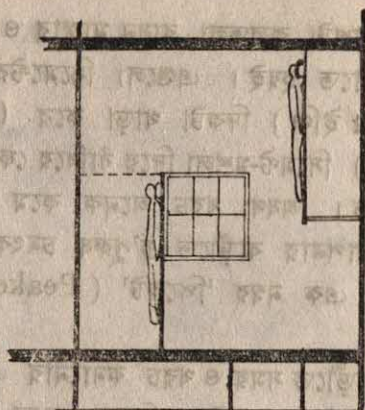
৭.৫—সাত ভায়ের শোবার ঘর—প্ল্যান ও সেকসান (পাশ থেকে) : ১ প্রথম ভাই, ২ দ্বিতীয় ভাই, ৩ তৃতীয় ভাই, ৪ চতুর্থ ভাই, ৫ পঞ্চম ভাই, ৬ ষষ্ঠ ভাই, ৭ সপ্তম ভাই।

ডিসটেম্পারের মত নিখুঁত দেখতে না হলেও বেশ সুন্দরই দেখাবে। সিমেণ্ট পেণ্ট প্লাস্টিকের মতই ধোয়া যাবে ও টেকসই হবে।

(শ) ভাবুন আপনার সাতটি ছেলে, ৯টি মেয়ে (আঁতকে উঠবেন না, শুধু ভাবতেই বলছি)। বাড়ীর নকশা করতে গিয়ে কি করবেন? ষোল আর কর্তা গিন্নীর এক—সতেরোটা শোবার ঘর করবেন (ফের আঁতকাচ্ছেন!)? না মশাই, অত খরচ পোষাবে না। বাস্তুকারকে বিপদটা বুঝিয়ে বলুন। তিনি তিনটে ঘরেই সামলে দেবেন। একটা হবে ছেলেদের ঘর (৩.৫ নং নক্শা), আর একটা হবে মেয়েদের ঘর। সেখানেও ওই একই রকম ট্রেনের মত বাংকে শোয়ার সিস্টেম। আপনাদের বুড়ো বুড়িকে অত কসরৎ করতে হবে না, সেখানে সাধারণ খাট-বিছানা।

(ষ) যৌবনে কম খরচে এক কামরায় বাসা; সম্ভ যদি বিয়ে করে থাকেন—এইই বহুত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'আমি আর তুমি'র সঙ্গে জোটে 'ওদের' দল; রোজগারও বাড়ে। সেই সঙ্গে এককামরার বাসা যদি বেড়ে দুই-তিন কামরা হতে থাকে, ঘটনাটা কি মনের মত হবে না? বাড়ীও কি মানুষের মত বাচ্চা পাড়বে? না মশাই। ঠিক তা নয়। ফরমুলাটা হচ্ছে বাড়ন্ত বাড়ীর (Growing House)। আপনার একশো বর্গ মিটারের বাড়ীটাই ধরা যাক। পয়লা থেপে বসবার ও খাবার ঘরের হলটা আর বাথরুম-পায়খানা গড়ে নেওয়া হল। পাঁচ বছর বাদে জুড়লেন রান্না-ঘর আর পাশের বড় শোবার ঘরটা, রান্নাঘর না হওয়া অবধি রান্নার কাজটা হলেরই এক কোণে চালালে হবে। মন্দ কি? ঘরের কোণে নতুন বউ তোলা উনুনে রান্না সারছেন। আগুনের আঁচে তার মুখ একটু লালচে; কপালে মুক্তোর মত দুলছে দু ফোঁটা ঘাম—তাঁকে দেখতে লাগছে মনলোভা। আপনি আর এক পাশে শুয়ে কফির কাপ নিয়েই উপভোগ করতে পারছেন সেই অপরূপ রূপ! রান্না ঘর আর বড় শোবার ঘর তৈরী হয়ে গেলে পাঁচ বছর চুপচাপ থাকুন। তারপর যোগ দিলেন ছোট শোবার ঘর আর মিটার ঘরটা। ওইটাই হবে বড় খোকার পড়ার ঘর। বড় শোবার ঘরে গিন্নী ছোট খোকা, পুটি আর কোলেরটিকে নিয়ে আস্তানা গাড়লেন। ছোট ঘরটি জুটল আপনার বরাতে। এরপর আবার থেমে যান বড় খোকার ডাক্তারী পাস না করা অবধি। বড়খোকার বিয়েতে যা কামালেন (লজ্জা কি? ও অপকর্মটি কোন্ বাঙালী 'ভদ্রলোক' না করেন!) তাই দিয়ে তৈরী করে ফেলুন সিঁড়িটা। রিটায়ার করলে

অনেকগুলো টাকা হাতে পাবেন। তাতে সেরে ফেলবেন দোতলা। ভাড়াটে বসিয়ে দেবেন একতলায়। এর নাম বাড়ন্ত বাড়ী। মতলবটা খুলে বলুন বাস্তুবিদকে। সেই ভাবে গোড়াতেই পুরো বাড়ীটার নকশা (Master plan) বানিয়ে ফেলবেন তিনি। কাঠামোটার পরিকল্পনা এমন ভাবে করবেন যাতে টুকরো টুকরো জোড়া দিয়ে গড়ে তোলা যায় বাড়ীখানা।

(স) আর. বি. সি. (Reinforced Brick Concrete) সস্তায় ছাদ ও জানালার উপরের লিনটেল ঢালাই-এর এক চমৎকার উপায়। এতে পাথরকুচি বা ঝামা খোয়ার বদলে কাজে লাগানো হয় এক নম্বর পিকেট ঝামা ইট। আস্তো ইটগুলোকে এক ইঞ্চি (২৫ মিমি.) ফাঁক করে সারি দিয়ে সাজানো হয়। ফাঁকের মাঝ দিয়ে পেতে দেওয়া হয় দশ মিলিমিটার সাইজের লোহার ছড়। তারপর ফাঁকগুলো ভরে দেওয়া হয় সিমেন্ট, বালি ও পাথরকুচি দিয়ে। তিন মিটার অবধি চওড়া ঘরের ছাদ হিসাবে আর. বি. সি. চমৎকার কাজ করে এবং ঢালাই ছাদের থেকে অনেক সস্তা। তবে ইটের ছাদ বর্ষার জল শুষে নেয়, ফলে ভিতরের লোহাতে মরচে পড়ে ছাদ ফাটিয়ে দেয়। এই কারণে আর. বি. সি. ছাদকে খুব ভাল করে জল-রোধক করে নেওয়া বিশেষ দরকার। প্রযুক্তিটি রামবাগানে আমরা কাজে লাগাতে চলেছি।

(হ) বসার ঘর আর খাবার ঘরের মাঝখানের দেয়ালটা বাদ দিন। খরচ কমবে। ছোট বাড়ীতে একটা বড় হলঘর পেয়ে যাবেন মুফতেই, যা কাজে লাগবে পূজো, বিয়ে, যে কোন উৎসবে। নেহাৎই যদি নিরালায় বসে রাজভোগ সাঁটতে চান, দু'ঘরের মাঝখানে একটা পর্দা ঝুলিয়ে নেবেন।
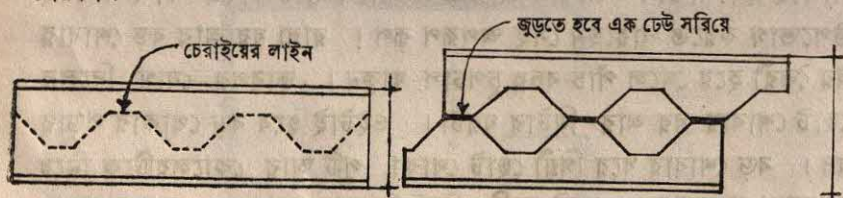
৩.৬—ম্যাজিক : ৬" থেকে ১০" বিম।

(ড়) অনেক সময় বড় ঘরে ছাদের ভার নিতে মাঝখান দিয়ে লোহার বিম থাকে। বাস্তুবিদ হয়তো ২৫০ মিমি. (১০ ইঞ্চি) বিম দিয়েছেন যা

কিনতে আপনার দমফাটার জোগাড়। পাওয়াও যাবে কিনা সন্দেহ। এ হেন সময় ১৫০ মিমি. (৬ ইঞ্চি) বিম দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন যদি ৬ ইঞ্চি বিমকে ৩.৬ নং ছবির মত করে চিরিয়ে নেন এবং একটু সরিয়ে ঝালাই করে নেন করাতের দাঁতের মত করে। চিরতে গ্যাস কাটার ও ঝালাই করতে ওয়েল্ডিং মেশিন লাগবে। ছয় ইঞ্চি বিম দিয়ে সামাল দিয়ে যে পয়সাটা বাঁচাবেন কেবল তা দিয়েই আপনার বাস্তুবিদের ফী-টা দিয়ে দেওয়া যাবে।

(ঢ) চৌকস আরকিটেক্টের তারিফ করতে গিয়ে তো বর্ণমালা প্রায় শেষ হয়ে গেল। শেষ মতলবটা কানে কানে বলে যাই, প্রকাশক যেন না শুনতে পান। এই 'অখাদ্য' বইটা পড়া হয়ে গেলে পুরানো বইয়ের দোকানে বেচে দিন। দামের আদ্ধেক পকেটে আসবে। এই মাগগি-গণ্ডার দিনে তাই বা কম কি!

● উল্টো-পুরাণ

একটা দিকে কিন্তু নজর রাখবেন স-ব সময়। কথায় বলে "সস্তার তিন অবস্থা।" খরচ বাঁচানোর নেশায় এমন কিছু করে বসবেন না যা টেঁকসই নয় বা কাজের নয়। রাস্কিন বলে গেছেন, ভালো বাড়ীর তিনটে গুণ—জোরদারী (stability), কামদারী (utility) এবং চটকদারী (beauty)। জোরদার, কামদার, চটকদার না হলে সে বাড়ীর কদর হয় না। কিছু করার আগে যাচাই করে নেবেন তার জোরদারী, কামদারী আর চটকদারী। তা সে শহরের ঢাউস পাঁচ মহলাই হোক আর গাঁ ঘরের মাঠ-কোঠাই হোক। তবে গাঁয়ের মাঠ-কোঠার ধরন-ধারণ সব আলাদা। তার কথাতেই আসা যাক......

৪

পল্লী মঙ্গলের আসর

"কাঁটা দিয়ে আঁটা ঘর—	ডাকে যদি ফেরীওলা
আটা দিয়ে সেঁটে,	হাঁকে যদি গাড়ী,
সুতো দিয়ে বেঁধে রাখে	খসে পড়ে কড়িকাঠ,
থুতু দিয়ে চেটে।	ধ্বসে পড়ে বাড়ী।
ভর দিতে ভয় হয়	বাঁকা চোরা ঘরদোর
ঘর বুঝি পড়ে,	ফাঁকা ফাঁকা কত,
খক্ খক্ কাশি দিলে	ঝাট দিলে ঝরে পড়ে
ঠক্ ঠক্ নড়ে।	কাঠ কুটো যত।"

—"বুড়ীর বাড়ী" : সুকুমার রায়

● যত হাসি তত কান্না

পল্লী বাংলার ঘরবাড়ীর এত জীবন্ত বর্ণনা আর কিছু পড়িনি। মনে হয় সুকুমার বাবু যেন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে জোগাড় করেছিলেন তাঁর কবিতার মালমশলা। জোতদার-পোতদারের মাঠকোঠা থেকে শুরু করে সবচেয়ে দুঃখী ভাগচাষীটির ঝুপড়ী, দেখবেন সব জায়গায় হুবহু মিলে গেছে কবিতাটা। এ কবিতার মাঝে হাসি যতটা আছে, কান্না লুকিয়ে আছে তার শতগুণ। সে কান্না পল্লী বাংলার ঘরের নামে অন্ধকূপে হাঁপিয়ে মরা জেলে আর জোলা, কুমোর আর কামার, চাষী আর তাঁতীর। এদের বাড়ীর দেয়াল বর্ষার জলে গলে বিসর্জন-দেওয়া মাটির ঠাকুরের খোড়ো রূপ নিয়েছে। চালের পচা খড়ের ফাঁকে রোদের, বর্ষার জলের অবারিত আনাগোনা। দরজার কপাট উইয়ে খেয়ে গেছে। জানালার পাল্লা এঁটে বসা—খুলতে গেলে চৌকাঠ সমেত উপ্‌ড়ে আসবে। মেঝে সেঁত-সেঁতে, পা রাখলে ভিজে যায়। আলো-বাতাসহীন এই জেলের কামরায় ছেলেমেয়েরা সারা বছর ধরে ভোগে সর্দি আর কাশিতে। জীবনটা অকালেই শেষ করে টি. বি. দিয়ে।

বাংলার কুঁড়েঘর এককালে ছিল আর্কিটেক্‌চারের এক অতি উম্‌দা নিদর্শন। বাংলার এই চালাঘর তৈরী হত বাঁশ, খড় আর বাঁশের তৈরী

বেড়া দিয়ে। এই বাঁশ আর খড়ের কারণে ছাদ সমেত পুরো ইমারতটাই হত কোলানো, ফাঁপানো, ঢেউ খেলানো। পাথরের বা কাঠের ইমারতের মত সোজা, খাড়া, চৌকোণা বা কোণ বার করা হত না। নরম ঢেউ-খেলানো বাঁকগুলো মানুষের নজর কেড়ে নিত। এই বাঁক আর ঢেউগুলো বাংলার চালাঘরের মাঝে জন্ম দিয়েছিল এক নবীনতার, এক নরম মিষ্টি ভাবের—যা কাঠ-পাথরের ভিতর মানুষ পেতো না। বাংলার কুঁড়েঘরের রূপ ছিল তার গঠনের উপাদানে—বাঁশ আর খড়ে। পলিমাটির সমতল দেশ বাংলা, পাথর এখানে পাওয়া যেত না। কয়লার চলন ছিল না। ইট পোড়াতে দরকার হত কাঠের আগুন। তাতে খরচ বাড়ত ভীষণ। কাজেই পোড়া ইটের চলনও বিশেষ ছিল না; বিশেষ করে গাঁ ঘরের গরীব মানুষের ভিতর। কিন্তু বাঁশ, বাঁশের চেচারী, নল, মাটি, খাগড়া, হোগলা, গোলপাতা—এসব উপাদানের এমন শক্তি নেই যে বাড়ীকে কালজয়ী জীবন দেয়।

ঘুরে দেখুন 'গ্রামে গ্রামে'—এমন সব উপাদানে তৈরী হয়েছে ঘরবাড়ী যা না রুখতে পারে আগুনকে, না পারে নদীর বানকে, না পারে বর্ষার জলকে। আগুনে পুড়ে, জলে গলে, পচে—"খসে পড়ে কড়িকাঠ, ধ্বসে পড়ে বাড়ী।" কিন্তু কেন? শহরে শহরে সিমেন্ট, বালি আর পাথরকুচি দিয়ে মানুষ গড়ে তুলেছে পনেরো তলা, কুড়ি তলা সব ইমারত। পল্লী অঞ্চল কি দোষ করল? কারণ তিনটে। মূল—বা এক নম্বর কারণ পয়সার অভাব, গতানুগতিক পাকা বাড়ী তৈরীর খরচ এত বেশী যে পল্লী বাসী তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। দুই—সিমেন্ট, টিন, অ্যাসবেস্টস বা পোড়ানো ইট যা বাড়ীকে বানভাসী, আগুন আর বর্ষার হাত থেকে বাঁচায়, পথঘাটের অভাবে শহুরে অঞ্চলের বাইরে তা পাওয়া যায় না। তিন—'গ্রামদেশের' মিস্ত্রী-মজুরের বাপ-ঠাকুরদা যা শিখিয়ে গেছেন তার বাইরে টেকসই মালমশলার বিষয় কিছুই জানা নেই।

● সোনার চেয়েও খাঁটি ······বাংলা দেশের মাটি

ইণ্টারন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অব হাউসিং টেকনোলজী বা আন্তর্জাতিক আবাসন নির্মাণ শৈলী সংস্থার মতে এই শতকের শেষে পৃথিবীতে মানুষের দল ৬০০ কোটিতে দাঁড়াবে। এই জনসমুদ্রকে ঘরবাসী করতে হলে রোজ চুয়াত্তর হাজার (বিবেচনা করুন রোজ ৭৪০০০!) বাড়ী তৈরী করা

দরকার। ইতিহাসের মানুষ গুহা থেকে বেরিয়ে এসে যেদিন পয়লা আস্তানাটি তৈরী করেছিল, সেদিন থেকে আজ অবধি যত মালমশলা লেগেছে বাড়ী তৈরীর কাজে, আগামী কুড়ি বছরে দরকার হবে ঠিক ততখানিই। ইট, কাঠ, সিমেণ্ট আর টিন দিয়ে এ দরকার মেটানো অসম্ভব। উপায় ?

একটিই উপায়—পায়ের তলার মাটিকে কাজে লাগানো। ইতিহাসের সবচেয়ে পুরোনো বাড়ী তৈরীর উপকরণ মাটি আজও সব উপকরণের থেকে সস্তা। অফুরন্ত এর যোগান। তাপ-রোধক শক্তি এর অসীম। মাটির একটিই দোষ—তার সীমিত জল-রোধক শক্তি। মাটির দেয়াল সহজেই জলে গলে কাদা হয়, ভেঙ্গে পড়ে। ফলে পশ্চিম বাংলার মত অঞ্চলে যেখানে বছরের বেশীর ভাগ সময় বর্ষা আর বানভাসী লেগেই আছে, সেখানে মাটির ঘরের আয়ু বড়ই কম, তদারকী বড়ই বেশী। এর জল-রোধক শক্তিকে বাড়ালে এই বিপদের সমাধান হয়।

১৯৭৮ সালে দু'দফা বানভাসীতে হাজার কোটি টাকার সম্পদ ভেসে যায়, যার সিংহভাগই গরীব পল্লীবাসীর বাড়ী, গোয়াল, মুরগীখামার, রান্না-ঘর। আড়াই হাজার বস্তির ৩৭৫ হাজার বাড়ী ধুয়ে-মুছে সাফ। পুনঃ-নির্মাণের খরচ এক একটা বাড়ীতে ৩০০০ টাকা ধরলে মোট খরচের অঙ্কটা ১১২ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। এবার ভাবুন তো, মাটির বাড়ীকে সত্যি জলরোধক আর বানরোধক করে গড়ে তোলা কতখানি দরকার। এই দরকার মেটাতে মেদিনীপুরের ময়না অঞ্চলে এক বেসরকারী অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। তাতে যে খবরগুলো পাওয়া গিয়েছিলো, তা হল এই রকম ঃ

(ক) জলের তোড় এসেছিল উত্তর দিক থেকে। ফলে বেশীর ভাগ বাড়ীর দেয়াল পড়ে গিয়েছিল দক্ষিণমুখী হয়ে।

(খ) যে সব ঘর ভেঙ্গে পড়েছিল বা বসে গিয়েছিল তার ৮০ শতাংশেরই ছিল সাধারণ কাদা মাটির দেয়াল আর বাঁশের মাচার উপর ছাওয়া ভারী পোড়া মাটির টালির চাল।

(গ) দেয়াল ভেঙ্গে গেছে মূলতঃ দুই ভাবে—এক, জলের ধাক্কায় দেয়াল উল্টে গেছে ; দুই, জলের তোড়ে দেয়ালের তলার দিকটা খেয়ে দেয়াল বসে গেছে। দেয়াল উল্টেছে বানের পয়লা চোটে আর দেয়াল বসেছে জল কমার সময়।

(ঘ) যে সব বাড়ীর মেঝের উপর জল ওঠেনি সেগুলির শতকরা ৯৭ ভাগ বেঁচে গেছে বা চোট খেয়েছে খুবই কম। কিন্তু জল যেখানে ঘরের ভেতর ঢুকেছে, সেখানে অটুট আছে এমন বাড়ী হাতে গোনা যায়।

(ঙ) পাকা দালানের ঢালাই ছাদের পরই টেকসই বলে বোঝা গেছে পলিথিন বা তেরপল ঢাকা দরমার আর খড়ের হাল্‌কা ছাদ। পোড়ামাটির টালি ভীষণ ভারী ও নড়বড়ে বলে এ ধরনের ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে সবার আগে।

(চ) এও দেখা গেছে মজবুত ফুটোফাটা নেই এরকম ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছে। অথচ অপল্‌কা কিন্তু খোলামেলা গোয়াল, চণ্ডীবাড়ী বেঁচে গেছে। কারণ এসব ঘরের বেলা জল আসার ও বেরিয়ে যাওয়ার পথে ঝাঁপহীন দরজা বা ফাঁকে ফাঁকে জালিদার বেড়ার দেয়াল থাকায় জল আসা-যাওয়ার পথে বিশেষ বাধা পায় নি।

(ছ) যে সব বাড়ীতে জল আসার পথে অপল্‌কা গাছ ছিল, জলের তোড়ে গাছ উপড়ে বাড়ীর উপর পড়ে চাল ও দেয়াল ভেঙ্গে দিয়েছে।

(জ) গাঁয়ের ইস্কুল, যুবসমিতি, পাঠাগারগুলি তাদের অবহেলিত নড়বড়ে কাঠামো নিয়ে বানের পয়লা চোটেই ভেঙ্গে পড়েছে জলের বুকে। অথচ শহর বা আধা-শহর অঞ্চলে এই সব সংস্থার পাকা দালানে বা ছাদে ঠাঁই নিয়েছিল হাজার হাজার বানভাসী মানুষ।

(ঝ) জল কমবার পরই চাল, ডাল, তেলের থেকে অভাব বেশী দেখা গিয়েছিল শুকনো জ্বালানী কাঠকুটো, নুন আর পশুদের খাবারের।

● 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন'

ময়নায় পাওয়া এই খবরগুলির মাঝ থেকে টেনে বার করতে হবে বন্যা-রোধক বাড়ী তৈরীর ফরমুলা। নদীর বান ছাড়াও ভগবানের অভিশাপে যে সব বিপদ ঘটে থাকে,ভূমিকম্প ও আগুন-লাগা তাদের মধ্যে খুবই চলতি। যে সব অঞ্চলে, যেমন আসামে ভূমিকম্প বেশী হয়, সেখানে ঃহাল্কা টিনের চাল ও হাল্কা কাঠের কাঠামোর উপর সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়া দরমা বেড়ার দেয়ালের যে চলন আছে, তাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। পল্লী অঞ্চলে আগুন লাগা এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। জল বলতে দূরের পুকুর বা নদীই ভরসা। দমকল থাকে হয়ত পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার দূরের শহরে। তাছাড়া খবর পেলে তো দমকল আসবে! সেখানে সময়-

মত খবর পাঠানোর উপায় কই ? কাজেই এসব বাড়ী এমন জিনিস দিয়ে তৈরী করা দরকার যাতে আগুন লাগে না বা চট করে লাগতে চায় না। ভগবানের দয়া বলতে হবে, গাঁয়ে বাড়ী তৈরীর যা পয়লা উপকরণ সেই মাটিকে আগুন বিশেষ কাবু করতে পারে না। এই অবধি আলোচনায় এটুকু বোঝা গেল যে, পল্লী বাংলার বাড়ীকে সুঠাম করে গড়ে তুলতে হলে তার মালমশলা বাছাই ও কারিগরী কৌশলের মধ্যে তাকে করে তুলতে হবে :

(১) তাপ ও আগুন-রোধক
(২) জল ও বান-রোধক
(৩) এবং সস্তা।

এই ফরমূলা ধরে গড়ে তোলা এক নতুন দিনের মাটির কুটিরের পরিকল্পনা নীচে দিলাম যা পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় বছর পনেরো টি কে থাকবে মেরামতি ছাড়াই। এ বাড়ী তৈরীর খরচ সাবেকি খড়ের চালওয়ালা মাটির বাড়ীর থেকে পনেরো-ষোল শতাংশ বেশী হলেও পনেরো বছরের মেরামতির হিসাব ধরলে দেখা যাবে আখেরে এটাই সস্তা পড়েছে।

(ক) নকশা

বর্ষার দেশ পশ্চিম বাংলার গুমোট আবহাওয়ায় ঘরের ভেতর হাওয়া চলাচলই সবচেয়ে বড় বিবেচনার বিষয়। এখানে হাওয়া বয় দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্বে। জানালাগুলি দক্ষিণ ও পূর্বমুখী হওয়া দরকার যাতে ঘরে অঢেল বাতাস ও রোদ আসে। জানালার সিল বা তলাটা মেঝে থেকে ০·৬ মিটার (দুই ফুটের) বেশী হওয়া উচিত নয়। নিচু সিল হলে মেঝের উপর দিয়ে হাওয়া খেলে যায়। পল্লীবাসী খাট-পালঙ্কের থেকে মাটিতে শোয়ায় বেশী আরাম পায়। শীতকালে ওম পেতে বিছানার তলায় খড় বিছায়। গরমকালে শোয় শুধু মাটিতেই। কাজেই মাটির উপর হাওয়া খেলা দরকার। শরীরে চলতি বাতাসের ছোঁয়া না লাগলে ঘাম শুকায় না, গুমোট ভাব কাটতে চায় না। ঘরে কম করেও একটা দেয়াল আলমারী রাখা বিশেষ দরকার। এর মাপ হওয়া উচিত ১ মিটার থেকে ১·২ মিটার (২/২½ হাত) চওড়া, ০·৩ মিটার (পৌনে ১ হাত) গভীর, ২ মিটার মত (৪/৪½ হাত) উঁচু, ৪।৫টি কাঠের বা ঢালাই তাক থাকবে। বারান্দার একটা দিক বা একটা কোণ যদি বাঁশের জাফরী দিয়ে ঘিরে নেওয়া যায় তা হলে সেখানে বসে রান্না, খাওয়া, বা পূজোপাট সারা

চলে। বাঁশের জাফরী না লাগিয়ে ফাঁক ফাঁক করে ইট গেঁথে নিলে আরো টেঁকসই হয়। তবে তাতে খরচ বেশী। ঘরই হোক, বারান্দাই হোক বা খোলা আঙ্গিনাই হোক—সবেরই একটা মাপ আছে যার কম হলে কাজের অসুবিধা হয়। যাতায়াতে ঠোকাঠুকি হয়। নকশা করার সময় মিস্ত্রি ও মালিককে নিচের লিস্টটা মনে রাখতে হবে ঃ
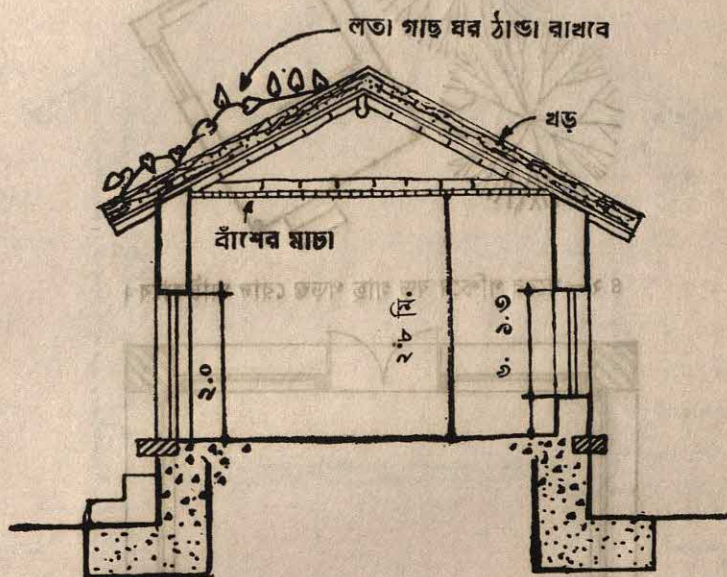
৪.১—ঘরের দরজার ও জানালার খাড়াই।

বারান্দার চওড়া কম্‌সে-কম ১·৫ মিটার (সওয়া তিন হাত), ঘরের চাওড়া কম্‌সে-কম ২·৫ মিটার (৬ হাত), আঙ্গিনার চওড়া কম্‌সে-কম ৩·৫ মিটার (৮ হাত)। খাড়াইয়ের উচিতমাফিক মাপগুলো (৪·১ নং) নকশায় দেওয়া রয়েছে, সেই মতই হওয়া উচিত। আঙ্গিনার দক্ষিণ ও পূর্বদিক ছুটো যত খোলামেলা থাকে বাড়ীতে রোদ-হাওয়া খেলে ততই বেশী। ঘরের পশ্চিম পাশে আম বা ওই ধরনের ছায়াঘেরা ও মজবুত গাছ লাগালে ঘর গরমকালে ছুপুর ও বিকেলে তার আওতায় থেকে গরম হবে না (৪.২নং নকশা)। আঙ্গিনার সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা বেছে নিয়ে একখানা ঘর গড়তে হবে ৪.৩নং ও ৪.৪নং নকশা মাফিক, মালমশলাও রীতি অনুযায়ী। এই ঘরখানাই হবে বানভাসীর বা ভূমিকম্পের কারণে

পুরো পরিবারের সামরিক আস্তানা। এ ঘরের মেঝে হবে বানের জল যতটা উঁচুতে উঠতে পারে তা থেকে ৭৫ মিলিমিটার উঁচু। মনে হয় উঁচু
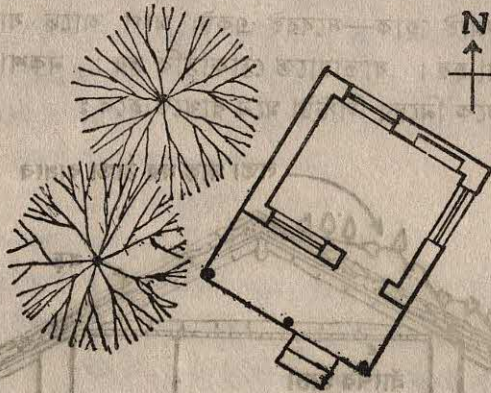
৪.২—ঘরের পশ্চিমে বড় গাছ পড়ন্ত রোদ আটকাবে।
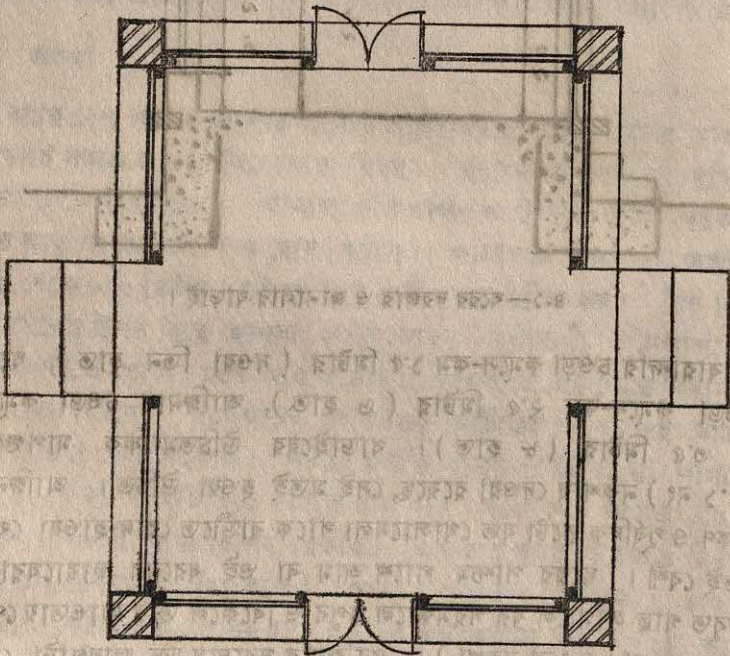
৪.৩—উঁচু ভিত, দরমার হালকা দেয়াল : সামনা-সামনি দরজা দিয়ে বানের জল ঢুকবে ও বেরুবে—বাড়ী অটুট থেকে যাবে।

জমিতে মাটি থেকে ১ মিটার (সওয়া দুই হাত) উঁচু ভিত করলে মোটামুটি কাজ চলে যাবে। মেঝে হবে পোড়া মাটির ইট বিছিয়ে, যাতে
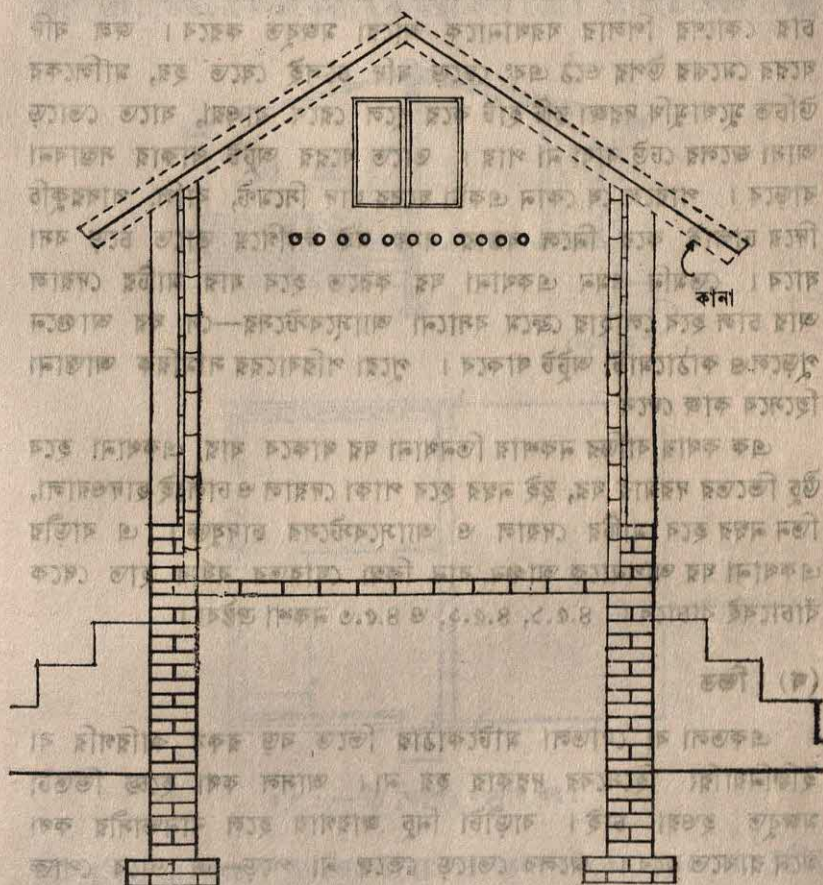
৪.৪—কানা বার করা ছাদ : আয়ু বাড়বে ৫ বছর।

মেঝেটা বানের জলে গলে না যায়। ভিত হবে পোড়ামাটির ইট গেঁথে —সম্ভব হলে সিমেন্ট-বালি দিয়ে। অভাবে চুন-সুরকি—অভাবে লালমাটি গোবর কিন্তু ছাই বা মাটি দিয়ে কখনই না। ভিতের এই দেয়াল মেঝের উপর ০·৩ মিটার (এক ফুট) অবধি পোড়া ইটেই ২৫০ মিলিমিটার (১০ ইঞ্চি) চওড়া করে গাঁথতে হবে পুরো ঘরটাকে জল-রোধক করতে। এর উপর ১২৫ মিলিমিটার (৫ ইঞ্চি) গাঁথনি বা বাঁশের

কাঠামোর দরমার দেয়াল করা যায়। দরমায় সিমেন্ট বালির পলেস্তারা করে নিলে বেড়া পাঁচগুণ বেশী টিকবে। ভূমিকম্পের অঞ্চলে ১২৫ মিলি-মিটার (৫ ইঞ্চি) দেয়ালের চেয়ে দরমার দেয়াল বেশী উপযোগী। চার কোণের পিলার ঘরখানাকে আরো মজবুত করবে। জল যদি ঘরের মেঝের উপর ওঠে এবং ছেড়ে যদি চলেই যেতে হয়, মালিকের উচিত মুখোমুখি দরজা দুটি হাট করে খুলে রেখে যাওয়া, যাতে তোড়ে আসা জলের ঢেউ বাধা না পায়। তাতে ঘরের অটুট থাকার সম্ভাবনা বাড়বে। পারলে যে কোন একটা ঘরের ছাদ সিমেন্ট, বালি, পাথরকুচি দিয়ে ঢালাই করে নিলে বন্যার সময় মই লাগিয়ে তাতে চড়ে বসা যাবে। তেমনি এমন একখানা ঘর করতে হবে যার মাটির দেয়াল আর চাল হবে লোহার ফ্রেমে বসানো অ্যাস্‌বেস্টসের—সে ঘর আগুনে পুড়লেও কাঠামোটা অটুট থাকবে। পুরো পরিবারের সাময়িক আস্তানা হিসেবে কাজ দেবে।

এক কথায় বাড়ির নকশায় তিনখানা ঘর থাকবে যার একখানা হবে উঁচু ভিতের দরমার ঘর, দুই নম্বর হবে পাকা দেয়াল ও ঢালাই ছাদওয়ালা, তিন নম্বর হবে মাটির দেয়াল ও অ্যাস্‌বেস্টসের ছাদযুক্ত। এ বাড়ীর একখানা ঘর আপনাকে আগুন, বান কিম্বা ঘোরতর বর্ষার হাত থেকে বাঁচাবেই বাঁচাবে। ৪.৫.১, ৪.৫.২, ও ৪.৫.৩ নকশা দ্রষ্টব্য।

(খ) ভিত

একতলা বা দোতলা মাটকোঠার ভিতে বড় রকম কারিগরি বা ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবের দরকার হয় না। আসল কথা হচ্ছে ভিতটা মজবুত হওয়া চাই। বাড়ীটা নিচু জায়গায় হলে বানভাসীর কথা মনে রাখতে হবে। জলের তোড়ে ভেঙ্গে না পড়ে—এ ভাবে পোক্ত করে যদি ভিত গড়তে হয় তাহলে তা গাঁথতে হবে পোড়ামাটির ইটে সিমেন্ট বালির মশলা দিয়ে। সিমেন্ট বালির সাত ভাগের থেকে কম হওয়া উচিত নয়। ভিত জমির তলায় ৪.৫.১ নং নকশার মত ০.৬ মিটার (দেড় হাত) নীচ থেকে গেঁথে আনতে হবে। বানের ভয় না থাকলে ৪.৫.৩ নং নকশা অনুযায়ী মাটির ভিতও গাঁথা যায়। তাতে সস্তা পড়বে। পল্লী বাংলায়, বিশেষ করে দক্ষিণে মাটির ভিত অনেক সময় বসে যেতে দেখা যায়। এর কারণ হল তিনটি ছোট্ট জীবের উৎপাত।

এক নম্বর, মেঠো ইঁদুর, দুই নম্বর ধেড়ে ছুঁচো আর তিন নম্বর সবচেয়ে ছোট কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর—উইপোকা। মাটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে এরা ভিতটাকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দেয়। বাইরে থেকে কিছু
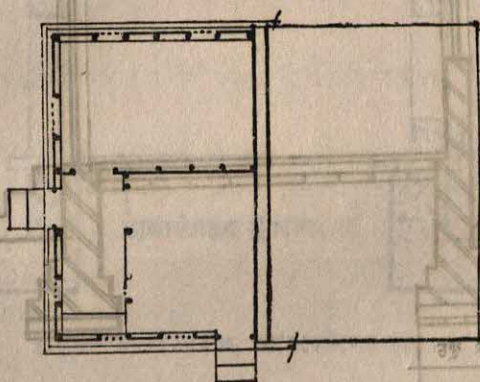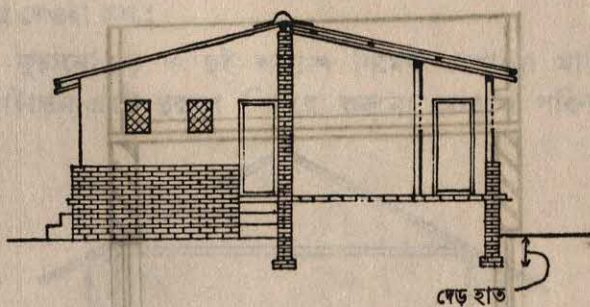
৪.৫.১.—উঁচু ভিতের দরমার ঘর।

বোঝা যায় না অথচ ফাঁপা ভিত দেয়ালের ওজন বইতে পারে না, বর্ষায় দেয়ালের মাটি যখন জলে ভিজে ভারী হয়ে যায়, তখন একদিন দেয়ালটা হঠাৎ ফেটে গিয়ে বসে যায়। এদের উৎপাত থামাতে হলে ঃ

(১) পয়লা কাজ, ভিতের মাটিতে কাঁচের টুকরো ভাঙ্গা শিশি-বোতল মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে গর্ত করতে গিয়ে ছুঁচো ইঁদুর নাকে-মুখে কাঁচের খোঁচা খেয়ে এগোবার উৎসাহ হারাবে। মনে রাখবেন, কাঁচের টুকরো মেশাতে হবে বেশ ঘন করে। অল্প কাঁচ দিলে ইঁদুর ও ছুঁচো মশাইরা চমৎকার পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন। সাধে আর 'ছুঁচো' বলে!

(২) দুসরা কাজ, ভিতের চারপাশে একহাত মাটি খুঁড়ে পাঁচ শতাংশ অলড্রিন (Aldrin) মেশানো জল বা আলকাতরা (creasote) মেশানো কেরোসিন তেল মাটির সঙ্গে খুব ভাল করে মিশিয়ে দিলে উইপোকারা জব্দ
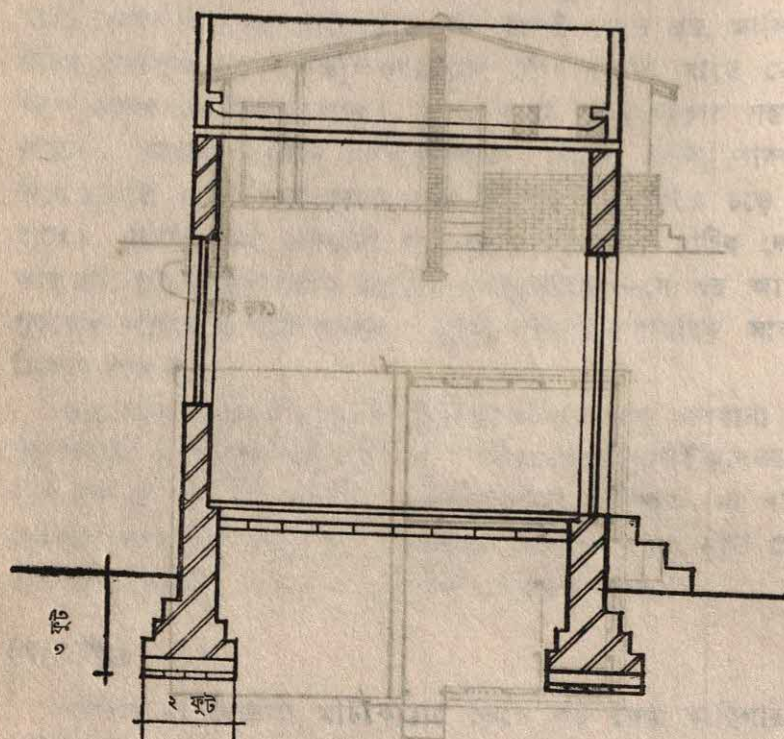
৪.৫.২—পাকা দেয়াল ও ঢালাই ছাদ।

হয়ে যাবে। তবে সাবধান, অলড্রিন ভয়ংকর বিষ, মুখে না যায়। এই সব জায়গায় আর এক উৎপাত হল সাপ। বর্ষার দিনে সাপ শুক্‌নো আস্তানার খোঁজে মানুষের ঘরে উঠে আসে। ভিতের মাথায়, ঘরের মেঝের সঙ্গে সমান করে যদি একটা সারি ইট ভিত থেকে ৩ আঙ্গুল বের করে (কানা বার করা বা Spring ৪.৫.৩নং নকশা মোতাবেক) একটা কারনিশের মত তৈরী করা যায় তাহলে আর সাপ ভিতের উপর উঠে আসতে পারবে না। উত্তরবঙ্গ ও আসামে এ ধরনের সাপ-বারণ কারনিশ বহু সাবেকি বাড়ীতেই আছে।

(গ) দেয়াল

সিমেন্ট গাঁথা পোড়া ইটের দেয়াল গড়তে বিপুল খরচ। সস্তায় মোটামুটি টেকসই, জল ও আগুন রুখতে পারে এমন দেয়াল তৈরীর দুটি উপায় দেওয়া হল :

(১) কুচানো খড় ও দুই শতাংশ সিমেন্ট মেশানো মাটি দুধারে কাঠের পাটাতন এঁটে দুরমুশ পিটিয়ে শুক্‌নো দেয়ালে পরিণত করুন
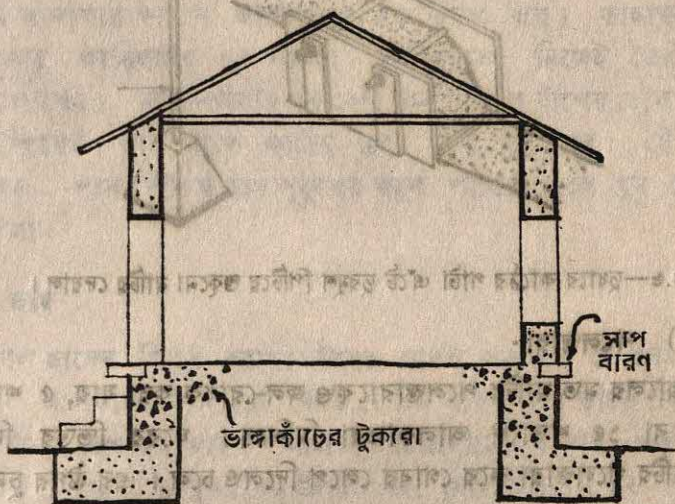
৪.৫.৩—মাটির দেয়াল, অ্যাসবেস্টসের ছাদ।

(৪.৬ নং নকশা)। এই মাটিতে ঝামার টুকরো মিশিয়ে নিলে দেয়াল ইট দিয়ে গাঁথা দেয়ালের মতই টেকসই হয়ে যাবে। ঝামার টুকরো না পেলে আধহাত লম্বা বাঁশের কঞ্চিও মেশানো যায়।

(২) এক শতাংশ আলকাতরা (Tar) মেশানো মাটির ইট গড়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। গাঁথতে হবে ২ শতাংশ আলকাতরা মেশানো কাদা দিয়ে। থকৃথকে বা আধশুক্‌নো আলকাতরা মাটি ও কাদার সঙ্গে মেশাতে অসুবিধা হলে, আলকাতরাটা কেরোসিনে গুলে পাতলা করে নেওয়া যায়। তবে তাতে খরচ বাড়বে।

যাঁরা এইসব দেয়াল তৈরী করতে বা এই বিষয়ে আরো বেশী করে জানতে চান তাঁরা ন্যাশনাল বিল্ডিং অরগাইজেশন, জি উইং, নির্মাণ

ভবন, নিউদিল্লী—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। এন. বি. ও. তাঁদের সব রকম কারিগরী সহায়তা দেবেন।
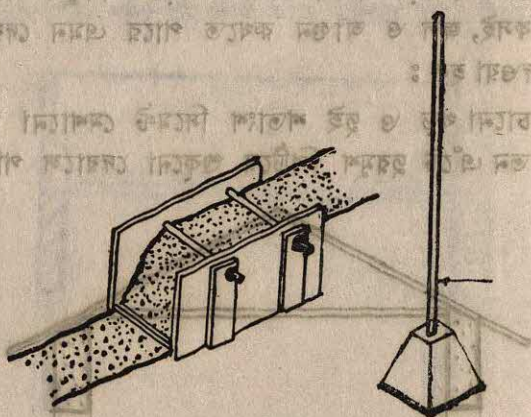
৪.৬—দুধারে কাঠের পাটা এঁটে দুরমুশ পিটিয়ে শুক্‌নো মাটির দেয়াল।

(ঘ) **পলেস্তারা**

দেয়ালের মত মাটির পলেস্তারাকেও জল-রোধক করা যায়, ৫ শতাংশ সিমেণ্ট বা ১৫ শতাংশ আলকাতরা মিশিয়ে। ঘরের ভিতর দিকটা কাদামাটির পলেস্তারা করে গোবর লেপে দিলেও চলে। এর উপর চুনকাম করে দিলে ঘরে আলো বেড়ে যাবে। বাইরের পলেস্তারা হতে পারে তিন রকম :

(১) ৭ ভাগ সাদা চিকন বালি (Silver sand) ও এক ভাগ সিমেণ্ট জলে মেখে ;
(২) এঁটেল মাটির সঙ্গে ৫ শতাংশ সিমেণ্ট এবং ১ শতাংশ সাবান জল মেখে ;
(৩) বেলে মাটি বা পলিমাটির সঙ্গে খুব ছোট করে কুচানো খড়, ১০ শতাংশ গোবর ও ১০ শতাংশ আলকাতরা মিশিয়ে মেখে।

(ঙ) **দরজা-জানালা**

পাল্লায় কাঠের প্যানেলের চেয়ে কাঠের কাঠামোতে আটকানো অ্যাসবেস্টসের প্যানেল দামেও সস্তা, টেঁকেও অনেক বেশী। দরজার মাপ অনেক সময় অকারণে বাড়ানো হয়। ৬ ফুট × ২½ ফুট দরজাই

পল্লী জীবনে (বিশাল গদরেজের আলমারী যেখানে অচল) যথেষ্ট। সে তুলনায় জানালাগুলি বড্ড ছোট ও উঁচুতে বসানো হয়। জানালার মাপ ১·৩ মিটার × ০·৯ মিটারের (৩ হাত × ২ হাত) কম হওয়া উচিত নয়। মেঝে থেকে ০·৭ মিটার (দেড় হাত) উপরে বসালে ঘরের মধ্যে হাওয়া চলাচল করে যথাযথভাবে (৪·১ নং নকশা)। ঝাঁপ জানালা (যার মাথার দিকটা চৌকাঠের সঙ্গে কব্জায় বাঁধা থাকে) একই সঙ্গে ঘরে হাওয়া ঢোকায় আবার রোদ-ঝড়-জল থেকে ঘরকে বাঁচায় জানালার সামনে কারনিশের মত ছাতা ধরে। তাছাড়া ঝাঁপ জানালার কারিগরীও খুব সরল। বাড়ীওয়ালা নিজেই তৈরী করে নিতে পারেন। টাকা-পয়সায় খুব বেশী টান থাকলে বাঁশের চৌকাঠ করা যেতে পারে। তবে বাঁশে কাঠের চেয়ে বেশী ঘুন ধরে। টেঁকসইও হয় কম। পাকা বাঁশ ছ-মাস পুকুরের জলে পচিয়ে নিলে ঘুন মোটেই ধরবে না।

(চ) ছাদ

ঢালু ছাদের ভিতর অ্যাসবেস্টসের ছাদই সবচেয়ে টেঁকসই, খরচ বেশী। আলকাতরার পিপে কেটে যে টিন পাওয়া যায় তাতে সস্তায় খুব ভাল টিনের চাল করা যায়। আলকাতরা মাখানো থাকায় এগুলি খুব বেশীদিন টেঁকে। ঢালু ছাদের উপর ১৫০ মিলিমিটার (১২ আঙ্গুল) মোটা করে আলকাতরা মেশানো মাটি চাপিয়ে, তার উপর ৬ মিলিমিটার (সিকি ইঞ্চি) মোটা করে বালি মেশানো আলকাতরা লেপে দিলে ছাদ দিয়ে জল পড়ার কোন উপায় থাকবে না। কুমড়ো ও লাউডগার লতা ছাদে চড়িয়ে দিলে ঘর ঠাণ্ডা হবে। ছাদের দুইপাশ দেয়ালের উপর দিয়ে সাধারণতঃ ০·৩ মিটার (পৌনে ১ হাত) বেরিয়ে আসে, তাকে আরো ১৫০ মিলিমিটার (১২ আঙ্গুল) বাড়িয়ে দিলে খরচের পাল্লা খুব একটা ভারী হবে না কিন্তু এই বাড়তি অংশটুকু দেয়ালকে রোদ-জলের হাত থেকে বাঁচাবে। বাড়ীর আয়ু বাড়বে পাঁচ বছর (৪.৪ নং নকশা)।

শেষমেষ রইল খড়। খড়ের সব ভাল—ঘরের তাপ কমায়, ওজনে হালকা বলে কাজ করতে সুবিধা, কমদামে সহজেই অঢেল পাওয়া যায় চাষের মাঠ থেকে, ছাউনীর ওজন কম বলে কাঠের বা লোহার দামী কাঠামোর দরকার পড়ে না—বাঁশের সাধারণ তে-কোণা কাঠামোতে

কাজ চলে যায়, গেঁয়ো ঘরামিরা বাপ-পিতেমোর আমল থেকে হাত পাকিয়েছে—কাজেই খড়ের চালের ওস্তাদ কারিগর পাওয়া যায় মেলাই। তবে খড়ের চালের দোষ দুটো। এক, সহজেই জলে পচে যায়, তাই ফি বছর চালে যোগান দিতে হয় নতুন খড়ের। আর দুই, আগুনের কাছে খড়ের চাল একেবারেই অসহায়। এই দুই দোষ কাটাতে পারলে খড় গ্রামীণ পরিবেশে এক অতিশয় উপযোগী ছাউনী হিসেবে কাজ দেবে। গ্রামীণ এ দাবী মেটাতে এন. বি. ও. আবিষ্কার করেছেন অগ্নি-রোধক খড়ের চাল। ব্যাপারটা এই রকম ঃ

বাঁশের বাঁকারী দিয়ে পাতলা জালি বানাতে হবে যার খোপগুলো হবে আধ ইঞ্চি মাপের। এর উপর দেড় ইঞ্চি পুরু করে খড় বিছিয়ে সুতলী বা নারকোল কেতা দিয়ে খড়কে জালির সাথে বেঁধে আটকে দিতে হবে। এবার এঁটেল মাটির কাদা ও ঘনফুট হিসেবে পৌনে দু'কেজি

৪.৬.১—অগ্নিরোধক খড়ের চাল

কুচানো খড় ভাল করে মিশিয়ে ৭ দিন পচাতে হবে। ইতিমধ্যে পীচ বা বিটুমেন গরম করে তার ওজনের বিশ শতাংশ কেরোসিন ও এক শতাংশ গলা মোম গুলে একটা সলিউশন তৈরী করে ফেলুন। এক ঘনফুট পচা খড় কাদায় ২ কেজি সলিউশন মিশিয়ে, তা দিয়ে জালিতে আটকানো খড়ের উপর এক ইঞ্চি মোটা প্রলেপ দিতে হবে। এই হল আগুন-বারণ

ছাদের টালি। এ টালি ছাদের কাঠামোর সাথে লোহার তার দিয়ে বেঁধে দিন রোদে শুকানোর পর। এবার বার দুয়েক গোবর মাটি (৫০ : ৫০ ভাগ) লেপে দিয়ে এ চালে আগুন ধরানোর চেষ্টা করুন। আপনার মশাল যদি আধঘণ্টারও বেশী জ্বলতে পারে তা হলেই হয়ত সফল হবেন। তাও দেখবেন আংশিক ভাবে (৪.৬.১নং নকশা)।

(ছ) সিলিং ও মাচা

দরমার সিলিং ঘরকে গরম হতে দেয় না। সিলিংএ চুনকাম করা উচিত, যাতে ঘরে যথাযথ আলো হয়। মেঝে থেকে সিলিং ২·৭৫ মিটার (৬ হাত) উঁচু হওয়া উচিত—২·৪ মিটারের (সাড়ে পাঁচ হাত) কম কিছুতেই নয়। যে সব ঘরে সিলিং হবে না, সেখানে ৪·১নং নকশার মত ছাদের নীচে বাঁশের মাচা বা লফ্‌ট করে নিলে তা অনেক কাজে লাগবে। লেপ-তোষক রাখা ছাড়াও, বানভাসীর সময় এ মাচায় আস্তানা গাড়া চলে। ঘর ছাড়ার সময় রেখে যাওয়া চলে শুকনো কাঠ-কুটো, ঘুঁটে; গুড়, নুন, গরু-ছাগলের খাবার। বন্যার পর অভাব হয় এগুলোরই। সেদ্ধ চাল শুকোনোর জন্য মাচা খুব উপযোগী। সেদ্ধ চাল ছাদের আড়ালে শুকালে খেতে খুব ভাল হয়।

(জ) জল সরবরাহ

বেশীর ভাগ পল্লী এলাকায় জলের চাহিদা মেটায় নদী ও পুকুর। এতে যেমন পরিষ্কার জল পাওয়া খুবই কঠিন তেমনি সে জল ঘাড়ে করে ঘরে বয়ে আনা আরও কঠিন। আর যেহেতু সে জল ঘাড়ে করেই বয়ে আনতে হয়, জলের যোগানও দরকার মাফিক হয় না। ঘরদোর নোংরা হয়ে পড়ে থাকে বছরের পর বছর। গরমকালে খালবিল শুকিয়ে গেলে বিপদের উপর বিপদ। এসব কাটাতে নিজের আঙ্গিনায় জলের উৎস করে নেওয়াই সবচেয়ে সোজা উপায়। আঙ্গিনায় জলের উৎস বলতে বোঝায় ইদারা আর নলকূপ। ইদারার খরচ কম, নলকূপের জলে নোংরা মেশার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

ইঁদারার মুখের চওড়া ০·৯ মিটার (২ হাত) থেকে ২·৫ মিটার (সাড়ে ৫ হাত) হয়। ০·৯ মিটার/১·২ মিটারের (২/২½ হাত) ইদারা করতে বাজারে মাটির চাক বা রিং পাওয়া যায়। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে একের উপর এক চাক বসিয়ে মাটির গভীরে চলে যেতে হবে যখন অবধি না মাটির

নীচের ভাল জলের সন্ধান পাওয়া যায়। জল সরবরাহের এটাই সব চেয়ে সস্তা উপায়। ১·২ মিটার/১·৫ মিটারের (৩/৪ হাতের) ইদারা করতে হলে চাই সিমেণ্ট দিয়ে ঢালাই করা চাক। ১·৫ মিটারের চেয়ে বড় ইঁদারা করলে চাকের বদলে পোড়া ইটের সিমেণ্ট-বালি দিয়ে গাঁথনি করা গোল দেয়াল বা Ring wall দিয়ে চার পাশটা বাঁধিয়ে নিতে হবে। কুয়ার গভীরতা নির্ভর করছে মাটির কত নীচে ভাল পানীয় জল পাওয়া যাবে তার উপর। পাতকুয়া ৪·৫ মিটার/৬ মিটার থেকে ১৮ মিটার/২১ মিটার (১০/১২ হাত থেকে ৪০/৪৫ হাত) অবধি গভীর হতে পারে।

এরপর এল নলকূপ বা টিউবওয়েল। গভীরতায় ৭৬ মিটারের (২৫০ ফুট) কম হলে তাকে অগভীর ও বেশী হলে গভীর নলকূপ বলা হয়। নলকূপ কত গভীর হবে তাও নির্ভর করে কত নীচে সুপেয় জল পাওয়া যাবে তার উপর। এ বিষয়ে যে অঞ্চলে নলকূপ হবে সে অঞ্চলের টিউবওয়েল মিস্ত্রির পরামর্শমত কাজ করাই ভাল। সাধারণতঃ পল্লী এলাকায় বাড়ীর টিউবওয়েলে এক ইঞ্চি মোটা ৫ থেকে ৮ খানা পাইপ ও একটি বা দুটি ১·৮ মিটারের বা ৬ ফুট স্ট্রেনার পাইপ লাগে। এ বিষয়ে পরে জল সরবরাহের অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করব। আপাততঃ এইখানেই ইতি।

(ঝ) পায়খানা

কিছুদিন আগে ৯৪৩টি গ্রামে এক সার্ভে (Survey) করা হয়েছিল। তাতে জানা গেছে শতকরা ৯৫টি বাড়ীতে কোন পায়খানা নেই। মেয়ে-মদ্দা সবাইকে 'কম্মোটি' মাঠে, ঘাটে, পুকুরের পাড়েই সারতে হয়। একটু পেটরোগা মানুষের বিপদটাও ভাবুন! সেপ্টিক ট্যাংকওয়ালা পাকা পায়খানায় বেশ মোটা খরচ। আজকের বাজারে দু'আড়াই হাজার টাকার ধাক্কা। এক হাজার টাকার অভাবে যে চাষীর বোন সারাজীবন আইবুড়ী থেকে যাচ্ছে তাকে দু'হাজার টাকার পায়খানা করতে বল্লে সে পেছনে চাষের বলদ লেলিয়ে দেবে। ষাঁড়ের গুঁতোকে আমার বেজায় ভয়! কাজেই মোটামুটি দূষিত আবহাওয়ার, মশা, মাছি, বা গুয়ে পোকার উৎপাত হবে না অথচ কম পয়সায় করা যাবে এমন দুটি পায়খানার (এরই একটায় গান্ধীজী কাজ সারতেন, মশাই!) বিবরণ এখানে দিলাম।

এ দুটি নলকুপ পায়খানা (Bore-hole) ও কুয়া পায়খানা (Well-Latrine)। ৪.৭.১নং নকশায় নলকূপ পায়খানা ও ৪.৭.২নং নকশায় কুয়া পায়খানার ছবি দেওয়া হল। নলকূপ পায়খানাটির ২৫০ মিমি. বা ১০ ইঞ্চি সরু কিন্তু গভীর গর্তটি বোরার (borer) বা মাটিকাটা আগার
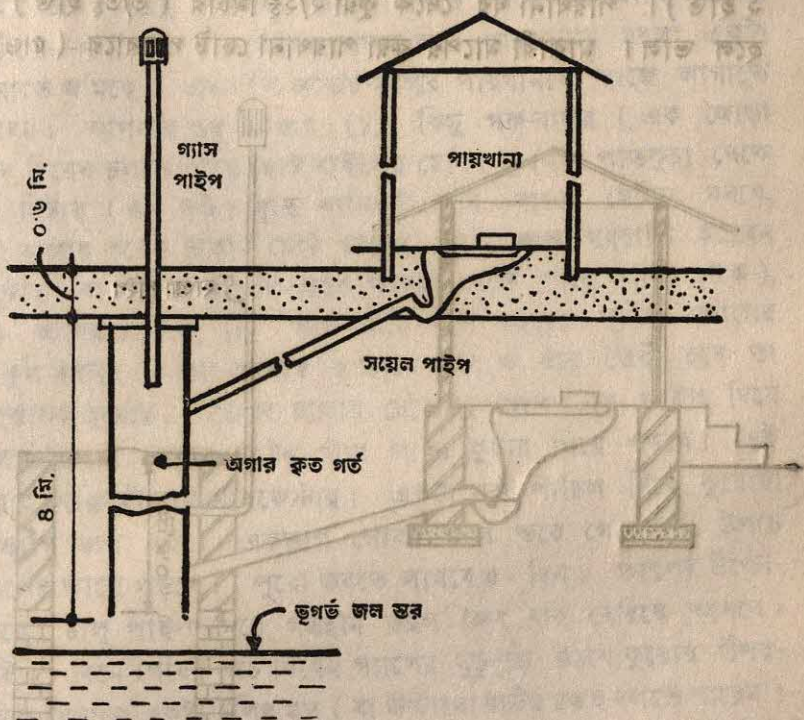
৪.৭.১—নলকূপ পায়খানা।

মেসিন দিয়ে খুঁড়তে হবে। ৩।৪ মিটার (৭।৮ হাত) নীচে যেখানে জল পাওয়া যাবে সেখানে গিয়ে থামতে হবে। আস্তে আস্তে গর্তটি মলে ভরে আসবে। ০·৬/০·৯ মিটার (১½/২ হাত) থাকতে মাটি ভরে একটু দূরে নতুন পায়খানা খুঁড়ে নিতে হবে। ৬।৭ জনের পরিবারে একটা পায়খানা ১৪।১৫ মাস চলবে। ১৪।১৫ মাস বাদে পয়লা পায়খানার ভরাট জায়গাটি আবার গর্ত করা চলবে। এই সময়টুকুতে সব মল মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে। সব রকম পায়খানার ভেতর এইটিই বানাতে সবচেয়ে সস্তা পড়ে। কুয়া পায়খানা নলকূপ পায়খানার ভাল টাইপ। পায়খানা

করার পর মাটি ফেলতে হয় না। জল দিয়ে ধুয়ে দিলে মল জলের সঙ্গে কুয়ায় চলে যায়। পায়খানার সঙ্গে কুয়ার যোগপথে একটি জলের সিল (Trap) থাকায় মলের গন্ধ বাইরের বাতাসে মিশতে পারে না। কুয়ার ভেতরের ব্যাস ০·৬ মিটার থেকে ০·৯ মিটার (১২/২ হাত থেকে ২ হাত)। পায়খানা ঘর থেকে কুয়া ২/২২/২ মিটার (৩/৩২/২ হাত) দূরে হলে ভাল। মাঝারী মাপের কুয়া পায়খানা ছোট পরিবারে (৫।৬ জন
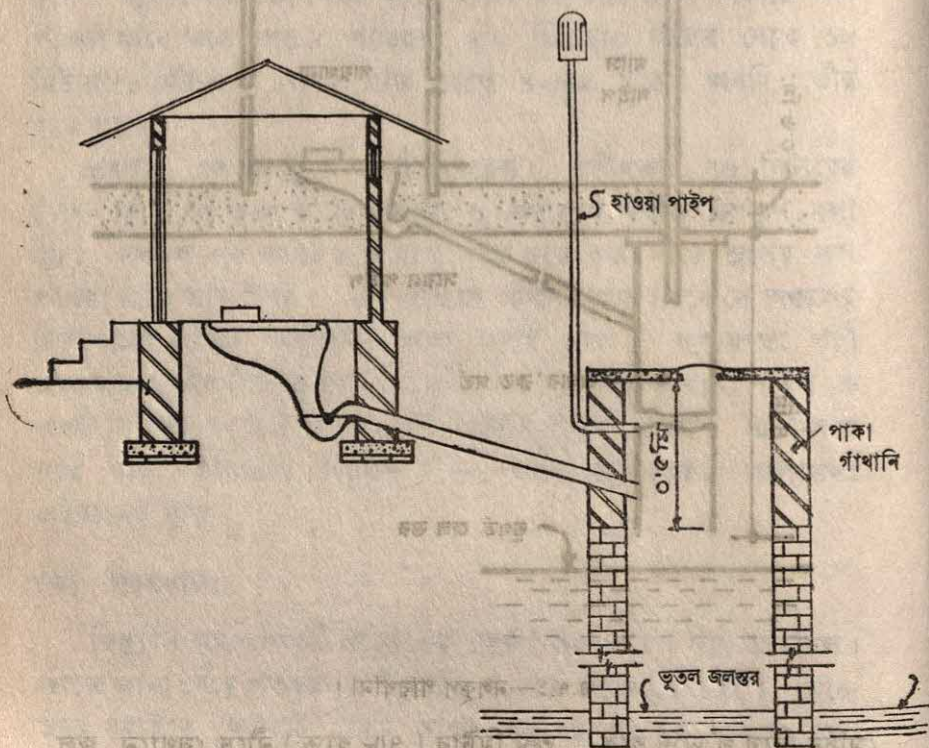
৪.৭.২—কুয়া পায়খানা।

লোক) ৮ থেকে ১০ বছর ভালভাবে কাজ করে। তবে এর এক-কালীন খরচ নলকূপ পায়খানা থেকে ৪।৫ গুণ বেশী।

এই ভাবে সস্তায় মজবুত বাড়ী, নলকূপ ও পায়খানা গড়ে তুল্‌লে শুধু যে বাড়ীওয়ালাই লাভবান হবেন তা নয়—ধীরে ধীরে সারা পল্লীর চেহারা ফিরে যাবে।

● গোবর গ্যাস মেসিন

খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন বার করেছেন গোবর পচিয়ে তরল জৈব সার ও উনুনের আগুন জ্বালাবার গ্যাস তৈরীর মেসিন। সে গ্যাসে ইঞ্জিনও চলে—ইঞ্জিন চালাবে জলের পাম্প, মোটর, ইলেকট্রিক জেনারেটার! এই আজব ঘটনাটি ঘটতে পারে আপনারই গাঁয়ের বাড়ীতে—খানকতক গরু-মোষের গোবর আর পায়খানার ময়লা একটা কুয়োতে জমিয়ে। এমন কি শুয়োর-মুরগীর পায়খানাও কাজে লাগাতে পারেন। আপনার শুধু দরকার (১) কিছু গরু-বাছুর (এক জোড়া বলদ দিয়েও চলতে পারে ছোট সাইজের মেসিন), (২) পাতকুয়া থেকে ১৫ মিটার (৫০ ফুট) দূরে খানিকটা জমি যাতে মেসিন বসবে, (৩) হাজার কয়েক টাকা (মোট খরচের মোটা অংশ খয়রাতি করবেন সরকার ; বাকীটা না থাকলে ধারও পাওয়া যেতে পারে ব্যাঙ্ক থেকে), (৪) জলের যোগান, (৫) আর গাঁয়ে বসে শহরের সুবিধা ভোগের আকুল ইর্চ্ছা। ৪.৮নং নকশায় কি ভাবে গ্যাস ও সার তৈরী হবে তা বোঝানো হয়েছে। গোবর ঢালার চৌবাচ্চা থেকে ঢালু পাইপ দিয়ে জল মেশানো গোবর ইটের গাঁথা পাকা কুয়ায় গিয়ে পড়বে। এই কুয়ার কারিগরী নাম ডাইজেস্টার। একটা সরু পাঁচিল দিয়ে কুয়োটা দু'ভাগে ভাগ করা। একভাগ গোবর জলে ভরে গেলে তা উপচে পাশের ভাগে পড়বে। পুরো ভরতে লাগবে ৫০ দিন। তারপর উল্টো-দিকের ঢালু পাইপ দিয়ে গন্ধহীন তরল জৈব সার বেরিয়ে আসবে। এই ৫০ দিনে গোবর পচে মিথেন গ্যাসের বুড়বুড়ি উঠবে কুয়োর উপর-দিকে যেখানে একটা টুপির মত (বা উল্টানো বাটির মতও বলতে পারেন) বসানো আছে ইস্পাতের গ্যাস হোল্ডার। হোল্ডার লাগানো পাইপ দিয়ে গ্যাস চলে আসবে রান্নাঘরের চুল্লীতে, বাতিদানে বা পাম্প ও ইলেকট্রিক জেনারেটার চালানোর ইঞ্জিনে (এই ইঞ্জিন কিনতে পারেন কোলকাতার গ্রীভস কটন অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেডে। এঁদের ঠিকানা : রাসটন্‌স্ ডিভিসন, ২৫নং ব্রেবোর্ন রোড, কলকাতা-১। ফোন : ২২-৪৩২৬)।

গোবর গ্যাস মেসিনের জন্য মন কেমন করছে তো? কুছ্-পরোয়া নেই। চলে আসুন এই ঠিকানায় :

> গোবর গ্যাস ডিপার্টমেণ্ট, খাদি অ্যাণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রি কমিশন, (পশ্চিমবঙ্গ অফিস), ৭ম তলা, ৩৩নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনু, কলকাতা : (ফোন : ২৬-২৭৬১)।

৪.৮—গোবর গ্যাস ও সার তৈরী মেসিনের নকশা।

৪.১ পল্লীমঙ্গল বাড়ীর নকশা।
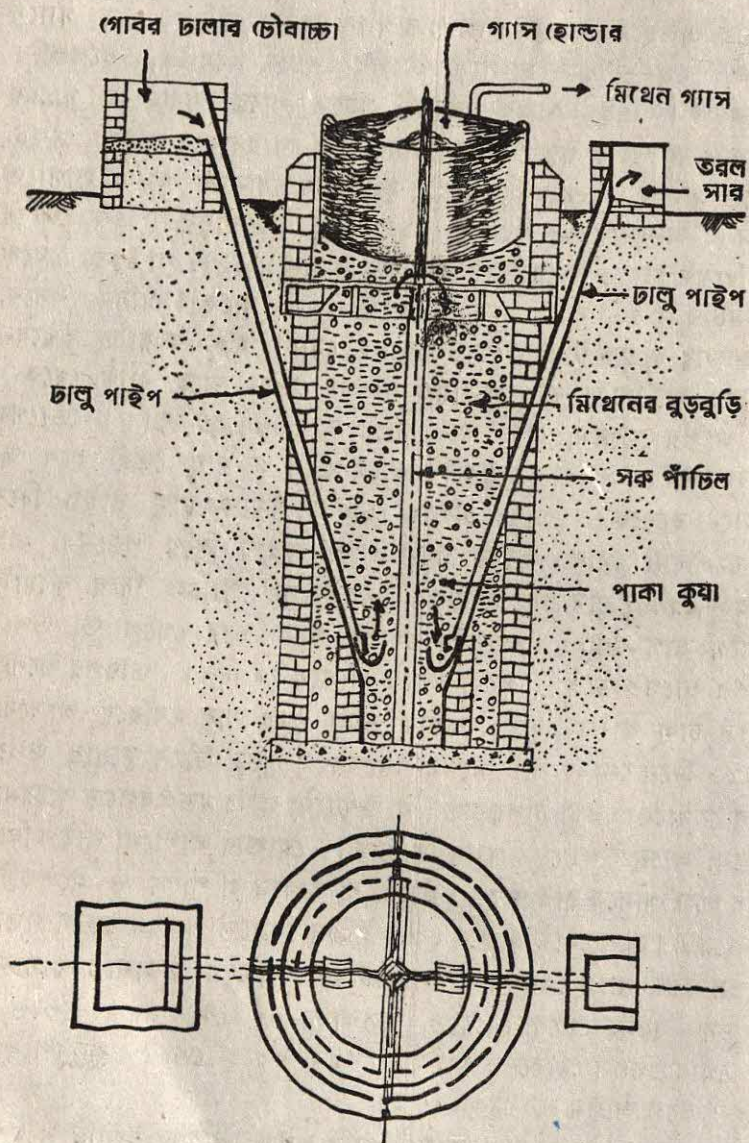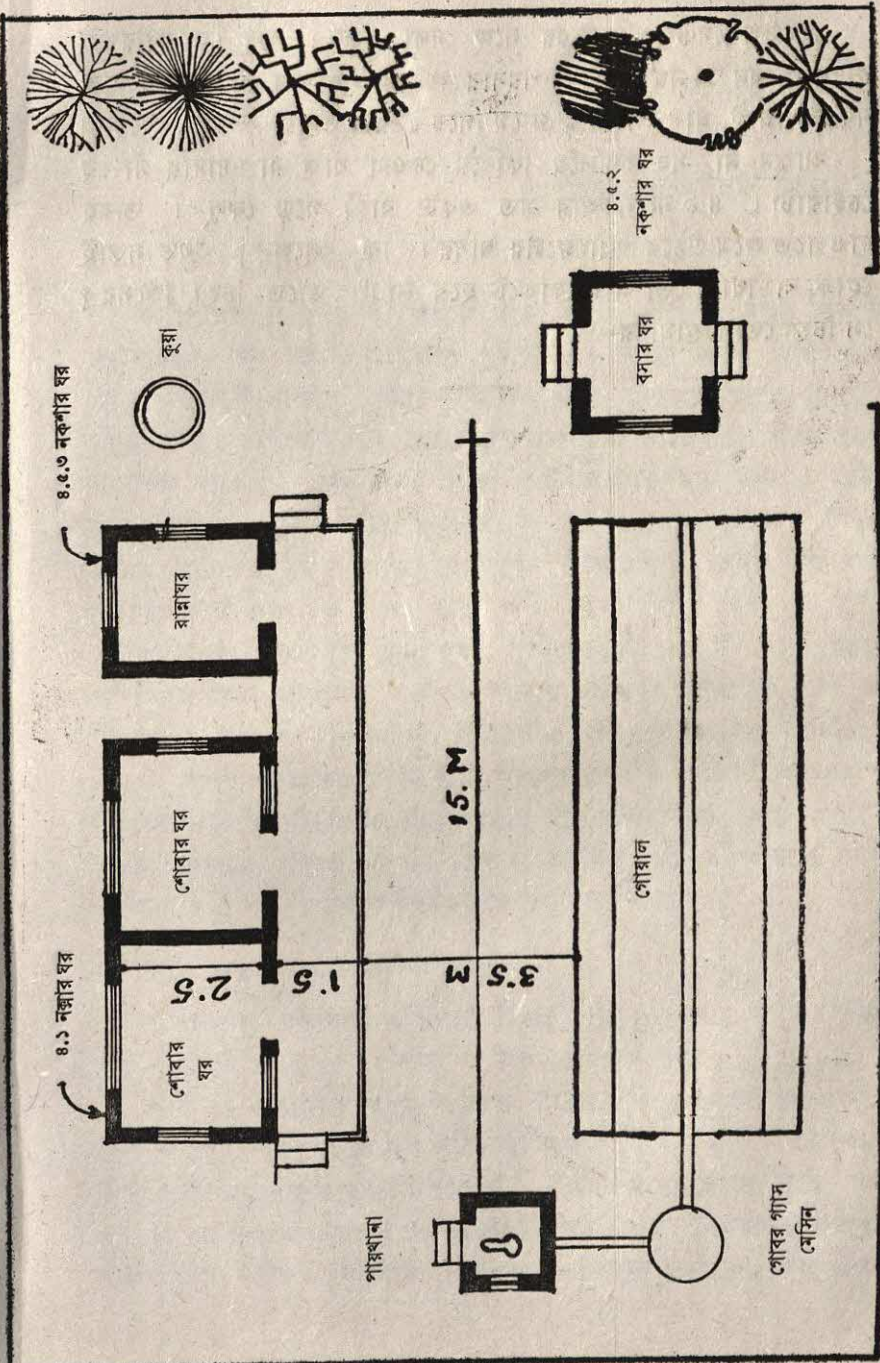
ডেভেলপমেণ্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করুন। শুধু যে কারিগরী হদিশ পাবেন তা নয়। টাকা-পয়সার খয়রাতি সহায়তা, ব্যাঙ্ক থেকে ধার, নকশা সাপ্লাই, মায় আপনার গ্রামে গিয়ে তৈরীর তদারকিও করে দেবেন।

আসুন না, সব মিলিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যাক বাপ-দাদার গাঁয়ের চেহারাটা। ৪.৯ নং নকশার মত একটা বাড়ী গড়ে ফেলুন। তারই দাওয়াতে জমে উঠবে পল্লীমঙ্গলের আসর। কি বল্‌লেন? "যত সস্তাই হোক, বাড়ীখানা তো আর ফোকটে হবে না।" তাতে চিন্তা কিসের? সে চিন্তা তো চিন্তামণির···

৫

চিনি যোগাবেন চিন্তামণি

● মাটি টাকা, টাকা মাটি

জঙ্গীপুরের দিগ্বিজয় হাজরাকে মনে আছে? তিনি বাড়ী করতে নেমেছিলেন এস. ডি. ও. বাংলোর পূর্বদিকে ৮ কাঠা ডাঙ্গা জমি আর পকেটে একাশী হাজার আটশো আঠাশ টাকা এগারো পয়সা নিয়ে। কিন্তু এমন অভাগাও তো থাকতে পারে যার জমি আছে তো টাকা নেই বা টাকা আছে তো জমি নেই কিম্বা এই অধমের মত টাকাও নেই, জমিও নেই। তবে তাদের কপালে কি একটা মাথা গোঁজার ঠাঁইও জুটবে না? জুটবে। চিনি যোগাবেন চিন্তামণি! এদের সহায়তা করতে আছে একাধিক সংস্থা যারা জমি কেনা, বাড়ী করা বা ফ্ল্যাট বানানোর জন্য টাকা ধার দেন খুবই সুবিধাজনক হারে। যেমন ধরুন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আবাসন অনুদান সমবায় সমিতি লিমিটেড (West Bengal State Housing Finance Co-operative Society Ltd.) অথবা ভারতের জীবন বীমা করপোরেশন (Life Insurance Corporation of India)। সমবায় আর জীবন বীমা নিয়ে এখানে একটা সাধারণ আলোচনা করা হল। সবকিছু খুঁটিয়ে জানতে হলে আপনাকে ঐ সব সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

● (ক). সমবায় আবাসন সমিতি

সাতজন বা বেশী বাস্তু-অভিলাষী মিলে একটা সমবায় সমিতি গড়া যায়। মোট মেম্বারের ৭৫ শতাংশ নিয়ে কাজ শুরু করুন।

বাকি ২৫ শতাংশ পরে যোগ দিতে পারেন। একজন সদস্য একটির বেশী বাস্তুর (বাড়ী বা ফ্ল্যাট) অধিকারী হতে পারবেন না। এই বাস্তু নিয়ে কোন লাভের কারবার চলবে না। যাঁদের মাথা গোঁজার ঠাই নেই শুধু তাদের সুলভে এবং সহজে আস্তানা গড়ে দেয়াই সমবায় আবাসন সমিতির মূল নীতি। বাড়ী বা ফ্ল্যাট বেচে লাভবান হওয়া বা বাস্তু নিয়ে

ফাটকাবাজির কোন সুযোগ সমবায় আবাসন সমিতিতে নেই। এই কারণেই সমবায়ের মেম্বার হওয়ার কতকগুলো বিধিনিষেধ হয়েছে, যেমন :

(১) একই এলাকায় একজন একটির বেশী আবাসন সমবায়ের মেম্বার হতে পারবেন না।

(২) ওই এলাকায় ওই মেম্বারের কোন বাস্তু সম্পত্তি থাকা চলবে না।

(৩) আবাসন সমিতি যে রাজ্যে, মেম্বারটিকে সে রাজ্যে পাকাপাকিভাবে বাস করতে হবে। কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহের রেজিস্ট্রার সব মেম্বারের কাগজপত্তর যাচিয়ে বাজিয়ে নিয়ে তবেই সমিতিকে রেজিস্ট্রেশন দেবেন। কেবল রেজিস্টার্ড কো-অপারেটিভ সোসাইটি তাঁদের মেম্বারদের হয়ে বাড়ি করার বা জমি কেনার টাকা ধার করতে পারেন। কো-অপারেটিভ সমিতির সভ্যদের সোসাইটির শেয়ার কিনতে হবে, সোসাইটির একটা কর্ম-পরিষদ (Board of Directors) তৈরি করতে হবে। এই পরিষদের মেয়াদ তিন বছরের। তিন বছর পর নতুন করে বাছাই করতে হবে। কোন সদস্য মারা গেলে তাঁর ওয়ারিশার তাঁর জায়গা পূরণ করবেন। ওয়ারিশারকে দেখাতে হবে যে আইন-মাফিক তিনি মৃতের ওয়ারিশার। নানা কারণে সভ্যপদ খারিজও হয়ে যেতে পারে। যেমন ধরুন :

(১) তিনি যদি দেয় টাকার নিয়মিত যোগান দিতে অপারগ হন।
(২) যদি জানতে পারা যায় যে আবাসন সমবায়ে ঢোকার তাঁর অধিকার নেই—কিছু বিষয় তিনি গোপন করেছিলেন।
(৩) যদি তিনি দেউলিয়া বা পাগল হয়ে যান।
(৪) যদি তাঁর ফৌজদারী আদালতে কোন শাস্তি হয়।
(৫) যদি তিনি ইচ্ছা করে সমিতির কোন ক্ষতি করেন।
(৬) যদি তিনি নিজের বাস্তুকে ভাড়া খাটান, অসামাজিক বা অনৈতিক কাজে লাগান বা এসব বিষয়ে সমিতির হুকুমনামা মানতে রাজী না হন।

এ সবের কোন একটা কিছু হলে সমিতি ১৫ দিনের নোটিসে ওই লোকটিকে খারিজ করে দিতে পারেন। কেউ যদি সোসাইটি থেকে ইস্তফা দিতে চান তাঁকে একমাসের নোটিস দিতে হবে। একটা কথা বলে রাখি, যেহেতু সমবায় সমিতি জনগণের টাকা নিয়ে কাজ-কারবার

করে, এঁদের হিসাব রাখতে হয় এক একটি পাইপয়সারও এবং সে হিসাব বছর বছর 'অডিট' (Audit) করিয়ে নিতে হয় সরকারী অডিটারকে দিয়ে। যে কোন আবাসন সমবায় এদিকটা অবহেলা করলে শেষকালে দারুণ ঠেকায় পড়ে যাবেন। এ বিষয় গোড়া বেঁধে কাজ করুন।

বছরে অন্তত একবার সব সদস্যদের মিটিং বা সভা করা দরকার। এই মিটিংয়ে সমিতির নিয়মকানুন রদবদল, সভ্যের তালিকা রদবদল, কর্ম-পরিষদ ও অডিটারের রিপোর্ট বিবেচনা, সমিতির হাওলাত নিয়ে আলোচনা ও দরকার হলে ভোটাভুটি করতে হবে এবং এসব বিষয়ে কর্ম-পরিষদ কিভাবে এগোবেন তার হুকুমনামা জারি করতে হবে। এইসব সভায় ও পরিষদের মিটিং-এ যে সব আলোচনা ও যে করণীয় নীতিমূলক-ভাবে ঠিক হল তা মিনিট বুকে (Minute book) লিখে তিনদিনের ভেতর সভাপতিকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে হবে। কর্ম-পরিষদে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, ট্রেজারার ও সাধারণ ডিরেক্টররা থাকবেন। কারু যদি সমিতির প্রাথমিক সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়, তিনি সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের সভ্যপদও হারাবেন। এইসব পদে থেকে যাঁরা খাটাখাটি করবেন তাঁদের কিছু বেতন দেওয়া যেতে পারে—রেজিস্ট্রার ও সমিতির সাধারণ মেম্বাররা যদি রাজী হন। তবে পদগুলি মূলতঃ সেবামূলক এবং আবাসন সমিতির সাধারণ নীতিই হবে সবদিক দিয়ে খরচ কমানো। বেতনভুক কর্মচারী বা নকশাকার নিয়োগের সময়ও এদিকটা ভাল ভাবে বিচার করে নিতে হবে। ঠিকাদার বা কনট্রাক্টার নিয়োগ করতে হবে টেণ্ডার ডেকে। বাস্তুবিদ্ বা নকশাকার এবং ঠিকাদার সমিতির সভ্য হতে পারবে না।

আবাসন সমবায় দুরকম। এক. সমিতি বড় জমি কিনে নকশা মাফিক রাস্তা, পার্ক, নর্দমা তৈরি করে সভ্যদের নিজের নিজের প্লট দিয়ে দেবেন যেখানে তাঁরা নিজের ঠিকাদার লাগিয়ে বাড়ি করবেন সমিতির আইন-মাফিক নকশায়। দুই. সমিতি জমি কিনে সভ্যদের বকলমে বহুতল বাড়ি করে ফ্ল্যাট বিতরণ করবেন তাঁদের। এক নম্বর টাইপে মেম্বারকে পয়লা জমির দাম মিটিয়ে দিতে হবে। জমির দাম এক সঙ্গে বা কিস্তিতে দুভাবেই মেটানো যায়। যদি সভ্যদের মত থাকে, সমিতিই তাদের ঠিকাদার দিয়ে বাড়িগুলি করে দিতে পারে। দু'নম্বর টাইপে সব কিছুই করতে হবে সমিতির নিয়োজিত বাস্তুবিদ্ ও ঠিকাদার মারফত। তবে

সভ্যদের সব সময়ই অধিকার থাকবে কাজের তদারকি করার ও মাল-মশলা যাচাই করে নেওয়ার।

● **দশের লাঠি, একের বোঝা**

দশে মিলে কাজ করার সবচেয়ে বড় সুবিধা, যত ভারীই হোক, কাজটা কারুর গায়ে লাগে না। সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের কখনো ছাদ ঢালাই করতে দেখেছেন ? ওঁরা কখনো মাথা মশলার কড়াই মাথায় করে সিঁড়ি বা ভারা দিয়ে ছাদে ওঠানামা করেন না। ১ মিটার (৩/৪ ফুট) ফাঁক রেখে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যান সিঁড়িতে বা ভারায়। তারপর মশলার কড়াই হাতে হাতে চালান হয়ে যায় মাথার জায়গা থেকে ঢালাইয়ের জায়গায়। সিঁড়ি ওঠানামার খাটুনি তো বাঁচেই। কাজ শেষ হয় তিনগুণ তাড়াতাড়ি। বিশ্বাস না হয়, নিজের বাড়ি ঢালাইয়ে এই সিস্টেম চালিয়ে দেখুন। ১০০ বর্গ মিটারের ছাদে কম করেও ২ ঘণ্টা সময় বেঁচে যাবে। একে বলে সমবায়। আবাসন সমবায়ের মাঝে লুকিয়ে আছে হরেক রকম লাভ। যেমন ধরুন :

(১) বাড়ি তৈরির বিষয়ে আপনার জান্‌কারী ড-ড নং। আর পাঁচ জনের সঙ্গে আপনার বাড়ি বা ফ্ল্যাটের তদারকীও হবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জোরদার।

(২) জমি কেনা থেকে বাড়ির পৌর-কর নিয়ে লড়াই—হাজার রকম ঝামেলা। এর কিছুই আপনাকে পোয়াতে হবে না। সব সামাল দেবে কর্ম পরিষদ।

(৩) টাকা আছে তো জমি নেই, জমি আছে তো টাকা নেই—এ হেন ঝামেলায় পড়েও আপনাকে ভাবতে হবে না। জমি আর টাকা, এ দুয়ের যোগসাধনে বাড়ি আপনিই হয়ে যাবে।

(৪) জমি কিনতে হলে দামের শতকরা ১ ভাগ মত বাড়তি গুনতে হয় রেজিস্ট্রেশন ফী বাবদ। মানে ৪০,০০০ টাকা দামের জমিতে ৪০০ টাকা গুন্‌হাগার। খবর রাখেন কিনা জানি না, সমবায়ের মারফত জমি কিনলে এর সবটাই মকুব করে দেন সরকার।

(৫) বাড়ি সমবায়ের মারফত হলে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আবাসন অনুদান সমবায় সমিতি [ঠিকানা : টেডি ম্যানসন (৪ তলা), পি ১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেন্‌শন, কলকাতা ৭০০০১২] ওরকে West Bengal

State Housing Finance Co-operative Society Ltd., শতকরা ৯½ টাকা হার সুদে ধার দেন মোট খরচের ৭০ শতাংশ অবধি। এত কম সুদে আর কোন চিন্তামণি ধারে-কাছেও আসবে না।

(৬) বাড়ি করার আনুষঙ্গিক খরচ (Overheads) সব মেম্বারের মাঝে ভাগ হয়ে যায় বলে আপনার পড়তা পড়বে খুবই কম।

(৭) আপনি ভারী 'বিজি' মানুষ। উদয়-অস্ত নানান ধান্দায় চক্কর দিচ্ছেন তো দিচ্ছেনই। সময়ের অভাবে আপনার কাজ আটকাবে না। সমবায়ের অপর বন্ধুরা রয়েছেন কি করতে? দরকার মত সহায়তার হাত তাঁরা বাড়িয়ে দেবেন। তবে একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে। সমবায়কে সফল করতে হলে সব সভ্যকে উৎসুক ভাবে সহায়তা করতে হবে এবং নিজে থেকে। 'তবেই একের বোঝা' দশের লাঠি হবে। নচেৎ নয়।

● ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ

বুঝতে পারছি, ওপরের ৫ নং সুবিধার জন্য আপনার মন করছে শুড়্ শুড়্, হাত করতে নিশপিশ। তবে দাঁড়ান মশাই, ও সব ধার-ফারের কিছু বখেড়াও আছে। সেগুলি জেনে নিন।

পয়লা কথা, ধার পাবেন কারা? আপনি কি তাদের একজন? নিজে মিলিয়ে নিন।

(১) আপনি যে সমবায়ের সভ্য, তাকে রেজিস্টার্ড হতে হবে। কারণ ধারটা পাওয়া যায় কো-অপারেটিভ সোসাইটির মারফত। ভূয়ো কো-অপারেটিভকে টাকা দিয়ে সরকার কি শেষে হাত কামড়াবেন?

(২) আপনার আয় হতে হবে মাঝারী রকম (M.I.G.—Middle Income Group)। মানে, বছরে ৪৮০০০ টাকার বেশী যদি আপনি আয় করেন তাহলে আপনি ধার পাওয়ার ধার দিয়েও যেতে পারবেন না! ১২০০০-এর কম হলেও নয়।

(৩) আপনার বয়স ৫০ বছরের বেশী হলে চলবে না। পঞ্চাশের পর যদি আপনি বনে চলে যান, ধার শুধবে কে মশাই?

এ সব মিলিয়ে যদি দেখেন আপনি ধার পাওয়ার উপযোগী তাহলে ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট সমেত আবেদন পাঠাতে হবে আপনার সমবায় সমিতির মারফতে। সঙ্গে দিতে হবে নকশা, বাস্তুবিদের সই-করা এস্টিমেট। খরচের ৭০ শতাংশ বা আপনার ৩৬ মাসের আয়, এর মাঝে যে অঙ্কটা কম,

ততটাই ধার পাবেন আপনি। কিন্তু একসঙ্গে নয়। বাড়ি ওঠার সঙ্গে তাল রেখে ৩/৪টি কিস্তিতে। তবে মোট ধারের অঙ্কটা কিছুতেই ৮০,০০০ টাকার উপর উঠবে না, সে আপনার আয়ব্যয় যাই হোক না কেন। সুদ বছরে শতকরা ১১২ টাকা। তবে এটা মাঝারী আয়ওয়ালাদের জন্য। আয়ের হের-ফের হলে সুদের হারও কমবে-বাড়বে। ধার (সুদে-আসলে) আপনাকে শোধ করতে হবে (সমিতির মারফত) পঁচিশ বছর বা তার কম সময়ে মাসিক কিস্তিতে।

● পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা

এখানে একটা হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখা দরকার। অনেক সমবায় সমিতিতে এক জাতের পাণ্ডা-গোছের লোক জুটে যায়, সমিতির মঙ্গলের থেকে নিজের আখের গুছানোর দিকেই তাদের নজর বেশী। তিন বছর বাদ বাদ পরিষদের নির্বাচনে এরা ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের দলের লোককেই চূড়ায় বসিয়ে দিয়ে বছরের পর বছর নিজেদের কোলে ঝোল টেনে চলে। খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, শুধু ভাল প্লট আর ফ্ল্যাটই এদের নামে বরাদ্দ হয়েছে, তাই নয়, বেনামিতে ঠিকাদারী, ঘুষের পয়সায় ফ্ল্যাটের দাম উস্থল, সভ্যদের ঠকিয়ে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা টাকা নিয়ে কাজের নামে নয়-ছয় করা এবং শেষ-মেশ সমিতির মাথায় কাঁঠাল ভেঙে টাকা নিয়ে লোপাট হয়ে যাওয়া—এ হামেশাই ঘটছে। এ সব লোকের সাহস বাড়ে একটা কারণেই। বেশীর ভাগ মেম্বার পরিষদের ঘাড়ে কাজ চাপিয়ে দিয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুম দেন। সাধারণ সদস্যদের নিয়ে যে জেনারেল মিটিং হয় বছরে একবার, তাতেও যোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না বেশীর ভাগের। এ তো চোরকে একরকম চুরি করতে খোসামুদি করা। সাধারণ সভ্যরা যদি একটু সজাগ হন, কড়া হন, মাঝে মাঝে পরিষদের কাজের একটু আধটু তদ্বির-তদারকি করেন, তা হলে সমবায়ের আইন এমনই কড়া যে এই সব জাত-শয়তান হাজার মানুষের সর্বনাশ করার সাহস পাবে না। মনে রাখবেন সৎ লোকেরই কেবল সাহস থাকে ; ঠগবাজরা হয় ভীতু। ওদের দাবাতে দরকার শুধু একটু কড়া নজরদারী।

কি খুব উৎসাহ লাগছে ? জানা-শুনো এন্তার বাস্তু-অভিলাষী পাবেন। গড়ে ফেলুন একটা আবাসন সমবায়। ২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড

(৮ম তলা), কলকাতা ৭০০০০১—এই ঠিকানায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন আছে। জেলায় জেলায় আছে এঁদের শাখা। যোগাযোগ করুন। সব রকম সহায়তা পাবেন। আবাসন সমবায় গড়ার বা চালানোর নিয়মকানুনের (byelaws) বই পাবেন এঁদেরই কাছে। কিনে নিন। একটু কষ্ট করুন, কেষ্ট পাবেনই।

● জীবন বীমা করপোরেশন

দরকারে, বিপদে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া জীবন বীমা কর্পোরেশনের মূল নীতি। বহু জনহিতকর কাজে আছে এদের মঙ্গল পরশ। ঘর, বাড়ি, ফ্ল্যাট, হোটেল, রেস্টুরেণ্ট, সিনেমা, অফিস বাড়ি—যা শুধু গড়নেওয়ালা নয়, দেশেরও উপকারে আসে, এমনি গড়ার কাজে উদারভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন এল. আই. সি.। "স্কীমের (Scheme) ফরমূলা কি বলবো বলুন তো! আমাদের তো অনেক রকম স্কীম। যিনি বা যাঁরা ধার নেবেন তাঁদের ও তাঁদের পরিকল্পনার আয়ব্যয়, লাভ-অলাভ সব খতিয়ে দেখে তবে এক একটা স্কীম খাড়া করা হয়। একটার সঙ্গে আর একটার কোন মিলই পাবেন না হয়ত।" ৪নং চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ের ৫ তলায় হাউস বিল্ডিং লোন (মরগেজ) ডিপার্টমেণ্টে বসে বলছিলেন ডিপার্টমেণ্টের এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (সারভিসিং)। জীবন বীমার কাছে বাড়ি তৈরির কাজে ধার নিতে আপনাকে এই ডিপার্টমেণ্টেই (ফোন : ২৩৬০৯১) আসতে হবে। বুঝিয়ে বললাম, "মাঝারী বা কম আয়ের মানুষকে নিজের থাকার বাড়ি করাতে আপনারা কিভাবে সহায়তা করতে পারেন, আমি শুধু তা-ই জানতে উৎসুক।" তখন তিনি আমার সামনে তুলে ধরলেন তাদের দু দফা স্কীম।

(ক) পয়লা পরিকল্প : নিজের বাড়ি গড়ুন

এই স্কীমে জমি ও বাড়ির মোট দামের ২/৩ ভাগ ধার হিসেবে পাওয়া যেতে পারে। ধারের অংক সবচেয়ে কম দশ হাজার টাকা, সব চেয়ে বেশী এক লাখ টাকা। ধার শোধ না হওয়া অবধি জমি-বাড়ি এল. আই. সি-র কাছে বন্ধক থাকবে। যত টাকা ধার দেওয়া হবে ঠিক তত টাকার জীবন বীমা করতে হবে। এক হিসাবে এটা ভালই। ধার করে শোধ দেবার আগে মারা গেলে, বৌ-ছেলেকে পথে বসতে হয় না। জীবন বীমার পাওনা টাকা থেকে এল. আই. সি. নিজেদের পাওনা কেটে নিয়ে

জমি-বাড়ির বন্ধকি ছাড়িয়ে দেন। এ বাড়িতেও ভাড়াটে বসানো চলবে না। মোট ধারটা দেওয়া হবে চার কিস্তিতে। বাড়ির কাজ যেমন যেমন এগোবে সেই হিসাবে। এল. আই. সি.-র ধার শুধু শহর ও আধা-শহর এলাকাতেই দেওয়া হয়। পল্লী অঞ্চলে এখনো এ সুবিধা পাওয়া যায় না। ধার পেতে হলে বয়েস পঞ্চাশ বছরের কম হতে হবে। ধার দেওয়ার ব্যাপারে এল. আই. সি. চাকুরে মানুষকেই বেশী পছন্দ করেন, কারণ এঁদের একটা বাঁধা আয় থাকে যা বজায় থাকে রিটায়ার করার আগে অবধি। তবে মাসিক আয় হাজার টাকা বা তার উপরে হওয়া দরকার। ধার পেতে হলে মিউনিসিপ্যালিটির পাস-করা নকশা, বাস্তুবিদের সই-করা এস্টিমেট, ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট ও জমির পাকা দলিলসহ আবেদন করতে হয়। আবেদনের ফরম 'হিন্দুস্থান বিল্ডিং'য়ের অফিসেই পাওয়া যাবে। সুদের হার বছরে শতকরা সাড়ে বারো টাকা। শোধ করতে হবে ৬৫ বছর বয়স বা চাকরি থেকে রিটায়ার করার (যেটা আগে হয়) ভেতর। নিয়মিত শোধ দিতে পারলে সুদের হার এক শতাংশ কমে যায়। কম আয়ের মানুষকে আর এক শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয় সুদের হারে। মানে তাঁদের বেলা সুদের হার ৯½ শতাংশে দাঁড়ায়। এই স্কীম ছোট বাড়ির উপযোগী।

(খ) দোসরা পরিকল্প : কারবারী সম্পত্তি বন্ধকী

এই স্কীমে জীবন বীমা করার কোন দরকার হয় না। তবে জমি ও বাড়ি ধার শোধ না হওয়া অবধি বন্ধক থাকে। জমি-বাড়ির মোট দামের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অবধি ধার দেওয়া হয়। তবে সব চেয়ে কম ও সব চেয়ে বেশী ধারের অঙ্ক বেঁধে দেওয়া আছে। তা হল ২৫,০০০ টাকা ও ৫,০০,০০০ টাকা। বার্ষিক সুদের হার পয়লা এক লাখে শতকরা ১২½ টাকা ও তার বেশী টাকার উপর শতকরা ১৪ টাকা। ছ মাস বাদে বাদে সুদে আসলে শোধ দিতে হবে হয় ১৫ বছরের ভিতর, না হয় ৬৫ বছর বয়েস হয়ে যাবার আগে (যেটা আগে হবে)। এই ধারও শুধু শহরাঞ্চলেই দেওয়া হয়। এই স্কীম বড় ফ্ল্যাট বাড়ির উপযোগী, যেখানে বাড়িওয়ালা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে আয় করবেন। তাই এর নাম কারবারী সম্পত্তি বন্ধকী পরিকল্প। আবাসন সমবায়ে গাঁ-ঘরের জমি-বাড়িতেও টাকা ধার পাওয়া যায়। জীবন বীমাতে সে পথ নেই। অপর দিকে

সমবায়ে দল না পাকালে ধার পাবেন না। জীবন বীমাতে আপনি একাল-ষেঁড়ে হলেও কুছ-পরোয়া নেই—বাকি সব দিক দিয়ে উপযোগী হলে টাকা পাবেনই।

সমবায় বা জীবন বীমা ছাড়া আজকাল বহু সরকারী ও বেসরকারী অফিস তাঁদের কর্মচারীদের খুব কম সুদে টাকা ধার দেন বাড়ি করার দরকারে। যাঁদের এ সুযোগ নেই অথচ রিটায়ার করার পর পেনশন পাবার হক আছে, তাঁরা পেনশন বাতিল (commute) করে তার বদলে বাড়ি করার টাকা ধার করতে পারেন। বেসরকারী অফিসে পেনশন থাকে না কিন্তু প্রভিডেন্ট ফাণ্ড (Provident Fund) বা 'বিপদ-বারণ-ভাণ্ডার' থাকে। এখান থেকেও ধার করা যায়। কিছু অফিসে কর্মচারীদের ধার দেবার সমবায় থাকে। টোকা মেরে দেখতে পারেন।

● **এইচ. ডি এফ. সি. (H. D. F. C.)**

কোথাও যদি না জোটে চলে যান ২০ নম্বর ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে কুক অ্যাণ্ড কেলভি বিল্ডিংয়ের দোতলায় হাউসীং ডেভালাপমেণ্ট ফিনান্স কর্পোরেশান লিমিটেডের অফিসে। ফোন: ২৮১৯৮১ এবং ২৮২১৪৬। এ ছাড়া পূর্বাঞ্চলে ভুবনেশ্বর ও গৌহাটিতেও অফিস রয়েছে এঁদের। ধার দেওয়ার স্কীমটির নতুনত্ব আছে; নাম লোন-লিঙ্কড-ডিপোজিট বা এল. এল. ডি.। এই যোজনায় আপনাকে একটা নির্দিষ্ট হারে মাসিক কিস্তিতে সঞ্চয় বা ডিপোজিট করতে হবে। ২০০ টাকা দিয়ে শুরু করে ক্রমে বাড়িয়ে তোলা যায়। আপনার বাড়ি গড়ার প্রয়োজনীয় মূলধনের ২০% জমলে এইচ. ডি. এফ. সি. বাকি ৮০% ঋণ হিসেবে দেবেন যা আপনার সুবিধামত হারে ২০ বছরের মধ্যে আপনাকে শোধ করে দিতে হবে সামর্থ্যমত কিস্তিতে।

যে কোন ভারতবাসী একক বা যূথবদ্ধভাবে ভারতের যে কোন অঞ্চলে আবাসন সৃষ্টির উদ্দেশে এই ঋণ পেতে পারেন। সে আবাসন স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ি বা বহুতল আবাসিকার ফ্ল্যাটও হতে পারে। ঋণের পরিমাণ প্রতি ক্ষেত্রে ৭,০০০ টাকা থেকে ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। ঋণের পরিমাণ ঠিক করার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে:

(১) ঋণের পরিমাণ জমি সমেত মোট সম্পত্তির ৮০ শতাংশের বেশী হবে না।

(২) গ্রহীতার শোধ করবার ক্ষমতার উপরও নির্ভর করে ঋণের পরিমাণ। এই ক্ষমতা স্থির করা হয় গ্রহীতার আয়, বয়স, শিক্ষা, সম্পত্তি, দায় ও সঞ্চয়ের প্রবণতা বিচার করে।

(৩) নির্মাণ কাজের অগ্রগতির সাথে সাথে তিন কিস্তিতে টাকা দেওয়া হয়। সুদ ১২½% থেকে ১৪½% এর মধ্যে।

২০০ টাকা দিয়ে একাউন্ট খুলে প্রতি মাসে ৫০ টাকার গুণিতকে জমাতে হবে ১৮ মাস থেকে ৬০ মাস পর্য্যন্ত। স্বভাবতই সময়টা জমার কিস্তি ও ঋণের চাহিদার আনুপাতিক। যেমন:

১৮ মাসিক জমা পর্বে ১৫টি মাসিক কিস্তির প্রতিটির পরিমাণ	মোট জমা টাকা	সম্ভাব্য ঋণের পরিমাণ
২৫০ টাকা	৩৭৫০ টাকা	১৫,০০০ টাকা
৩৫০ "	৫০০০ "	২০,০০০ "
৬৫০ "	১০,০০০ "	৪০,০০০ "
১০০০ "	১৫,০০০ "	৬০,০০০ "
২০০০ "	৩০,০০০ "	১,২০,০০০ "

জমা টাকার উপর ৯ শতাংশ সুদ দেন এইচ. ডি. এফ. সি.। সুদে প্রাপ্ত ৭০০০ টাকা পর্যন্ত আয় আয়কর মুক্ত। স্কীমের আর একটা আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে গ্রহীতাদের একাউন্ট নম্বর নিয়ে মাঝে মাঝে লটারী করা হয়। পুরস্কার যথাক্রমে ২৫০০০ (একটি), ১০,০০০ (তিনটি), ৫০০০ টাকা (চারটি), ৩০০০ (পাঁচটি), ১০০০ (নব্বইটি)।

এক কথায় দাঁড়াল, যদি চিনি খেতে চান, চিন্তামণির অভাব হবে না। দুধ-চিনি যোগাড় হল। কিন্তু রাঁধবার কেরামতি না জানলে পাক করবেন কেমন করে? সেটা শিখে নিন।...

৬

পাক করা খুব বিপাক নয়

জমি, টাকা আর নকশা জোগাড় হতেই রহমন চাচা নেমে পড়েছিল দিগ্বিজয় বাবুর বাড়ি গড়তে—আপনারও তো সব রেডি। বাড়ি জীবনে করবেন একবারই। পাক করা খুব বিপাক নয়। একটু শুধু কেরামতির দরকার। ওই কেরামতিটুকু জেনে নিন। তারপর নিজে দাঁড়িয়ে তদারকি করুন। শেষ হলে না হয় গঙ্গাস্নান করে নেবেন! অতএব নেবে পড়ুন।

[১] বুনিয়াদ

নকশা মাফিক বাড়িটাকে জমিতে এঁকে নিতে হয়, চুনের দাগ দিয়ে। তাকে বলে লে-আউট করা। এই লে-আউটের দাগ ধরে বুনিয়াদের মাটি কাটা হয়। লে-আউটে ভুলচুক হয়ে গেলে পুরো বাড়িটাই তৈরি হবে উল্টো-পাল্টা ভাবে। দেয়ালের যে অংশটা মাটির নিচে থাকে, তাকে বলা হয় বুনিয়াদ। জমি বা মাটি থেকে বাড়ির মেঝেটা ০.৬ মিটার থেকে ০.৯ মিটার (২ ফুট/৩ ফুট) উঁচু করা হয়—যাতে জল-কাদা, সাপ-বিছে, পোকা-মাকড় ঘরে উঠে না আসে। দেয়ালের এই অংশটাকে প্লিন্থ বা ভিত বলা হয়।

● ভিতের উপরই তো দাঁড়াবে ইমারত

নরম মাটিতে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারুন। গর্ত হয়ে লাঠিটা ভিতরে বসে যাবে। এবার মাটিতে একটা থালা পেতে তার উপর লাঠির খোঁচা দিন, জোরে, সজোরে, আরও জোরে, যত জোরে পারেন। থালাটা মাটির ভিতর তিন মিলিমিটারও বসল না। কেন জানেন? আপনার পুরো তাগদ ছড়িয়ে পড়লো সারা থালার নিচেকার মাটিতে। লাঠির সুচালো ডগার নিচের মাটিটুকু বসাতে পারলেও, থালার নিচের অতটা মাটিকে বসানোর শক্তি আপনার নেই। ঠিক এই একই কারণে দেয়ালের ওজন হিসেবে (বাড়িটা একতলা, দোতলা, না আরো উঁচু হবে, সেই বিচার করে) দেয়ালের বুনিয়াদটা অনেক বেশী চওড়া করে দেওয়া হয়—পাছে দেয়াল বসে যায়। ৬.১নং: নকশায় পাশাপাশি দোতলা, তিনতলা ও একতলা

১০"
ডি,পি,সি
মেঝে
২'-০"
বাইরের জমি
১৫'
গাঁথনী
১১"
৬"
৬"
৬"
৪"
২০"
২৫"
৩০"
ঢালাই
সোলিং
৩'-০"
৩"
দোতলা
১০"
২'-০"
জমি
১৫"
১১"
২০"
২৫"
৩০"
৩৫"
৩'-৬"
তিনতলা
১০"
২'-০"
জমি
১৫"
১'-৩"
২০"
২৫"
২'-৬"
একতলা

৬.১—নানান মাপের ভিত।
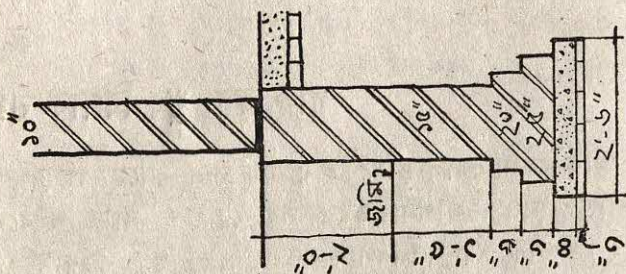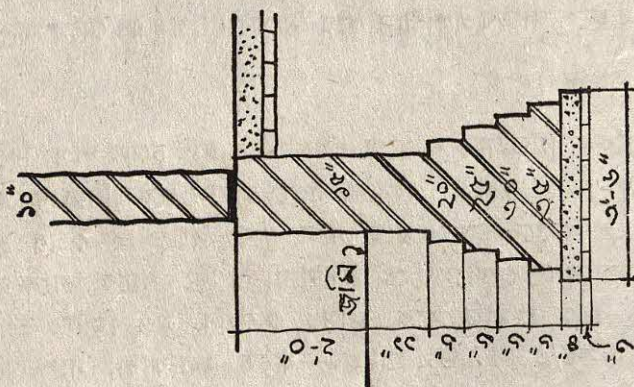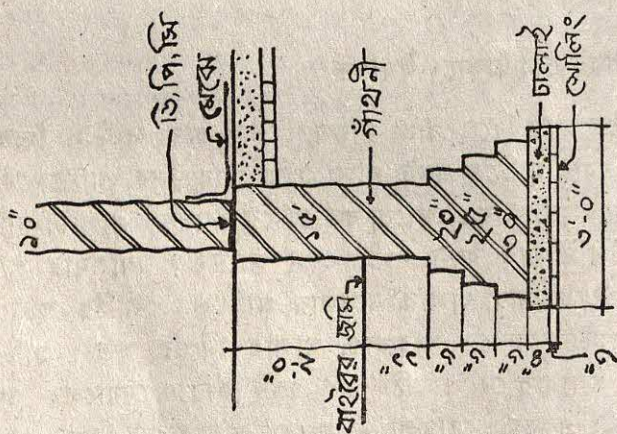
বাড়ির বুনিয়াদ দেখান হল। দেখুন ওজন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুনিয়াদ কি রকম চওড়া হয়ে গেছে। এবার দেখুন, যে লাঠিটা দিয়ে আপনি গর্ত করছিলেন সেটাকে মাটিতে পুঁতে খাড়া করে রাখতে হলে একটুখানি গর্তে সানাবে না। কম করেও আধহাত না পুঁতলে সেটা আলগা হয়ে পড়ে যাবে। বাড়ির বেলাও একই নিয়ম। জমি কেটে ০·৯ মিটার/১ মিটার (৩/৩½ ফুট) তলা থেকে বুনিয়াদ গেঁথে আনতে হবে। পুকুর ভরাট করা জমি হলে আরো বেশী নিচে যেতে হবে। পুকুর ভরাট করা জমি হলে নকশাকারকে আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দেবেন। তিনি তো আর আপনার জমির ইতিহাস জানেন না।

● ৩-৪-৫ এর নিয়ম

লে-আউট করার সময় দেখে নিতে হবে যে বাড়ির কোণগুলি সমকোণ হচ্ছে কিনা। না হলে ঘরগুলি সমকোণ হবে না। ফলে ঘরগুলি যে দেখতেই বেখাপ্পা হবে তাই নয়, ঘরের অনেক জায়গাও বেকাজের হয়ে
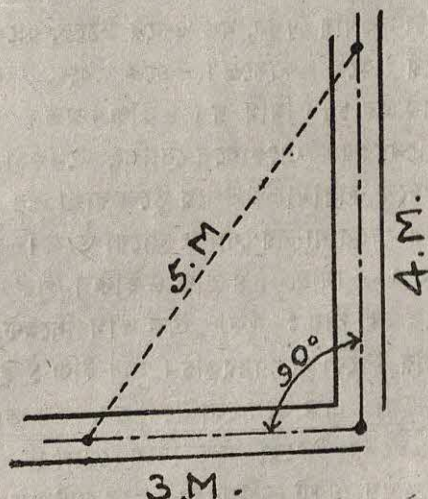
৬.২—৩-৪-৫ এর নিয়ম।

যাবে। মিস্ত্রি পরখ করার কাজটা মাটাম দিয়ে সারে। মাটামের গঠন-দোষে বা তাড়াহুড়োতে গলাত থেকে যেতে পারে। আপনি এই পরখ করার কাজটা নির্ভুল করে সারতে পারেন ৩-৪-৫ এর নিয়মে। ৬.২নং

নকশাটা দেখুন। দুই দেয়ালের কোণ থেকে পয়লাটায় ৩ মিটার (১০ ফুট) দূরে এবং দোসরাটায় ৪ মিটার (১৩ ফুট ২ ইঞ্চি) দূরে দুটো খোঁটা পুঁতুন। এই দুই খোঁটার মাঝে কোণাকুণি মাপটা ৫ মিটার (১৬ ফুট ৫ ইঞ্চি) হওয়া দরকার। না হলে বুঝবেন সমকোণ করার ভিতর কিছু ভুলচুক রয়ে গেছে। সাধে আর রহমন চাচা হাঁক পেড়েছিল : "ওভারসির বাবুকে ডাকুন, লে-আউট দিয়ে যাবেক।"

বুনিয়াদ কাটার সময় খেয়াল রাখতে হবে কোথাও যেন গর্ত বেশী না হয়ে যায়। মজুরের ভুলে অনেক সময় বেশী কাটা হয়ে যায়। সে রকম হলে ওই জায়গাটুকু সিমেন্ট-বালি মেখে দুরমুশ পিটিয়ে সমতল করে দেওয়া উচিত। আরও ভাল হয় যদি পুরো বুনিয়াদটাই ২৫ মিলিমিটার (১ ইঞ্চি) মত কম গভীর করে দুরমুশ পিটিয়ে ওই ২৫ মিলিমিটার মাটি বসিয়ে নেওয়া যায়। তাতে জমির ভারবাহী তাগদ দুগুনো হয়ে যাবে। এই সঙ্গে যদি কিছু চিকন বালি ছড়িয়ে দেন তা হলে মাটিতে ফোকর বা ফাটল থাকলে, তা ভরে দিয়ে মাটিকে আরো নিরেট করে তুলবে। বুনিয়াদের চওড়াটা নকশায় দেখুন, যত ওপরে উঠছে, ধাপে ধাপে ৬০/৬২ মিলিমিটার করে কমে আসছে। একে বলে আফসেট দেওয়া। আফসেটের খাড়াই হয় ১৫০ মিমি.-র (৬ ইঞ্চি) মত। বুনিয়াদের নিচে একসার ইট বিছানো হয়। একে বলে সোলিং, অনেকটা জুতোর সোলিং-এর মত ; বুনিয়াদকে কাদামাটির উপরে তুলে রাখা এর কাজ। সুলভে বালি পেলে ইটের বদলে বালির সোলিং আরো ভাল। এর উপর থাকে ১০০ মিমি. থেকে ২০০ মিমি. (৪ ইঞ্চি-৮ ইঞ্চি) পুরু একটা ঢালাই। এ ঢালাই দু'ভাবে করা যায় : (ক) এক ভাগ সিমেন্ট, চারভাগ বালি ও আটভাগ ঝামার টুকরো বা পাথরকুচি (আধ ইঞ্চি-১ ইঞ্চি মাপ) জল দিয়ে মেখে ; বা, (খ) এক ভাগ ফোটানো চুন, তিন ভাগ লাল সুরকি ও ছয় ভাগ লাল ইটের টুকরো জল দিয়ে মেখে। এটা একটু সস্তা পড়ে। মাপের চেয়ে একটু বেশী ঢালাই করে সেটুকু দুরমুশ করে বসিয়ে নেওয়া উচিত। চুন-সুরকির ঢালাই যদি ১৫০ মিলিমিটারের চেয়ে বেশী গভীর হয়, তাহলে তিন মিটার (১০ ফুট) বাদে বাদে ৭৫ মিমি. (৩ ইঞ্চি) গভীর গর্ত করে জল ঢালুন। ১৫ মিনিটে যদি গর্তটা খালি হয়ে যায়, জানবেন আরো দুরমুশ করার দরকার আছে। ঢালাই পিলারের বুনিয়াদে লোহার জাল পেতে ঢালাই করা হয়। সেখানে

ঢালাইয়ের ভাগ দেওয়া হয়—১ ভাগ সিমেন্ট, ২ ভাগ বালি ও ৪ ভাগ পাথরকুচি মিশিয়ে। সিমেন্টের ঢালাই যদি একদিনে শেষ করা না যায়, জোড়াইয়ের মুখটা খাড়া করে না ছেড়ে ঢালু করে ছাড়বেন। পরদিন কাজ শুরুর আগে ওই জোড়াইয়ের মুখে ভাল করে জলে সিমেন্ট গুলে মাখিয়ে দিতে ভুলবেন না।

[২] **ডি. পি. সি. (ড্যাম্প প্রুফ কোরস) ঃ**

মাটির জলীয় অংশ বুনিয়াদ বেয়ে উপরে উঠে মেঝে ও দেয়ালকে ভিজে ভিজে স্যাঁতসেঁতে করে দেয়। এই জল ওঠা আটকাতে ভিতের উপর দেয়ালের নিচে মেঝের সঙ্গে সমান করে ডি. পি. সি. তৈরি করা হয় (৬.১ নং নকশা)। এটা তিন ভাবে করা যায় ঃ

(ক) সস্তা বাড়িতে ৩ মিলিমিটার মোটা করে বালি মেশানো গরম আলকাতরা মাখিয়ে ;

(খ) ১৮ মিমি. মোটা করে পলেস্তারা করতে হবে তিন ভাগ বালি, একভাগ সিমেন্ট ও আধভাগ পাউডার সোডা মিশিয়ে ; অথবা,

(গ) ২৫ মিমি. মোটা করে একভাগ সিমেন্ট, দুভাগ বালি ও চার ভাগ ছোট পাথরকুচি মিশিয়ে ঢালাই করে। এর সঙ্গে মেশানো উচিত জল-রোধক রাসায়নিক অনুপান (বাজারে সিকো, রেলা, একোপ্রুপ নামে কিনতে পাওয়া যায়।)

[৩] **উই দমন ঃ**

বাংলা দেশের ভিজে মাটিতে উই পোকার উৎপাত বড্ড বেশী। দরজা, জানালা, চৌকাঠ, সিলিং, দেয়াল আলমারী, প্যানেলিং খেয়ে এরা বাড়ির ভুষ্টিনাশ করতে ওস্তাদ। হয়তো ভাববেন গুল্ মারছি, ব্যাঙ্কের লোহার ভল্টের ভিতরও দামী দলিল এবং টাকার বাণ্ডিলে উই লাগতে দেখা গেছে। ব্যাঙ্কের ভল্টের লোহার আলমারী থাকে এমন জোরদার ঘরে যার দেয়াল, ছাদ ও মেঝে সিমেন্টের নিরেট ঢালাই করে তৈরি। কিছু রাসায়নিক আছে যেমন অলড্রিন, ডায়ালড্রিন, গামা বি. এইচ. সি. ক্লোরডেন বা হেপ্টাক্লোর—এগুলো হচ্ছে উই পোকার যম। এগুলোর একটি মাপ মতন জলে গুলে যদি বুনিয়াদের ও মেঝের তলায় মাটিতে সোলিং করার আগে ভাল করে ছিটিয়ে দেওয়া যায় তাহলে চিরকালের মত উই পোকার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। খরচ খুব একটা বেশী নয়।

[৪] দেয়াল :

॥ দেওয়ালের বংশ-তালিকাটা এই রকম ॥
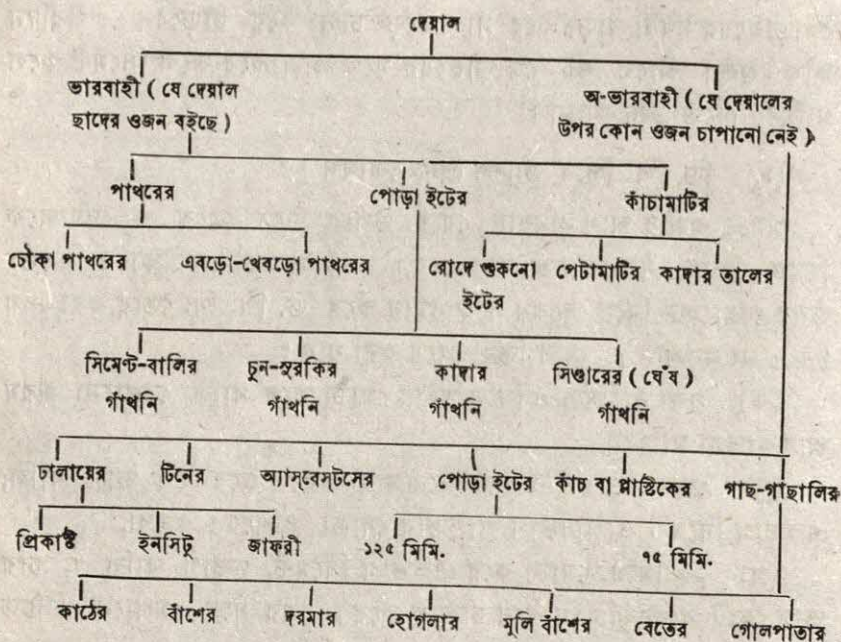
আমাদের দেশে পাকা বাড়ির ৯৯ শতাংশ দেয়ালই পোড়া ইটের। কাঁচা বাড়ি নিয়ে তো পল্লী মঙ্গলের আসরে অনেক বক্‌বক্ করেছি।

● **পোড়া ইটের গাঁথনির দু' অংশ :**

(১) ভাঁটায় পোড়ান মাটির ইট। মাপ এক এক এলাকায় এক এক রকম। পশ্চিমবঙ্গের ইটের মাপ ২৫০ মিমি. × ১২৫ মিমি. × ৭৫ মি. (১০ ইঞ্চি × ৫ ইঞ্চি × ৩ ইঞ্চি)।

(২) গাঁথনির মশলা। দু' রকম হতে পারে : (ক) ছয় বা চার ভাগ বালির সঙ্গে এক ভাগ সিমেন্ট মিশিয়ে, (খ) তিন বা দুই ভাগ সুরকির সঙ্গে একভাগ ফোটানো পাথুরে চুন মিশিয়ে। কাদা ও ঘেঁসের গাঁথনি সস্তা হলেও টেকসই নয়। অ-ভারবাহী পাতলা দেয়ালে সিমেন্ট বালির মশলা (১ : ৪ ভাগে) ছাড়া অপর মশলা অচল। দেয়াল ১৫ ইঞ্চি মোটা হলে মশলায় সিমেন্ট বালির ভাগ ১ : ৮-ও করা যায়। গাঁথনির চওড়া হিসাবে তিন রকম হতে পারে—(ক) ২৫০ মিমি. (১০ ইঞ্চি)

বা তার থেকে চওড়া, (খ) ১২৫ মিমি. বা ৫ ইঞ্চি এবং (গ) ৭৫ মিমি. বা ৩ ইঞ্চি। ইটের গুণ বিচারে চার রকম ইট হয়ঃ (ক) এক নম্বর বা ফার্স্ট ক্লাস, (খ) দু' নম্বর বা সেকেণ্ড ক্লাস, (গ) এক নম্বর পিক্‌ড (Peaked) ও (ঘ) তিন নম্বর বা থার্ড ক্লাস। এক নম্বর ইটের রং হবে কালচে লাল, সমকোণী, বাঁকাচোরা নয়। সব ইট এক মাপের। ইটে ইটে ঠুকলে আওয়াজ হবে ঠং ঠং করে, ঢপ্ ঢপ্ করে নয়। এক বা সওয়া এক মিটার উপর থেকে ইটের উপর ফেললে ভাঙ্গবে না। কোন রকম জলদাগী থাকবে না। এক নম্বর পিক্‌ডেরও এই সব গুণ থাকবে। তবে রং হবে আর একটু গাঢ় কালচে লাল। মানে একটু বেশী পোড়-খাওয়া। ভাল গাঁথনির কাজ এক নম্বর ইট ছাড়া অচল। যে সব এলাকায় (যেমন গড়িয়া-সোনারপুর অঞ্চল) ইটে খুব বেশী নোনা লাগে, সেখানে এক নম্বর পিক্‌ড ইট দিয়ে গাঁথনি করলে নোনার ভয় থাকে না, তবে পিক্‌ড ইট একটু বেশী মশলা খায়। সস্তার বাড়ীতে দু' নম্বর ইটে গাঁথনি করা যায়। তিন নম্বর ইটে গাঁথনি না করাই ভাল। এ ছাড়া আধ পোড়া ইটকে বলে আমা ইট, যা সোলিংয়ের কাজে লাগে। খুব বেশী পুড়ে কালো রং হয়ে গেলে তাকে বলে ঝামা। সস্তার কাজে ঝামার টুকরো পাথরকুচির বদলে লাগানো যায়।

২৫০ মিমি. বা তার কম চওড়া দেয়ালে সিমেন্ট বালির গাঁথনি করাই ভাল। খুব সস্তায় করতে হলে কাদার গাঁথনি ছাড়া উপায় নেই। এখানে দেয়াল ৩৭৫ মিমি. (১৫ ইঞ্চি)-এর কম হওয়া উচিত নয়। চুন-সুরকির গাঁথনি করতে হলে ভাল পাথুরে চুন জমিতে এনে ফোটাতে হবে। একটা বাঁধানো জায়গায় ১৫০ মিমি. (৬ ইঞ্চি) উঁচু করে চুন গাদা দিয়ে তাতে ধীরে ধীরে জল মেশাতে হবে। চুন আওয়াজ করে ফুটতে থাকবে। মাঝে মাঝে বেলচা করে তাকে উল্টে পাল্টে দিতে হবে। চুন চৌবাচ্চাতে ফোটানো যায়। তাতে কাজ হয় আরও পাকা, তবে খরচ পড়ে বেশী। চুন পুরো ফুটতে ২৪ ঘণ্টা সময় নেবে। একমণ মানে ১'৭ ঘন ফুট না-ফোটানো চুন থেকে ২'৫ ঘন ফুট ফোটানো চুন পাওয়া যাবে। এক নম্বর ইটের টুকরো থেকে যে লাল সুরকী করা যায় তা-ই গাঁথনির মশলায় মেশানো উচিত। ১০০ ঘন মিটার গাঁথনিতে ৩৬ ঘন মিটার মত মশলা লাগবে। মশলার ভাগ যদি ২ : ১ হয়, তা হলে সুরকি লাগবে ৩৬ ঘন মিটার ও পাথুরে চুন (না-ফোটানো) লাগবে ৪১ কুইন্টাল। সিমেন্ট-

বালির মশলায় বালির ভাগ নির্ভর করে দেয়ালের চওড়ার উপর। যেমন :

৩৭৫ মিমি. (১৫ ইঞ্চি) দেয়াল—১ ভাগ সিমেন্ট ৮ ভাগ বালি
২৫০ " (১০ ") " —১ " " ৬ " "
১২৫ " (৫ ") " —১ " " ৪ " "
৭৫ " (৩ ") " —১ " " ৩ " "

মাঝারী দানার পরিষ্কার বালি নিতে হবে। এতে যেন মাটি বা চিকন বালির মিশাল না থাকে। ভাগ যদি ১ : ৬ হয় তা হলে ১০০ ঘন মিটার
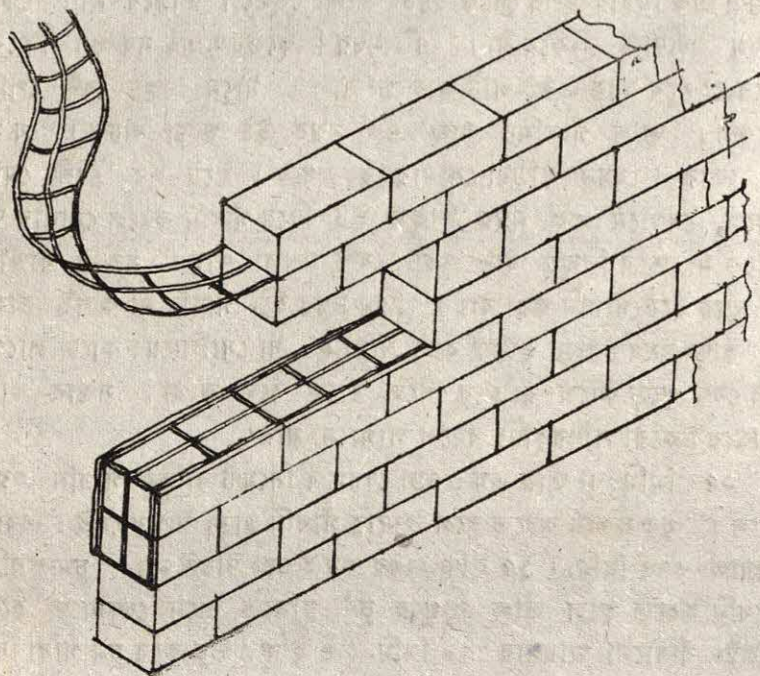
৬.৩—১২৫ মিমি. দেয়ালে জালের ব্যবহার।

গাঁথনিতে প্রায় ১৬৫ বস্তা সিমেন্ট ও ১১ ঘন মিটার বালি লাগবে। ৭৫ মিমি. দেয়ালে এবং দামী কাজে ১২৫ মিমি. দেয়ালে ৩ বা ৪ রদ্দা গাঁথনির বাদে বাদে মশলার মাঝে ৬.৩নং নকশা মাফিক তারের জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়। এতে দেয়াল অনেক মজবুত হয়ে ওঠে।

● **৩য় সংস্করণের সংযোজন : ২০০ মিমি. (৮ ইঞ্চি দেয়াল)**

৬.৩.১ নং নকসায় দেখুন নতুন ধরনের এই গাঁথনিতে পাশাপাশি গাঁথা হয়েছে দু' রদ্দা (layer) ইট ৩" ইঞ্চি চওড়া করে ও তিন রদ্দা
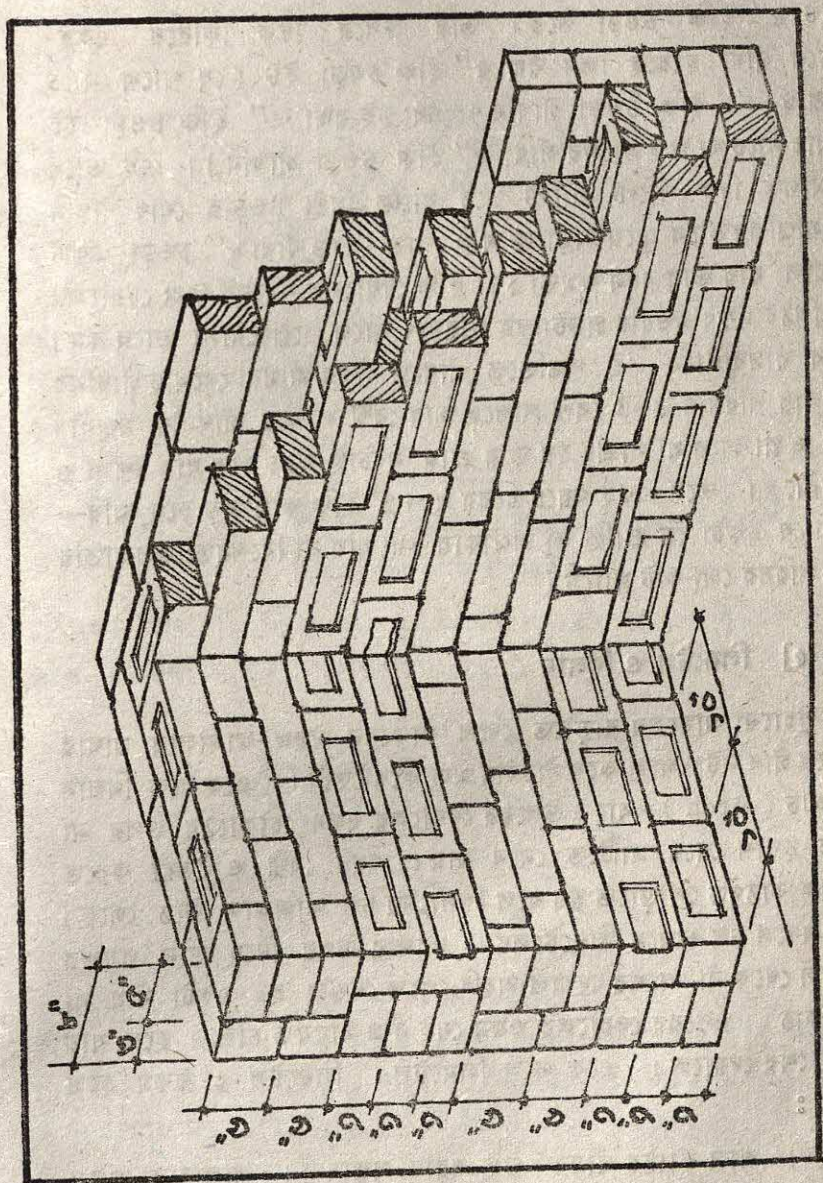
৬.৩.১ - ২০০ মিমি দেয়াল

ইট ৫" ইঞ্চি চওড়া করে। তার উপরে দিক ফিরিয়ে একই-ভাবে গাঁথা হয়েছে তিন রদ্দা ৫" ইঞ্চি চওড়া ইট (যে পাশে নীচে রয়েছে ৩" ইঞ্চি চওড়া গাঁথনি) এবং দুই রদ্দা ৩" ইঞ্চি চওড়া ইট (যার নীচে থাকছে আগের গাঁথা ৫" ইঞ্চি চওড়া গাঁথনি)। এই ভাবে ক্রমাগত দিক পাল্টে পাল্টে উঠে যাচ্ছে মিশ্র চওড়ার যৌথ গাঁথনি যা সম্মিলিতভাবে হয়ে দাঁড়াচ্ছে শক্ত পোক্ত জোড় বাঁধা ৮" চওড়া একটি দেয়াল যার ভার বহন ক্ষমতা ১০" ইঞ্চি দেয়ালের সমানই এবং দেয়ালের দু' পিঠই মসৃণ হওয়ায় প্লাস্টারের পরিমাণ লাগে উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। তবে রামবাগানে এই পদ্ধতিতে গাঁথতে গিয়ে আমরা দেখেছি গাঁথনির মশলার পরিমাণ একটু বেশী লাগছে আর বেশী লাগছে গাঁথনীর মজুরী। ইট ও প্লাস্টারে যা সাশ্রয় হয় তার প্রায় সবটাই খরচ হয়ে যায় মশলা ও মজুরীতে। তবে একই খরচে ঘরের মাপ দু' ইঞ্চি করে বড় হয়ে যায়—এটা যে একটা বড় প্রাপ্তি তা অস্বীকার করা যায় না বিশেষতঃ কলকাতার স্বল্প পরিসর লো-কস্ট ফ্ল্যাটে।

[৫] লিনটেল ও খিলান

পুরানো আমলের বাড়ীতে দেখে থাকবেন দরজা-জানালার মাথার উপরে গাঁথনিটা গোল করে সাঁকোর মত করে তৈরী। একে বলে খিলান বা আর্চ (Arch)—যাতে উপরের দেয়ালের ওজন চৌকাঠের উপর না পড়ে, দুপাশ বেয়ে মাটিতে নেবে যায়। খরচ বেশী ও তৈরী করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় বলে খিলানের চল আজকাল উঠে গেছে। তার বদলে চল হয়েছে লিনটেলের। দরজার উপর দিয়ে ডান পাশের দেয়াল থেকে বাঁ পাশের দেয়াল অবধি পেতে দেওয়া হয় একটা বীম বা কড়িকাঠ। ওপরের দেয়ালের ওজন সেই বীম মারফত চালান হয়ে যায় দু' পাশের দেয়ালে। একে বলে লিনটেল। লিনটেল ৩ রকম হতে পারে :

(ক) শাল কাঠের বীম। উই ধরার সম্ভাবনা। লাগাবার আগে আলকাতরা মাখিয়ে নেওয়া দরকার। গাঁয়ে বেশী চল।

(খ) আর. বি. লিনটেল। ৬.৪.১. নং নকশা অনুযায়ী ইট সাজিয়ে, তার মাঝে লোহার রড দিয়ে, ফাঁকগুলো বালি-সিমেন্ট দিয়ে ভরে সস্তায়

চমৎকার লিনটেল করা যায়। সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে এর তুলনা নেই।
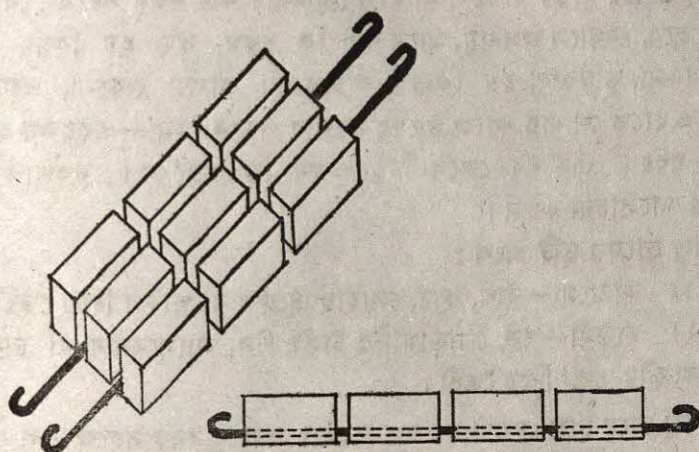
৬.৪.১.—ইট সাজিয়ে লিনটেল

(গ) আর. সি. সি. বা ঢালাই লিনটেল। বেশী খরচ, বেশী টেকসই। ৬. ৪. ২ নকশা মাফিক লোহার খাঁচা করে ১০০ মিমি. (৪ ইঞ্চি) খাড়াই
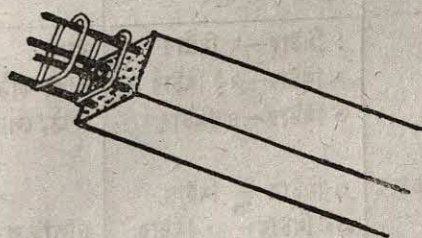
৬.৪.২—ঢালাই লিনটেল।

করে ঢালাই করুন। ১½ মিটার অবধি চওড়া দরজা-জানালার উপর ভালভাবে কাজ চলে যাবে। তবে ইঞ্জিনীয়ারীংয়ের নিয়ম মাফিক যে কোন ঢালাই লিনটেলের খাড়াই ১৫০ মিমি.-র কম হয় না।

[৬] ঢালু ছাদ ঃ

ছাদ দু' রকম। ঢালু ছাদ, যার উপর দিয়ে কেবল বেড়াল এবং হিন্দি সিনেমার নায়করা ঘুরে বেড়াতে পারে (এবং মারামারিও করে।) আর পাকা ছাদ, যার উপর আপনি, আমি, পাঁচটা ভদ্দর লোক ঘুরে

বেড়াতে পারে (এবং ঘুড়ি ওড়ায়)। ছাদ ঢালু হবে, না পাকা হবে তা ঠিক করতে জানা দরকার কত খরচ করা যাবে ; মাল-মশলা কিরকম মিলবে ; ঘরে মানুষ থাকবে, না মাল ; বুনিয়াদ কত ওজন সইবে ; যেখানে বাড়ী হবে, সেখানে জলবায়ু, মানে বর্ষা কি রকম, ঝড় হয় কিনা, বরফ পড়ে কিনা, ভূমিকম্প হয় কিনা ; আচার বা কাপড় শুকনো, প্যাণ্ডেল বাঁধা ও রাতে শোয়ার কাজে ছাদের দরকার পড়বে কিনা—এইরকম হরেক খবরা-খবর। এই সব ভেবে ঠিক করুন কি করবেন। নকশাকারের সঙ্গেও আলোচনা করুন।

● **ঢালু ছাদের দুটি অংশ :**

(১) কাঠামো—বাঁশ, কাঠ, লোহার এঙ্গেল বা পাইপ দিয়ে তৈরী।

(২) ছাউনী—খড়, পোড়ামাটির টালী, টিন, অ্যাস্‌বেস্টস বা ঢালাই করা কংক্রীট তক্তা দিয়ে তৈরী।

ঢালু ছাদে ঢাল দেওয়া হয় যাতে বর্ষার জল ও বরফ সহজে ঢাল বেয়ে নেবে যেতে পারে। কতটা ঢালু হবে তা নির্ভর করে ছাউনীর মাল-মশলার উপর :

ছাদের মাল-মশলা	কত মিটার লম্বায় এক মিটার ঢাল হবে	কাঠামোর মালমশলা
খড়ের ছাউনী	১ মিটার—২ মিটার	বাঁশ
পোড়া মাটির টালী	২ মিটার—২½ মিটার	বাঁশ, কাঠ
টিনের ঢেউ চাদর	৩ মিটার—৪ মিটার	কাঠ, লোহার এঙ্গেল, পাইপ
অ্যাস্‌বেস্‌টসের ঢেউ চাদর	৬ মিটার—৮ মিটার	ঐ
ঢালাই করা ছাদ	৩০ মিটার—৬০ মিটার	ঢালাই করা তেকোণা কাঠামো

ঢালু চাল একচালা (৪ মিটার চওড়া ঘরে) দো-চালা (চওড়া ৪ মিটারের উপর), বা চারচালা হতে পারে। দো-চালার থেকে চারচালা দেখতে ভাল। খরচ বেশী। ৩।৪ মিটার চওড়া একচালা বা দো-চালার কাঠামোটা হয় ৬.৫.১ নং নকশা মাফিক সহজ। চওড়া বাড়লে কাঠামোরও রকম-ফের হয়। ১২ মিটার অবধি ৬.৫.২ নং নকশা মাফিক তেকোণা কাঠামো করতে হয় যার নাম কিং পোস্ট-ট্রাস। চওড়া তার উপরে গেলে ৬.৫.৩ নং নকশা মোতাবেক কুইন পোস্ট-ট্রাস।
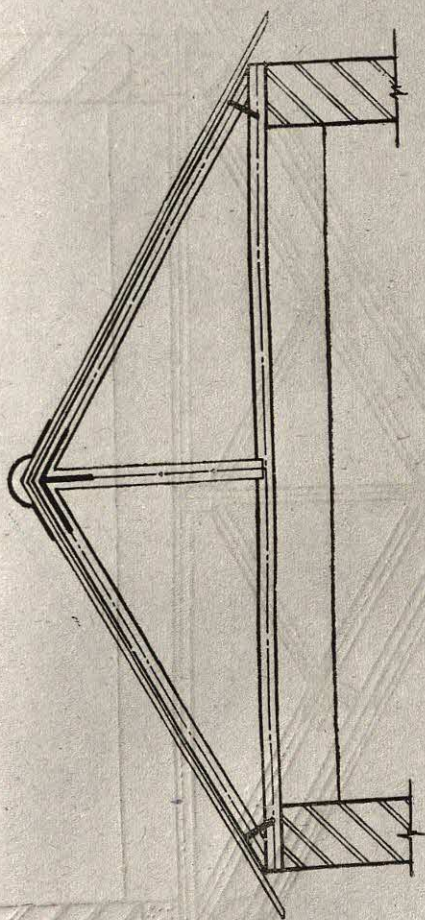
৩.৫.১—দোতালা চালু চালের কাঠামো
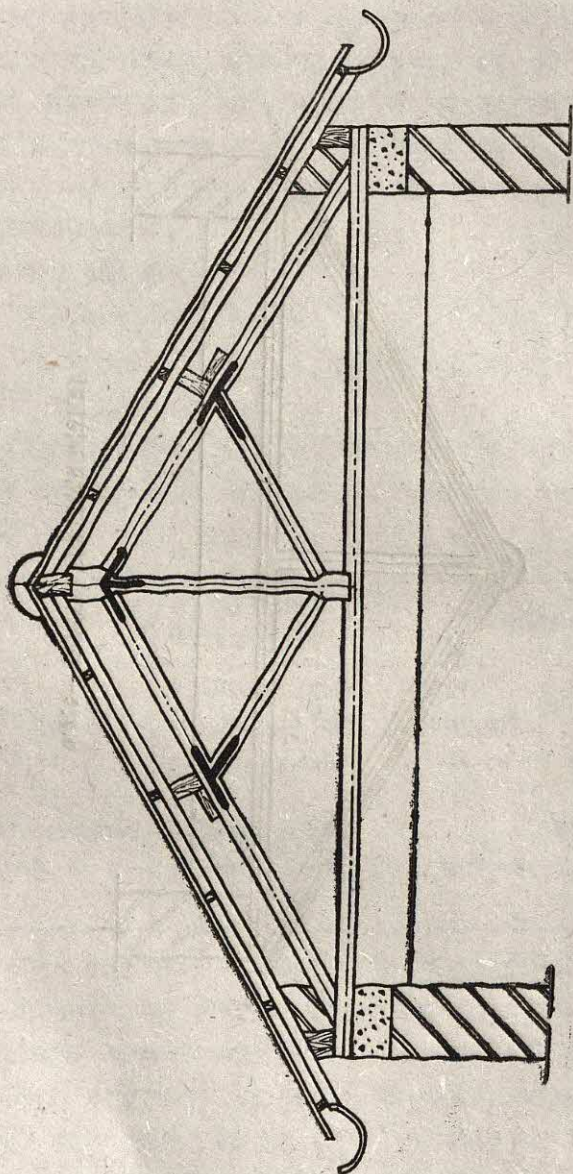
৬.৫.২—কিং পোস্ট ট্রাস

৬.৫.৩—কুইন পোস্ট ট্রাস
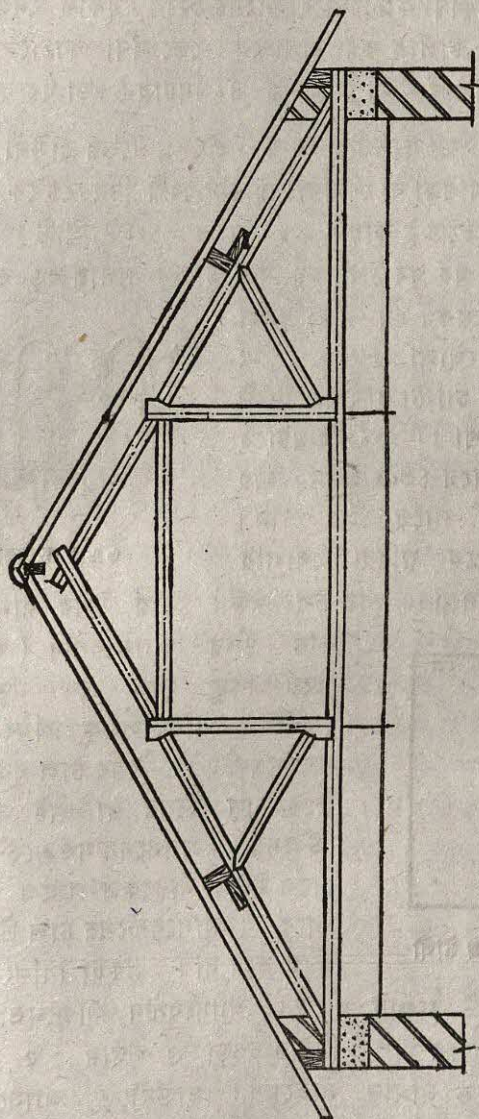
তবে যদি ঘরের ভিতর দিয়ে দরকার মত খুঁটি দেওয়ার বাধা না থাকে, তাহলে এই তেকোণা কাঠামো বা ট্রাসের কোন দরকার নেই। লোহার এঙ্গেল, পাইপ ও ঢালাই করা নানা রকম তেকোণা কাঠামো হয় যাতে করে ভিতরে কোন খুঁটি না দিয়েও ৩০।৪০ মিটার চওড়া ঘর করা যায়।

এবার আসা যাক ছাউনীর কথায়। পয়লা, খড়ের ছাউনী। ধানগাছের খড়ের চেয়ে উলুখাগড়া বা বেনাঘাসের ছাদ বেশী দিন টেঁকে। দশ বর্গ-মিটার ছাদ ছাইতে ২/১ কাহন (১ কাহন=১২৮০ আঁটি) খড় লাগে। খড়ের ছাউনীতে ঘর খুব ঠাণ্ডা হয় কিন্তু আগুন লাগার বড় ভয়। পোড়া মাটির টালী দু' রকম হয়—(ক) আধা গোল নুরিয়া খোলা (৬৬.১ নং নকশা) ও (খ) চ্যাপ্টা রানীগঞ্জ টালী (৬.৬.২ নং নকশা)। ১০ বর্গমিটারে নুরিয়া খোলা লাগে ১৩০০ মতন, আর রানীগঞ্জ টালী লাগে ১২৫ খানি। দামের দিক দিয়ে নুরিয়া খোলার ছাউনী সবচেয়ে সস্তা। তার উপর খড়। তার উপর রানীগঞ্জ টালী। তার উপর অ্যাসবেস্টস (অ্যাসবেস্টসের চেয়ে কিছু সস্তা এক নতুন উপকরণ বেরিয়েছে অ্যাসফাল্‌টিক্ রুফিং শীট) এবং সবশেষে টিন। টিনের চাল খুব গরম হয়। তবে ঢালু টিনের ছাউনীই সবচেয়ে বেশী টেঁকসই। অ্যাসবেস্টসও টেঁকসই, তবে চালে ইট বা নারকেল পড়লে ভেঙ্গে যেতে পারে। অ্যাসবেস্টসের চাল টিনের মত ঘর গরম করে না। একটা সিলিং দিয়ে নিতে পারলে মোটামুটি ঠাণ্ডাই থাকে। অ্যাসবেস্টস আগুনেও পোড়ে না। অ্যাসবেস্টস চাদরের মাপ ১ মিটার চওড়া ও লম্বায় ১.৫ মিটার থেকে ৩ মিটারের মত নানান সাইজের। ছাউনীতে অ্যাসবেস্টস চাদর লাগাতে হলে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা উচিত :
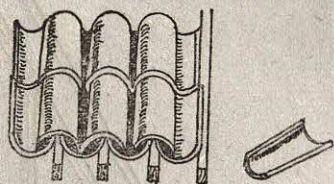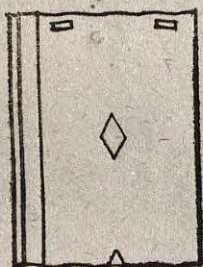
৬.৬.১ নুরিয়া খোলা

৬.৬.২ রানীগঞ্জ টালী

(ক) চাদরের ছাঁটা, কাটা, গর্ত করার কাজগুলি মাটিতেই বসে সারতে হবে। কাঠামোর উপর বসে নয়।

(খ) স্ক্রু আঁটার গর্তগুলি ছেনি হাতুড়ি চালিয়ে করতে গেলে চাদর ফেটে যেতে পারে। একাজগুলি সারতে হবে তুরপুন চালিয়ে।

(গ) অ্যাসবেস্টসের চাদরে যে ঢেউ থাকে গর্তগুলি হবে তার উঁচু ভাগে। নিচু ভাগে গর্ত হলে চাল দিয়ে জল পড়বে।

(ঘ) দুটি চাদরের মাঝে চাপান দিতে হবে—পাশাপাশি এক ঢেউ। উপরে-নিচে ১৫০ মিমি.।

[৭] পাকা ছাদ ঃ

পাকা ছাদ বেশ কয়েক রকমের হতে পারে। কাঠের বা লোহার কড়িবর্গার উপর পোড়া মাটির টালি ও চুন-সুরকির পেটানো ছাদ।

যেখানে ভাল মজবুত পাথর পাওয়া যায়, সেখানে পাথরের ছাদ। শুকনো দেশে ঘন করে সাজানো বাঁশের উপর মাটির পেটানো ছাদ এবং সবশেষে লোহার রড দিয়ে জালি তৈরী করে তার উপর সিমেণ্টের ঢালাই করে তৈরী ঢালাই ছাদ, যাকে বলা হয় রি-ইনফোর্জড কংক্রীটের ছাদ (R.C.C.)। এইসব ছাদের কোনটার মালমশলা পাওয়া মুশকিল; কোনটা টেকসই নয়, কোনটা জোলো আবহাওয়ায় অচল, কোনটার খরচ হয়তো খুবই বেশী। সবদিক বিচার করলে সিমেণ্টের ঢালাই ছাদই সবচেয়ে বেশী উপযোগী। তাই এর চলও সবচেয়ে বেশী। ঢালাই ছাদের ইঞ্জিনীয়ারিং দিকটা বেশ জটিল। কত বড় ঘরে কত ইঞ্চি পুরু ঢালাই হবে, তাতে লোহার রড থাকবে কত ইঞ্চি ফারাকে, কোন্ ভঙ্গিমায়—এসব সমাধান করতে বেশ ঘোরালো লম্বা চওড়া অংক কষতে হয়। অঙ্ক কষার ভারটা ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের উপর ছেড়ে দিয়ে আসুন আমরা ঢালাইয়ের অপর দিকগুলো নিয়ে মাথা ঘামাই। অঙ্ককে আমি শাশুড়ী ঠাকুরনের থেকেও বেশী ডরাই।

ঢালাইয়ে লোহা ছাড়া থাকে পাথরকুচি (১২ মিমি. থেকে ১৮ মিমি. মাপের), মোটা দানার বালি এবং সিমেণ্ট। সাধারণ বাড়ীর ছাদ ঢালাই করবার সময় এদের ভাগ হয় ৪ (পাথরকুচি): ২ (বালি): ১ (সিমেণ্ট)। এর সঙ্গে মেলাতে হবে পরিমাণ মাফিক জল। সস্তায় কিস্তিমাত করতে পাথরকুচির বদলে কালো ঝামার টুকরো কাজে লাগানো যায়, তবে তাতে ছাদে জল বসার ভয় থাকে। তিন চার তলা বাড়ি হলে মাঝের ছাদগুলি অনায়াসে ঝামা দিয়ে ঢালা যায়। আর এক ধরনের সস্তা পাকা ছাদ করা যায়—ঘর খুব বড় না হলে। একে বলে

আর. বি. সি.। ৬.৭ নং নকশা অনুযায়ী ফাঁক ফাঁক করে ইট সাজিয়ে, তার মাঝে লোহার জাল পেতে, ইটের ফাঁকগুলো ঢালাইয়ের মশলা দিয়ে
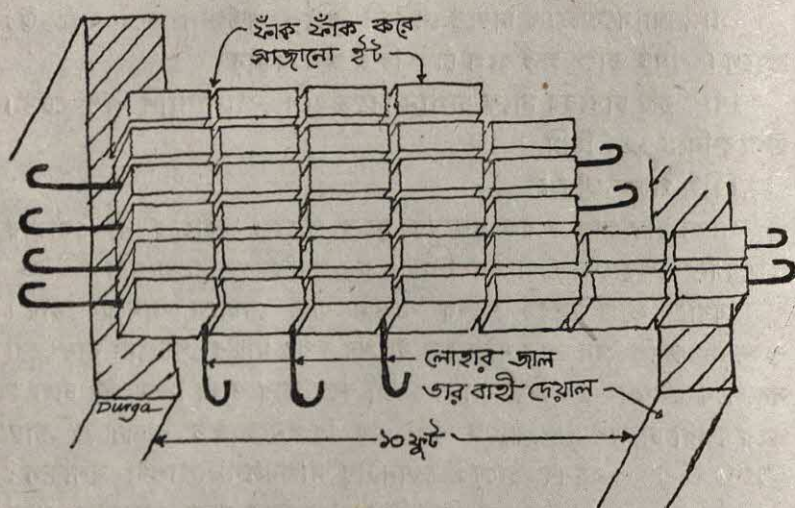
৬.৭—আর. বি. সি.

ভরে দিলে চমৎকার ছাদ হয়ে যাবে যা দিয়ে ১০ ফুট অবধি চওড়া ঘরের পাকা চাল হিসেবে অনায়াসে কাজ চালানো যায়।

[৮] সিঁড়ি :

একটা মজা দেখছি পেল্লায় বাড়ী করছেন এমন বহুত লোক যতকিছু কঞ্জুসি করেন সিঁড়ির বেলা। তার ফলে সিঁড়িটা হয় অন্ধকার, ঘুপচি। ইয়া খাড়া খাড়া ধাপ। মইয়ের মত খাড়া সেই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে দম বেরিয়ে যায়। কঞ্জুস লোকটি একদিন হড়বড় করে অফিস যেতে গিয়ে পা পিছলে আলুর দম! তারপর সেই দমকে চালু করতে গিয়ে বাড়ির লোকজন সব বেদম। হাসপাতাল আর ডাক্তারের ফি বাবদ যা বেরিয়ে যায় তাতে অমন তিনখানা সিঁড়ি গড়া চলত।

দোহাই, সিঁড়িটাকে ছোট বা সরু করে জায়গা বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না। এক মিটারের কম চওড়া সিঁড়িতে আলমারী বা পালঙ্ক ওঠানো শক্ত। ধাপের খাড়াই ১৭৫ মিমি (৭″)-এর বেশী হলে চড়তে নামতে বেশ কষ্ট হবে। ধাপের চওড়াটা ২৫০ মিমি. (১০″)-এর কম হলে আপনারও পেল্লায় বাড়ীওয়ালা কঞ্জুস লোকটির মত আক্কেল-সেলামী দিতে

হতে পারে। সিঁড়িতে ভাল রকম আলোর দরকার—যাতে ধাপগুলো ভালভাবে দেখা যায়। সিঁড়ির জানালা ছোট করে বা সিঁড়িতে কম পাওয়ারের বাল্‌ব লাগিয়ে খরচ বাঁচাতে যাওয়া বোকামি। ৩.২ নং নকশায় যে সিঁড়ি দেখানো হয়েছে তার ধাপ খাড়াইয়ে ১৬৭ মিমি., চওড়ায় ২৫৭ মিমি.। এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা খুব সহজ। এ বিষয়ে দুটো ফরমুলা আছে। কাজে লাগাতে পারেন :

(ক) ২ × খাড়াই + চওড়া = ৫৭০ − ৫৮০ অথবা (খ) খাড়াই × চওড়া = ৪০,০০০ − ৪৫,০০০—এর মানে দাঁড়াল এই খাড়াই যদি ১৫০ মিমি. হয় তাহলে ধাপের চওড়া হওয়া দরকার ২৮০ মিমি.। সিঁড়িতে চাতাল বা ল্যাণ্ডিং দেওয়া হয়, উঠতে উঠতে ২।৩ সেকেণ্ড জিরোবার জন্য। পর পর ১২টির বেশী ধাপ দিলে সিঁড়ি চড়া কষ্টকর হয়। ১২ বা ১৩টি ধাপের পর একটি চাতাল দিলে দম নিতে সুবিধে হয়। ধাপ যাই হোক না কেন এক নাগাড়ে ২.৫ মিটারের বেশী কোন ভাবেই ওঠা উচিত নয়। মাঝে একটা বা দুটো চাতাল দিতেই হবে। চাতালের মাপ ১ মিটার × ২ মিটার না হলে আসবাব ওঠাতে মুস্কিল হয়।

[৯] **দরজা ও জানালা : চৌকাঠ ও পাল্লা :**

রোদ বা বর্ষার হাত থেকে আড়াল করে শুধু হাওয়ায় কাঠকে শুকিয়ে নেওয়ার নাম সিজনিং করা। সিজনিং করা কাঠ পরে বেঁকে যায় না, ফেটে যায় না বা ঘুন ধরে না। বাড়ী করার ২ বছর আগে যদি কাঠ কিনে ফেলে রাখা যায় তাহলে আপনিই সিজনিং হয়ে যাবে। কাঠ শুকোনোর কারখানা আছে—সেখানে ভাঁটিতে গরম হাওয়ায় এই ২ বছরের কাজ ১৫ দিনে সারা যায়। আগে থেকে কাঠ কেনা না থাকলে এই কারখানাতে কাঠ শুকিয়ে নিতে পারেন। চৌকাঠের মাপ সাধারণতঃ ৫০ মিমি. × ৭৫ মিমি. থেকে ১০০ মিমি. × ১৫০ মিমি. হয়। কাঠ দামী জিনিস। মাপ যত বাড়াবেন খরচ ততই বাড়বে। আবার চৌকাঠের মাপ যত কমাবেন, দরজা-জানালা ততই অপল্‌কা হয়ে পড়বে। কাজেই মাঝামাঝি থাকাই ভাল। জানালার চৌকাঠ ৫০ মিমি. × ১০০ মিমি. ও দরজার চৌকাঠ ৫০ মিমি. × ১৫০ মিমি. করা যায়। সস্তায় চৌকাঠ করতে হলে শাল (শিলিগুড়ির শাল সবচেয়ে ভাল। আসাম ও ওড়িশাতে শাল পাওয়া যায়। তত ভাল নয়) কাঠ বেছে নিন। হলক্‌ বা সেগুন কাঠের চৌকাঠ পালিশ করতে পারবেন। দাম পড়বে বেশী। চৌকাঠের

তলাটা কাঠ দিয়ে না করে সিমেন্টের ঢালাই করে করলে মজবুত ও টেঁকসই হয়। চৌকাঠ লাগাবার আগে—চৌকাঠ ও লোহার আঁকশি-গুলোতে বেশ ভালভাবে আল্‌কাতরা মাখিয়ে নিতে ভুলবেন না। আল্‌কাতরা মাখানো থাকলে উইপোকা ধারে-কাছেও আসবে না। ভেতরে ঘুন থাকলে তাও মরে যাবে।

● চিচিং ফাঁক :

চৌকাঠের সঙ্গে কব্জা দিয়ে লাগানো থাকে পাল্লা। খুশীমত খুলতে বা বন্ধ করতে পারা যায়। পাল্লার মূল কাজ ইচ্ছামত ঘরে রোদ, আলো, বাতাস ও মানুষের আনাগোনা। সেই সঙ্গে ঘর থেকে বাইরের শোভা দেখা (যেমন বাগানের দিকের জানালা) বা ঘরের আবরু রাখা (যেমন বাথরুমের জানালা)—এই রকম নানান দরকার মেটাতে কখনো দরকার হয় কাঁচের প্যানেল, কখনো কাঠের প্যানেল ; কখনো দুয়ের মিলিত পাল্লা, আবার কখনো খড়খড়ি (খোলা বন্ধ করা যায় কিম্বা অনড়)। যদি আলো আর আবরু চান তা হলে লাগাতে হবে ঘষা কাঁচ। বাতাস আসবে না অথচ বাইরের শোভা দেখতে হলে চাই স্বচ্ছ কাঁচ। বাতাস আর আবরু দুই-ই চাইলে খড়খড়ি। আলো-বাতাস দুই-ই থামাতে হলে কাঠের প্যানেল। আপনার দরকার মত ছুতোরদের বুঝিয়ে বললে তারা সেইমত পাল্লা বানিয়ে দেবে।

জানালায় গ্রীল বা গরাদ থাকে। দরজায় তা থাকতে পারে না। কাজেই দরজার পাল্লা আরো মোটা ও মজবুত হওয়া দরকার। তার ছিটকিনি ও তালা দেওয়ার কলকব্জাও জোরদার হওয়া দরকার। সাধারণত জানালার পাল্লা ৩০ মিমি. (১$\frac{১}{৪}$″) ও দরজার পাল্লা ৩৭ মিমি. (১$\frac{১}{২}$″) মোটা হয়। দরজার প্যানেলে কাঠের বদলে ১২ মিমি. ($\frac{১}{২}$″) বা ১৮ মিমি. ($\frac{৩}{৪}$″) মোটা প্লাইউড লাগালে বেশ সস্তা ও মজবুত হয়। পাল্লায় শাল কাঠ চলে না। সস্তার ভিতর গামার, মুরগা এবং দামীর ভিতর সেগুন, শিশু বা হলক কাঠ চলতে পারে।

কব্জা, ছিটকিনি, কড়া—দরজা-জানালার নানান ফিটিংস্ হতে পারে—পিতল, এলুমিনিয়াম বা লোহার। পিতলের ফিটিংস্ খুব দামী, লোহায় চট করে মরচে ধরে অকেজো হয়ে যায়। এলুমিনিয়ামের ফিটিংস্ই ভাল। তবে কেনবার আগে দেখে নেবেন ফিটিংস্গুলি যেন

'এনোডাইজ্‌ড্‌' করা থাকে। এনোডাইজ্‌ড্‌ না করা এলুমিনিয়াম খুব চট করে ক্ষয়ে যায়। স্ক্রু কিন্তু পেতলেরই নেবেন। কাঁচের প্যানেল আঁটতে বা কাঠের ফাটল ভরতে পুটিং-এর দরকার হয়। বাজার থেকে না কিনে ঘরে তৈরী করে নিন। ভাল জিনিস হবে। সস্তাও পড়বে। ১ কেজি হোয়াইটিং পাউডার ও ৭০ গ্রাম শুকনো সাদা শিষে (dry white lead) ৩৫০ গ্রাম তিসির তেল দিয়ে খুব ভাল করে মেখে ১ রাত ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে রেখে পরের দিন কাজে লাগান।

[১০] পলেস্তারা :

পলেস্তারা করা হয় তিন কারণে। ১. দেয়ালের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করতে, ২. দেয়াল সুন্দর ও নিরেট দেখাতে, ৩. ইটের খাঁজে খাঁজে যাতে ধুলোবালি-নোংরা জমতে না পারে। পলেস্তারায় ছয়ভাগ মিহি বালি ও একভাগ সিমেন্ট মিশিয়ে মশলা তৈরী করা হয়। পলেস্তারা করার আগে দেয়ালটা নারকোল ছোবড়া বা নারকোল দড়ির জাল দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে দিতে হবে ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। জল ঝরে গেলে যখন একটু ভিজে ভিজে ভাব থাকবে তখন পলেস্তারা করতে হবে। কাজের মাঝে মাঝে মগে করে জল দিয়ে দেয়াল ভিজিয়ে নিতে হবে। শুকনো দেয়ালে পলেস্তারা ধরবে না। পলেস্তারা শক্ত হবার আগেই দেয়াল তার জল শুষে নেবে। পলেস্তারাও ঝুরো হয়ে খসে পড়বে। পলেস্তারার মশলা খুব কম করে মাখতে হয় যাতে মাখা মশলা আধঘণ্টার ভেতর দেয়ালে লাগানো হয়ে যায়।

পলেস্তারা আধ ইঞ্চি বা ১২ মিমি.-এর বেশী মোটা করা অনুচিত। নেহাৎই যদি কোথাও মোটা করতেই হয়, কাজটা একবারে না করে দু-তিন খেপে পর পর প্রলেপ লাগিয়ে মোটা করতে হয়। উপরে যে ভাগের কথা বলা হয়েছে তা দেয়ালের জন্য।

বিশেষ বিশেষ দরকারে ভাগ আরও কড়া করতে হয়। যেমন :

(ক) নর্দমা—চার ভাগ বালি : ১ ভাগ সিমেন্ট

(খ) ছাদ—চার ভাগ বালি : ১ ভাগ সিমেন্ট

(গ) সেপ্টিক ট্যাংক—তিন ভাগ বালি : ১ ভাগ সিমেন্ট।

পলেস্তারা হয়ে গেলে পরের দিন থেকে কম করে পাঁচদিন অনবরত জল দিয়ে ভেজালে পলেস্তারা ডবল মজবুত হয়ে যাবে; ফাটবার কোন ভয় থাকবে না।

[১১] **পয়েন্টিং :**

কমদামী বাড়ীর দেয়াল বা সীমানার পাঁচিলে খরচ কমাতে পলেস্তারার বদলে পয়েন্টিং করা হয়। ইটের জোড়াগুলি ১২ মিমি. গভীর করে কেটে নেওয়া হয়। তারপর সিমেন্ট-বালির মশলা নিয়ে সমান করে ভরে দেওয়া হয়। একে বলে ফ্লাস পয়েন্টিং। এর উপর অনেক সময় সুন্দর দেখাতে রুল দিয়ে দাগ কেটে ইট এঁকে দেওয়া হয়। তাকে বলে রুল পয়েন্টিং। পয়েন্টিংয়ের মশলা কড়া ভাগের, মানে ৩ : ১ ভাগের হওয়া উচিত। পয়েন্টিং করার আগে ও পরে যথারীতি দেয়াল ভিজিয়ে নিতে হবে। ঘরের দেয়ালের দুপিঠেই পয়েন্টিং করা ঠিক নয়।

[১২] **চুনকাম :**

পলেস্তারার পর চুনকাম! দুভাগ পাথুরে চুন ও একভাগ ঝিনুক পোড়ানো কলি চুন জল দিয়ে থকথকে করে মেশাতে হবে। তারপর চটের ভেতর দিয়ে ছেঁকে নিয়ে ৩৭ কেজি চুনে ২৫০ গ্রাম হিসাবে গঁদ ও দরকার মত নীল (রবিন ব্লু) মেশাতে হবে। দেয়ালে চুন মাখাবার আগে দেয়াল ঝাঁটা ও কাপড় দিয়ে ঝেড়েমুছে, জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর পাটের তুলি দিয়ে পয়লা উপর থেকে নীচে ও পরে একপাশ থেকে আর একপাশে চুন মাখাতে হবে। শুকিয়ে গেলে দুসরা দফা। নতুন দেয়াল ভাল করে সাদা করতে হলে তিসরা পোঁচ চুন মাখানোর দরকার হয়। চুনের সঙ্গে নীলের বদলে গুড়ো রং মিশিয়ে দিয়ে হল্‌দে, বাফ, নীল, সবুজ বা গোলাপী—দেয়ালে নানা রং করা যায়। চুনকামে পাটের তুলি দিয়ে রং মাখানো হয়। লাইম পানিং বা পংকের কাজে উশা দিয়ে তিন মিলিমিটার মোটা করে চুন মাখানো হয়। পরে করনি দিয়ে মেজে সেটাকে মোলায়েম ও চক্‌চকে করে তোলা হয়। চুন মাখাবার আগে চটের বদলে মসলিন জাতীয় কাপড়ে ছেঁকে নিতে হয়। চুনকামে খরচ কম— পংকের কাজে বেশী। তবে পংকের কাজে শোভা অনেক বেশী।

[১৩] **মেঝে :**

তদারকির অভাবে ও মিস্ত্রি-মজুরের ফাঁকিবাজিতে অধিকাংশ বাড়ীর মেঝে, বিশেষ করে একতলার মেঝে ফেটে যায়, বসে যায়। গাফিলতিটা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে না। ২ ৪ বছর বাদে যখন ধরা পড়ে, মিস্ত্রির দল

তখন পগার-পার। কাজেই মেঝে তৈরীর তদারকি যাতে আপনি ভাল-ভাবে করতে পারেন তাই বিষয়টা একটু খুঁটিয়েই লিখছি।

গোবর মাটি, পোড়ামাটির টালি, ইট, কাঠ, সিমেণ্ট, মোজাইক, কোটা পাথর, সেরামিক টালী ও মারবেল—হরেক রকম মেঝে হয়। দাম ৫ টাকা বর্গ মিটার থেকে ৫০০ টাকা বর্গ মিটার অবধি হতে পারে। নিজের সাধ্যমত বাছাই করে নিতে হবে। শুকনো, তলা থেকে স্যাঁতা ওঠে না, মোলায়েম—যাতে ধুলোবালি সহজে পরিষ্কার করা যায় অথচ পা পিছলে যায় না, মজবুত, টেক্‌সই, সহজে মেরামত করা যায়, আগুন লাগতে চায় না, হাঁটা চলায় আওয়াজ কম ওঠে, এমন মেঝেই বাছাই করা উচিত। এই সবদিক যাচাই করে কমদামীর ভিতর সিমেণ্টের মেঝে ও মাঝারী দামের ভিতর মোজাইক টালীর চলনই বেশী। কাজেই এখানে আমাদের আলোচনাতে এই দুই রকম মেঝের কথাই বলব। মেঝে তৈরীর আগে বিশেষ করে একতলাতে আরো কিছু কাজ আছে যার তদারকিতে ফাঁকি দিলে পস্তাতে হবে।

এগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) ভিতে মাটি ঠাসা

(খ) ইটের সোলিং বিছানো ও বালি ছিটানো

(গ) মেঝের তলার ঢালাই করা।

ভিতের গাঁথনি শেষ হবার পর ভিতরটা মাটি দিয়ে ভরাতে হবে। মাটির সঙ্গে ইটের টুকরো, গাছের শেকড়, রাবিশ থাকলে বাছাই করে ফেলে দিতে হবে। পুরো ভিতটা একসঙ্গে ভরবেন না। ২০০ মিমি. মাটি ভরে জল দিয়ে কাদা করে দিন। জল শুকিয়ে এলে দুরমুশ পিটিয়ে ২০০ মিমি. মাটিকে বসিয়ে ১৫০ মিমি. করুন। তারপর আবার ২০০ মিমি. মাটি ভরে কাদা করা ও কাদা শুকলে দুরমুশ পিটিয়ে তাকে ১৫০ মিমি. করা। এই ভাবে একটু একটু করে মাটি ভরতি করুন। তাড়াহুড়ো করবেন না। মিস্ত্রি হাজার চাপাচাপি করলেও না। ভরাট করা মাটির উপর এক রদ্দা ইট ঠাস বুননিতে বিছিয়ে দিতে হবে। ইটের মার্কা বা ব্যাংটা যেন উপর দিকে থাকে। ইটের উপর ১২ মিমি. ($\frac{১}{২}$ ইঞ্চি) পুরু করে চিকন বালি ছড়িয়ে জল ঢেলে দিলে সেই বালি ইটের ফাঁকে ঢুকে সোলিংটাকে আরো জমাট করে তুলবে। এরপর ছয় ভাগ ঝামা, তিন ভাগ বালি ও একভাগ সিমেণ্ট কিম্বা ছয় ভাগ লাল

ইটের খোয়া, তিন ভাগ সুরকি ও একভাগ চুন দিয়ে ঢালাই করতে হবে। ১২০ মিমি. পুরু করে ও দুরমুশ পিটিয়ে তা ১০০ মিমি. পুরু করে দিতে হবে। সিমেন্টের ঢালাইয়ে মামুলী রকম দুরমুশ করলেই চলবে। তবে দুরকম ঢালাই-ই যাতে ৮।১০ দিন জলে ভেজানো থাকে, সেদিকে নজর রাখবেন।

● **পা—কি স্থানে রাখি ?**

এবার আসা যাক মেঝে তৈরীর কথায়। এক নম্বর—সিমেন্টের মেঝে। সিমেন্ট (১ ভাগ) ও বালির (২ ভাগ) সঙ্গে ছোট (৬ মিমি. সাইজ) পাথরকুচি চারভাগ মিশিয়ে ২৫ মিমি. বা ৩৬ মিমি. পুরু করে ঢালাই করতে হবে ২ মি. × ২ মি. মাপের টালি করে। ঘরটাকে দাবার বোর্ডের মত অনেকগুলো টালিতে ভাগ করে নিতে হবে। পাশাপাশি টালির ঢালাই একদিনে হবে না। দাবার কালো ঘরগুলো একদিনে ও সাদা ঘরগুলো পরের দিন—এই হিসাবে ঢালতে হবে। টালির মাপ ইচ্ছা মত আরো ছোট করা যায়। কদাচ বড় করবেন না। সিমেন্টের মেঝে রঙ্গিন করা যায়। এই কাজে যে অক্সাইড রং বাজারে পাওয়া যায় তা-ই কিনবেন। আবির দিয়ে কাজ সারতে গিয়ে এক জ্যাঠামশাই কি রকম ঘরছাড়া হয়েছেন তা তো পড়েছেন এক নম্বর অধ্যায়ে। রং খু-উ-ব ভাল করে মেশাতে হবে সিমেন্টের সাথে :

মেঝের রং	রংয়ের নাম	সিমেন্টের ভাগ	রংয়ের ভাগ
লাল	ফেরাস অক্সাইড	৮৫%	১৫%
হলুদ	ইয়েলো অকার	৮৭%	১৩%
নীল	আলট্রা মেরাইন	৮৭%	১৩%
সবুজ	ক্রোম অক্সাইড	৮৯%	১১%
কাল	ব্ল্যাক জাপান	৯০%	১০%

এর ভিতর লাল মেঝেটাই সবচেয়ে বেশী খোলে। ঘর ঠাণ্ডা থাকে। একটু সাদা সিমেন্ট মিশিয়ে নিলে আরও শোভা বাড়ে। সবুজ রংটা রোদ পড়লে ছেবড়া ছেবড়া হয়ে যায়। টেঁকে না। পাথরকুচির (স্টোন চিপ্‌স) বদলে মারবেল পাথরের কুচি দিয়ে ঢালাই করলে তাকে বলে মোজাইক। মারবেল থাকার দরুন পালিশ করলে মোজাইক মেঝে অনেক বেশী চক্‌চকে ও সুন্দর দেখতে হয়। পালিশ করতে হয়

কারবোরেণ্ডাম পাথর দিয়ে—তিন দফা। পয়লা মোটা দানার পাথর (৬০ নং), পরে মাঝারী দানার পাথর (১০০নং) ও শেষে সরু দানার পাথর (১২০নং)। এর পর জলে অক্সালিক অ্যাসিড গুলে মেঝেতে ছড়িয়ে দিতে হবে ও পরের দিন ধুয়ে ফেলতে হবে। আরো চকচকে করতে হলে মোম পালিশ লাগাতে হয় তবে মোম পালিশটা লাগাবেন না। ওতে গোড়ায় চটক বাড়ে বটে কিন্তু ২/৪ মাসে মোমে ধুলো বসে মেঝের পালিশ চট করে খারাপ হয়ে যায়। আর একটা কথা। কাছে-পিঠে যদি মোজাইক টালির কারখানা থাকে, ঢালাই মোজাইক না করে টালি বসিয়ে নিন। টালি হাইড্রলিক প্রেসে (৭০০ কেজি চাপে) তৈরী হয় বলে অনেক টেঁকসই। মেঝে ফাটার ভয় থাকে না। তবে আজকাল অনেকে হাইড্রলিক প্রেসের বদলে সস্তার বল প্রেসে (৪০০ কেজি চাপে) টালি তৈরি করেন। ওগুলো অত মজবুত হয় না।

[১৪] **জল-ছাদ :**

ইদানীং পাড়ায় পাড়ায় দেখা যায়—নতুন বাড়ী, বয়েস পাঁচ সাত বছরও হয়নি, ছাদ দিয়ে জল পড়তে শুরু করল। কারণটা কী? জল-ছাদ করার কতকগুলো কঠোর নিয়ম আছে। ভাল জল-ছাদ, যা ৩০।৪০ বছর বিনা ঝামেলায় টিকবে, তা তৈরী করতে হলে এইসব নিয়ম না মেনে উপায় নেই। খরচ কমানো ও সময় বাঁচানোর নেশায় লোকে এইসব নিয়ম এড়িয়ে যেতে চায়। ফলে জল-ছাদ টেঁকসই হয় না। খরচের পুরো ষোল আনাই বরবাদ যায়। সাবেকী জল-ছাদ করতে ১০ দিন সময় লাগে। এই দশদিনের কবে কি করতে হবে তার একটা রোজনামচা এখানে দেওয়া হল। এটা মেনে চললে আগামী বিশ তিরিশ বছর বাদলার দিনে মুখ গোমড়া করে ঘরের এখানে ওখানে হাঁড়ি-কড়াই পাততে হবে না।

● **জল-ছাদের রোজনামচা :**

১ম দিনে—১নং লাল ইটের টুকরো ভেঙে ১২ মিমি. থেকে ২৫ মিমি. মাপের খোয়া তৈরী করুন। যাতে পুরো ছাদটা ১৭৫ মিমি. পুরু করে ঢেকে দেওয়া যায়, ততটা খোয়া তৈরী করা চাই। খোয়ার মাঝে একটা টুকরোও ঝামা বা পিক্‌ড মেশানো চলবে না। সমান ভাগে চুন ও ১ নম্বর লাল দানার সুরকী খুব ভাল করে মেশাতে

হবে যাতে সাদা ও লাল রং মিশে গোলাপী রং ধারণ করে। ১৭৫ মিমি. পুরু করে খোয়ার উপরে ১০০ মিমি. পুরু করে চুন ও সুরকী ঢেলে পয়লা শুকনো ভাবে ও পরে জল দিয়ে মাখতে হবে।

২য় ও ৩য় দিনে—মশলাটাকে একটু একটু জল দিয়ে ওলট্-পালট করে মাখতে হবে। সকাল বিকেল। দুদিনে বার দশেক ওলট্ পালট্ করতে হবে।

৪র্থ ও ৫ম দিনে—চিটে গুড় ও মেথির জল মেশাতে হবে। হিসেবটা ৩মি. × ৩মি. × ০'৩মি. মশলায় ১২ কেজি চিটে গুড় ও ১ কেজি মেথির জল। মেশানো মশলা ঢাল রেখে ছাদের উপর বিছাতে হবে। মাঝখানটা উঁচু ও ধারে নীচু এইভাবে ঢাল রাখতে হবে। তিন মিটারে ২৫।৩০ মিমি. ঢাল থাকা দরকার।

এবার রেজা বা মেয়ে-মজুররা কাঠের থাপি দিয়ে ছাদ পেটাতে শুরু করবে। ১০ বর্গ মিটার ছাদে তিন জন রেজা লাগবে। পেটানোর সময় একটু একটু করে গুড়, চুনের ও মেথির জল ছিটিয়ে দিতে হবে।

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম দিনে—সকাল থেকে সাঁঝবেলা অবধি পেটানো চলবেই, পেটানোর জোর ও তাল ধীরে ধীরে বাড়বে। মাঝে মাঝে ভেসে ওঠা চুনের গোলাজল ছাদের উপর মেজে নিতে হবে। কোথাও বেশী বসে গেলে ঢালটা যাতে ঠিক থাকে সেই ভাবে বাড়তি মশলা দিয়ে ঢাল মিলিয়ে দিতে হবে।

৯ম ও ১০ম দিনে—উপরে উঠে-আসা জল পিটে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর রেড়ি বা সর্ষের তেল দিয়ে ছাদটা খুব ভাল করে মেজে নিতে হবে। এরপর সারা ছাদে ভিজে খড় বিছিয়ে রাখতে হবে একমাস। এই খড় যাতে ঝড়ে উড়ে না যায় (ইট চাপা দিন) বা রোদে শুকিয়ে না যায় (মাঝে মাঝে পিচকিরি দিয়ে জল ছিটিয়ে দিন) সেদিকে নজর রাখতে হবে।

জল-ছাদের অনেক সস্তা বদলা আজকাল বাজারে বেরিয়েছে। তার ভেতর শালিমারের আলকাতরা-চট অনেক জায়গাতেই কাজে লাগানো হয়। এ ছাড়া অনেক রকম রাসায়নিকও পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয় এর কোনটাই সাবেকী জল-ছাদের মত টেঁকসই নয়।

[১৫] তেল রংয়ের কাজ :

তেল রঙের কাজ দু'রকম : কাঠের গায়ে রং করা (দরজা, জানালা, কড়ি-বরগা, রেলিংয়ের হাতল) ও লোহার গায়ে রং করা (জলনিকাশী পাইপ, টিনের চাল, রেলিং ও জানালার গরাদ)। রংও দুভাবে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। থক্‌থকে ঘন রং ওজন দরে কিনে দরকার মাফিক তারপিন তেল ও তিসির তেল মিশিয়ে নিতে হয়। আর পাওয়া যায় তারপিন-তিসি মেশানো টিনে ভরতি পাতলা তৈরী রং (Ready-mixed paint)। তৈরী রং কিনতে পাওয়া যায় লিটার হিসেবে। দাম পড়ে বেশী। তবে নিজে হাতে রং করতে হলে তৈরী রংই কিনুন। ঝামেলা কমবে।

কাঠ বা লোহা যাই রং করা হোক না কেন, তাকে ঝেড়ে মুছে ধুলো, ময়লা, কাদা, মাটি, মরচে, কাঠের গুঁড়ো সব পরিষ্কার করে নিতে হবে। কাপড় দিয়ে ঠিকমত না হলে শিরিষ কাগজ ঘষে কাজটি করে নিতে হবে। ভিজে থাকলে একদম শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর এক কোট করে রং লাগাতে হবে। বুরুশ পয়লা চলবে উপর থেকে নীচে, পরে পাশাপাশি। এক কোট না শুকোলে দুস্‌রা কোট রং লাগানো চলবে না। মোট তিন কোট লাগালে কাজ ভাল উৎরোয়। রং যত পাতলা করে লাগানো যায় ততই সস্তা পড়বে, কাজ ভালো হবে, চেকনাই খুলবে। খরচ কমাতে হলে, পয়লা কোটে কমদামী প্রাইমার রং লাগাবেন। তার উপরে দু কোট দামী রং। দেয়ালে বা জানালার কাঁচে রং লেগে শুকোবার আগেই তারপিন তেলে ভেজানো কাপড় দিয়ে মুছে রংটা তুলে ফেলুন। তা না হলে দাগটা চিরকেলে হয়ে যাবে।

● বড় কাজের কাজী :

সস্তা কাজে অনেক সময় রং-এর বদলে আলকাতরা লাগানো হয়। ১০ বর্গ মিটার জায়গায় এক কোট রং করতে তিন কেজি আলকাতরা দরকার হবে। আলকাতরা শুধু জল-বাতাস-রোদের হাত থেকেই লোহা আর কাঠকে বাঁচায় না, উই পোকা বা ঘুনের হাত থেকেও বাঁচায়। রং-এর শোভাটুকু বাদ দিলে, আলকাতরা বড় কাজের কাজী। খরচের দিক দিয়ে দশ ভাগের এক ভাগ। ভেবেছিলেন পাক করা শেষ করে গঙ্গা চান করে মুক্ত হবেন! অতএব আসুন, সেই দিকেই নজর দেওয়া যাক।......

৭

বাড়ি, না রোগের ডিপো ?

গঙ্গা চানই বলুন, আর ঘর ধোয়াই বলুন, জলের সঙ্গে নীরোগ পরিবেশের একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। রোগের জীবাণু তৈরী হয়, বংশ বাড়ায় নোংরা আবর্জনা ও পায়খানার দুষিত পরিবেশ। এই দুষিত পরিবেশকে নির্মল করে ধুয়ে ফেলতে দরকার জলের। জলের সঙ্গে সঙ্গে যে শুধু নোংরাই ধুয়ে যায় তাই নয়, সেই সঙ্গে রোগজীবাণু ধুয়ে গিয়ে বাড়ীতে রোগভোগের বালাইও বিদেয় হয়। নিচের চার্টটা দেখলেই বুঝবেন বাড়ীতে জলের জোগাড়, দরকার, ব্যবহার ও পরিশোধন কি ভাবে হয় ও তাদের মাঝে যোগাযোগটা কোথায়।
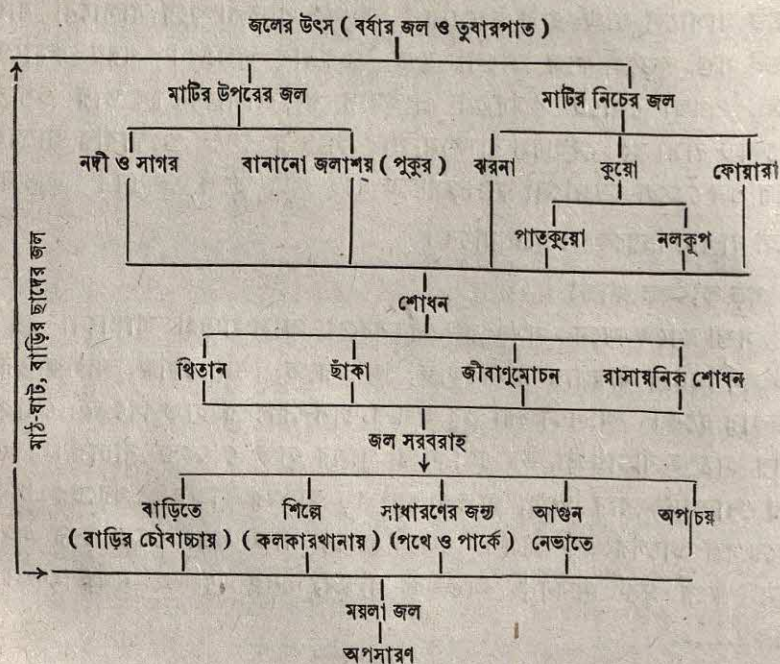
● জল শোধনের কেরামতি

দেখা যাচ্ছে নানান উৎস (নদী, পুকুর, ঝরনা, পাতকুয়ো, নলকূপ) থেকে পাওয়া জল দরকার মত থিতিয়ে, ছেঁকে, ফুটিয়ে জীবাণুমোচন করে বা ওষুধ মিশিয়ে শোধন করে নিতে হয় ব্যবহারের আগে। জলের তাপ, আবিলতা, স্বাদ, গন্ধ, নানারকম রাসায়নিকের (যেমন জৈব ও অজৈব লবণ বা ক্ষার) পরিমাণ মেপে কি ভাবে তাকে পানীয় জলে পরিণত করা যায় তা ঠিক করে নিতে হবে। পানীয় জলের সঠিক মান নীচে দেয়া হল :

(১) তাপ—২৫° সেন্টিগ্রেডের থেকে ৩০° সেন্টিগ্রেডের মাঝে।
(২) আবিলতা—১০ পি. পি. এম. (Parts Per Million)।
(৩) ভাসমান কঠিন পদার্থ—৫০০ পি. পি. এম. অবধি।
(৪) খরতা—৫° থেকে ১৫° অবধি।
(৫) পি. এইচ. মান—৬ থেকে ৮.৫ এর মাঝে।
(৬) বি-কলাই-ইণ্ডেক্স—৩ বা তারও কম।

আপনার পুকুর, কুয়ো বা নলকূপের জল সরকারী টেস্ট হাউসে পরীক্ষা করিয়ে নিন—তা হলেই বুঝতে পারবেন জল খাবার আগে ফুটিয়ে বা ছেঁকে নিতে হবে কিনা অথবা জলে ফট্‌কিরি বা চুন মেশাতে হবে কিনা। যে সব ঘরোয়া পদ্ধতিতে জলকে বাড়ীতেই শোধন করা যায়, তা হল :

(ক) মাটির জালায় থিতানো—এতে জলের তাপ ও আবিলতা কমবে।
(খ) মিহি কাপড়ে ছেঁকে নেওয়া—ভাসমান কঠিন পদার্থ কমবে।
(গ) ফট্‌কিরি বা চুন মেশান—জৈব ও অজৈব লবণের ভাগ কমবে। জলের খরতাও কমবে। টক বা কষা জল সুপেয় হবে।
(ঘ) জল ফোটানো—জীবাণু মোচন হবে, খরতা কমবে। জলে লোহা মেশানো থাকলে তাও কমে যাবে। খরা জল খেতে কষা লাগে, সাবান ক্ষয়ে যায় কিন্তু ফেনা হয় না। জলের পাইপ বুঁজে আসে। রান্না করতে বেশী জ্বালানী লাগে। রান্নার স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়। জলে লোহা থাকলে কাচা কাপড় লালচে হয়ে যায়।

একদিনে মাথাপিছু কতটা জল লাগে তারও একটা হিসাব আছে।

		শীতে		গরমে	
(ক) থাওয়া	—	৩	—	৫	লিটার
(খ) রান্না	—	৫	—	৮	লিটার
(গ) চান করা	—	৪৫	—	৬৭	লিটার
(ঘ) বাসন ও ঘর ধোয়া-মাজা	—	১২	—	২২	লিটার
(ঙ) পায়খানা	—	২৭	—	৩৬	লিটার
মোট	—	৯২	—	১:৮	লিটার

এই হিসাব অনুযায়ী বাড়ীতে জলের চৌবাচ্চা করার সময় খেয়াল রাখবেন যাতে মাথাপিছু একশো থেকে দেড় শো লিটার জল রাখা যায়। চৌবাচ্চার আকার এমন হওয়া উচিত যাতে তিন দিনের মোট দরকার-মাফিক জল আগাম আটকে রাখা যায়। মাটির উপরের জলে নানা-রকম রোগজীবাণু ও ময়লা থাকতে পারে। কাজেই নদী, নালা, পুকুর থেকে সরাসরি জল তুলে এনে খাওয়া অনুচিত। অতএব বাকি রইল মাটির নীচের জল। ফোয়ারা বা ঝরনা বাদ দিলে মাটির তলার জলকে তুলে আনার দুটি উপায় আছে—পাতকুয়ো ও নলকূপ।

[১] **পাতকুয়ো**—পাতকুয়োর গভীরতা বেশী হয় না। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ৮/১০ মিটার নীচে গেলেই ভাল জল পাওয়া যায়। সেই জল তুলেই কাজে লাগনো হয়। চারপাশটা মাটি বা সিমেন্টের ঢালাই চাক অথবা ইটের গাঁথা গোল দেয়াল দিয়ে বাঁধানো হতে পারে। বাঁধানো ইঁদারায় মাটি ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা নেই। ৮ মিটারের বেশী গভীর হলে কুয়ো বাঁধিয়ে নেওয়াই উচিত। ইঁদারার জল গরমকালে নেমে যায়, গভীরতা সেই হিসেবেই হওয়া চাই। পাতকুয়োর জল ব্যবহার খানিকটা নিরাপদ হলেও দূষিত হবার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

[২] **নলকূপ বা টিউবওয়েল**—ভারতে খুব কম শহরেই জলকল মারফৎ পাইপে করে জল সরবরাহ করা হয়। এই ক'টি শহরের কথা বাদ দিলে বাকি সবারই ভাল সুপেয় জলের বাবদ ভরসা নলকূপ। ৭.১ নং নকশায় দেখুন, নলকূপের ৫টি ভাগ। মাটিতে পোঁতা টিউব-ওয়েলটির সবার নীচে রয়েছে বেল প্লাগ দিয়ে আটকানো ব্লাংক পাইপ বা ব্লাইণ্ড পাইপ। তলায় মুখটি আটকানো যাতে ওই মুখ দিয়ে জল-
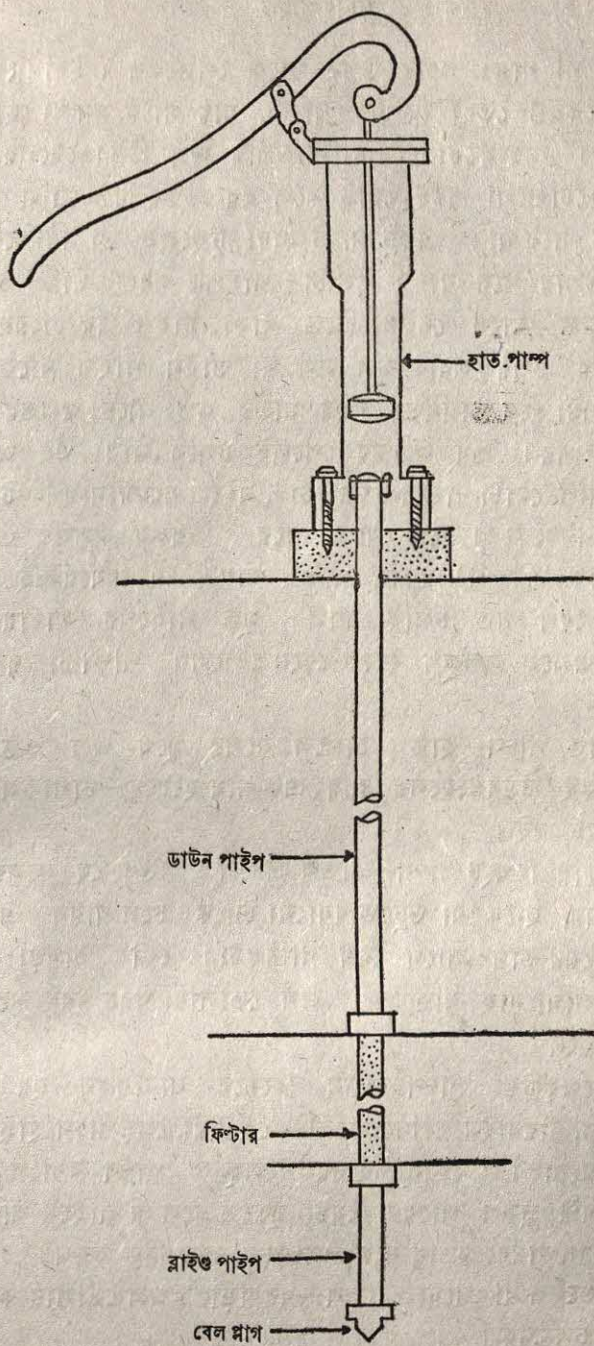
৭.১—নলকূপের ৫টি ভাগ

কাদা ঢুকে না যায়। তার উপর থাকে পেতলের (ইদানীং পাওয়া যায় প্লাস্টিকের) তৈরী ফিল্টার পাইপ, যার গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ফুটো আছে। এই ফুটো দিয়ে মাটির তলার জল টিউবওয়েলের ভিতর ঢোকে। ফুটোগুলো খুবই ছোট বলে এর ভেতর দিয়ে বালি বা মাটির ঢেলা ঢুকতে পারে না। একটু আধটু কাদা ঢুকলেও তা থিতিয়ে ব্ল্যাঙ্ক পাইপের তলায় বসে যায়। ফিল্টার পাইপটি অবশ্যই মাটির তলায় যে লেভেলে জল আছে সেইখানটিতে থাকা চাই। ফিল্টারের উপর থেকে মাটির উপর অবধি মূল নল বা ডাউন পাইপ থাকে। মূল নল কতটা লম্বা হবে তা নির্ভর করে মাটির কত নীচে জলস্তর পাওয়া যাবে তার ওপর। শুধু জলস্তর পেলেই চলবে না। ওই জলস্তরের মাটি বা বালি মোটা দানার হওয়া চাই, নইলে সরু দানায় ফিল্টার বুঁজে গিয়ে নলকূপ অকেজো হয়ে যেতে পারে। এরকম জলস্তর এক এক জায়গায় এক এক গভীরতায় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ওই এলাকার মিস্ত্রির উপদেশ মত চলাই ভাল। মূল পাইপের মাথায় থাকে পাম্প যা জলকে নলকূপ থেকে টেনে তোলে। পাম্প চার রকম হতে পারে :

১. হাত পাম্প—হাতল চাপলে নলের মুখে জল ওঠে। এই পাম্প থেকেই টিউবওয়েলের আর এক নাম হয়েছে—চাপাকল। জল তোলার খরচ নেই।

২. ফোর্স লিফ্‌ট পাম্প—হাতল টিপলে জল শুধু যে নলের মুখেই ওঠে তা নয়, ছাদে বা উঁচুতে বসানো ট্যাঙ্কেও চলে যায়। এই পাম্প চালাতে গায়ের তাগদ লাগে বেশ খানিকটা। কোন তাগড়া মুনিষকে এ কাজে লাগানোই যুক্তিযুক্ত। জল তোলার খরচ খুবই অল্প। শুধু মুনিষের মাইনে।

৩. ইলেকট্রিক পাম্প—গঠন হিসেবে নানারকম হয়। যেমন সেন্ট্রিফ্যুগাল, টারবাইন, রেসিপ্রোকেটিং, রোটারী, জেট্ পাম্প, হাইড্রোলিক র‍্যাম, এয়ার পাম্প। কোন্ ধরনের ইলেক্‌ট্রিক পাম্প বসালে আপনি সবচেয়ে বেশী সুফল পাবেন, সেটা বুঝতে হলে এ লাইনে অভিজ্ঞতার দরকার। পাম্প বিক্রেতার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করুন।

৪. ডিজেল বা পেট্রোল পাম্প—ঘরবাড়ীতে জল তোলার কাজে এর খুব একটা চল নেই।

● টিউবওয়েল বসানোর কায়দা-কানুন

নলকূপ বসানোর নানান কায়দা আছে। তার ভিতর সবচেয়ে চলতি হচ্ছে ঃ (১) পাইপ ঘুরিয়ে খোঁড়া ও (২) জল দিয়ে খোঁড়ার পদ্ধতি। ১নং পদ্ধতিতে একটা তে-পায়া ভারা থেকে ঝোলানো ইস্পাতের সুচালো মুখ বা কাটিং-শু লাগানো বোর পাইপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাটির ভেতর ঢোকাতে হয় অনেকটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে যেমন কাঠে স্ক্রু লাগানো হয়, সেই রকম। সেইসঙ্গে বোর পাইপের ভিতর দিয়ে পাম্প করে জল পাঠাতে হবে কাটিং-শুয়ের মুখে যাতে সেখানকার মাটি আলগা কাদা হয়ে চারপাশ দিয়ে ওপরে উঠে আসে ও বোর পাইপটিকে নীচের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে।

জল দিয়ে খোঁড়ার কায়দাও একই রকম। তবে এখানে বোর পাইপের চারপাশ ঘিরে থাকে মোটা ব্যাসের একটি ঘেরাটোপ বা কেসিং পাইপ। বোর পাইপটি ঘুরিয়ে ঢোকানোর বদলে তার ভিতব দিয়ে সজোরে জল পাম্প করা হয়। জলের তোড়ে মাটি কেটে পাইপ বসতে থাকে। বাড়তি জল কেসিং পাইপের ভিতর দিয়ে কাদামাটি নিয়ে উঠে আসে। সাধারণতঃ এঁটেল মাটিতে ১নং ও বেলে মাটিতে ২নং পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়।

● ফিল্টার পাইপ বুঁজে গিয়ে এক কেলেঙ্কারি

মিহি দানা বালির মাঝে বসানো ফিল্টার ৪/৫ বছর কাজ করার পর ফুটোতে বালি আটকে বুঁজে যায় ও টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে। এই-রকম টিউবওয়েলকে ফের চালু করতে হলে তিন ভাবে চেষ্টা করা যায় ঃ

(১) পাম্প করে টিউবওয়েলের ভেতর উপর থেকে নীচের দিকে সজোরে জল বা হাওয়া পাঠাতে হবে। এই উল্টোমুখা জলের তোড়ে বালির আটকে থাকা দানা বেরিয়ে গিয়ে ফিল্টারের ফুটো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

(২) নলকূপের ভেতর অনেক সময় জলের ক্ষার থেকে চুণের আস্তর পড়ে যায় ও ফিল্টারের ফুটো বন্ধ হয়ে যায়। এই রকম হলে, পাইপের ভেতর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢেলে দিতে হবে যাতে চুন গলে পরিষ্কার হয়ে যায়।

(৩) এক রকমের আংটাওয়ালা লোহার বল আছে যাকে বলে প্লাঞ্জার। এতে দড়ি বেঁধে পাইপের ভেতর সজোরে ফেলে দিলে ভেতরের

জলে উল্টো চাপ পড়ে। জল ফিল্টারের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে। ফুটোগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়।

দুটি টিউবওয়েলের পাইপের লম্বা যদি একই হয়, তাহলে তাদের পাশাপাশি বসাবেন না। তাতে দুটি নলকূপেই জল উঠবে কম। দুটির মাঝে অন্ততঃ ১৫ মিটারের ফারাক থাকা উচিত।

● সরকারী কল টিপলেই জল

কোলকাতার মত বড় বড় শহরে রাস্তার তলা দিয়ে পাইপ করে শোধন করা জল সরবরাহ করা হয়। ফেরুলের মাধ্যমে শাখা পাইপ দিয়ে জল এনে জমা করা হয় বাড়ির ভূতল জলাধারে বা আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ট্যাঙ্কে। সেখান থেকে পাইপে করে তোলা হয় ছাদের জলাধার বা ওভারহেড ট্যাংকে। ছাদের জলাধার থেকে আবার পাইপে করে সেই জল নিয়ে যাওয়া হয় বাথরুমের ও রান্না ঘরের কলে। ৭.২ নকশায় পুরো চেনটা এঁকে দেখানো হয়েছে। আজকাল অপচয় বন্ধ করার জন্য অনেক শহরে জল-মিটার বসানো হয় যাতে বাড়ি বাড়ি কতটা জল নেওয়া হচ্ছে তা বোঝা যায়। হরেক পাইপ লাইনের গোড়ায় একটি করে স্টপ্ কক বা ভাল্‌ভ্ লাগানো থাকে যাতে মেরামতির সময় ওই লাইনে জল আসা বন্ধ করে দেওয়া যায়। ভূতল জলাধারটি সাধারণতঃ ইটের গাঁথনি করে তৈরি করা হয়। ছাদের জলাধার ইটের, ঢালাইয়ের বা লোহার চাদর দিয়ে তৈরি করা যায়। ঢালাই করতে খরচ বেশী, লোহার ট্যাঙ্কে জল গরম হয়ে যায়, মরচের গন্ধ এসে যায়। তাই ইটের ট্যাঙ্কের চলন বেশী। ইটের ট্যাঙ্কে গাঁথনি ও পলেস্তারার মশলায় ৫ শতাংশ রেলা বা পাড্‌লো জাতীয় জলরোধক রাসায়নিক মিশিয়ে নিলে লিক্ (Leak) করার ভয় থাকে না।

● নির্মল থেকে মলময়

ভূতল জলাধার থেকে ২৫ বা ৩৭ মিমি. পাইপে জল ছাদে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ২৫ বা ৩৭ মিমি. মূল ডেলিভারী পাইপ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। তার থেকে ১২ বা ১৮ মিমি. শাখা পাইপ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। তার থেকে ১২ মিমি. উপ-শাখা পাইপ দিয়ে জল আসে বাথরুমের কলে, শাওয়ারে, বেসিনে, পায়খানার সিস্টার্ন, রান্নাঘরের
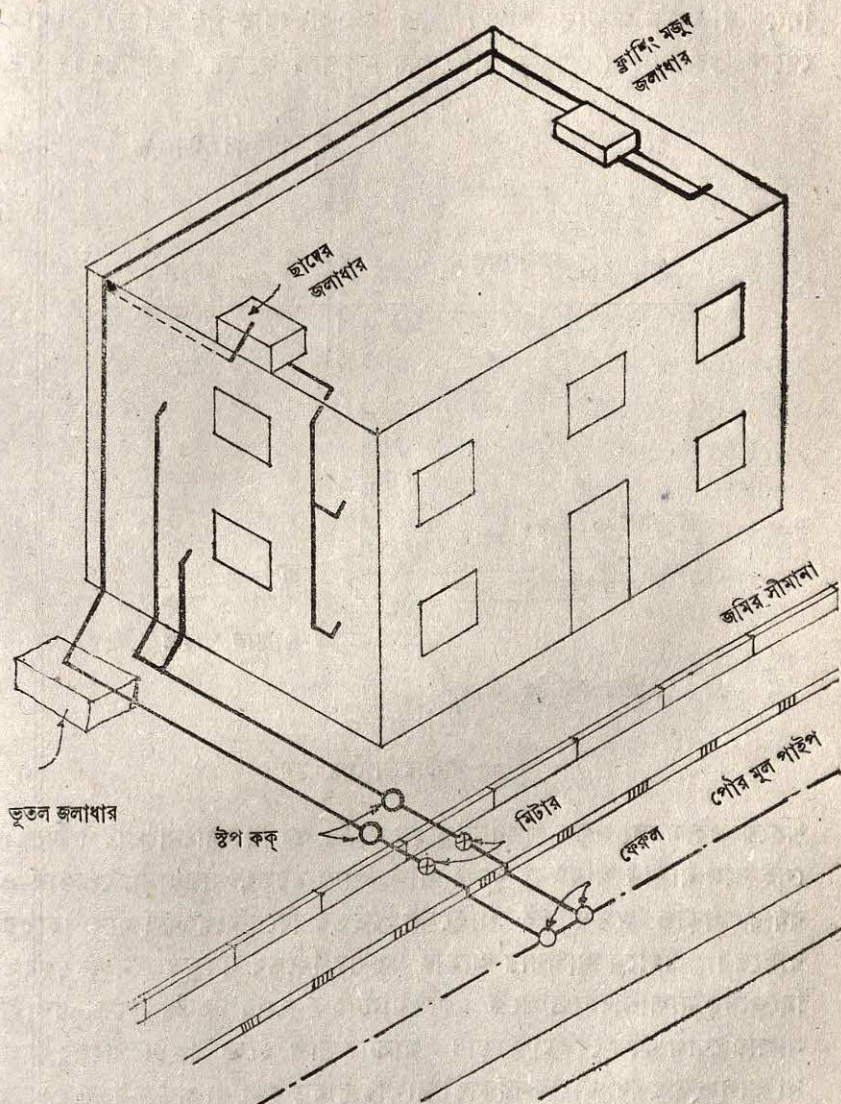
৭.২—বাড়িতে জল সরবরাহের পুরো চেন

সিংকে বা বাসন মাজার কলে। অথ জল-সরবরাহ-পর্ব ইতি। এখান থেকে শুরু হল (গোড়ার চার্ট দেখুন) ময়লা জলের অপসারণ। বড়
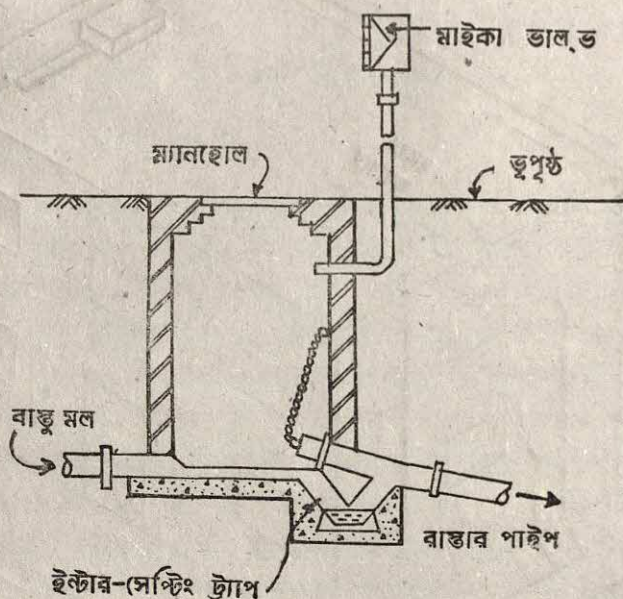
৭.৩—মাস্টার ট্র্যাপের গঠন

শহরে এই ময়লা জলও অপসারিত হয় মাটির তলায় বসানো পাইপ দিয়ে। সেই সঙ্গে নানান আবর্জনা, ধুলো-বালি, কাদা ময়লা, পায়খানা, পেচ্ছাব ও বর্ষার বাড়তি জলও ওই পাইপের ভেতর দিয়ে বয়ে চলে যায় শহরের বাইরে। এখানে আপনার আমার করবার বিশেষ কিছুই নেই, কেবল নিজেদের নালা-নর্দমাগুলিকে একটি মাস্টার ট্র্যাপের ভিতর দিয়ে সরকারী নালায় যোগ করে দেওয়া ছাড়া। মাস্টার ট্রাপ হচ্ছে একটা জলের সিল বা ভাল্‌ভ্ বিশেষ, যাতে সরকারী নালার দূষিত জল বা গন্ধ বাড়ির ভেতর না চলে আসে। ৭.৩ নং নকশায় মাস্টার ট্র্যাপের গঠন বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু খুব কম বাড়িওয়ালার কপালেই এ সুখ জোটে। দেশের বিরাট পল্লী এলাকায় বা আধা-শহর ও গঞ্জে যে হাজার হাজার ঘরবাড়ী তৈরি হচ্ছে সেখানে মালিকদের যেমন নিজের গাঁটের কড়ি খসিয়ে জলের জোগাড় করতে হয় তেমনি নোংরা ময়লা জল, কাদা পাঁক, পায়খানা যাতে বাড়িকে

রোগের ডিপো করে না তোলে সেদিকেও নজর দিতে হয়—নীরোগ পরিবেশ তৈরী করতে হয় গাঁটের কড়ি খসিয়েই।

● **আবর্জনা ও তার সাফাই :**

আবর্জনা চার রকম—

(১) জঞ্জাল (Garbage)—ছেঁড়া কাগজ, কাপড়, চট, শুকনো ঘাস, পাতা, তরকারীর খোসা, পচা ফলমূল, কাদামাটি, ধুলো, ছাই-পাঁশ। এইসব জঞ্জাল মাটিতে পুঁতে আজকাল কমপোস্ট সার তৈরি হয়। মাথাপিছু রোজ ২৫০ গ্রাম ধরা হয়।

(২) ধোয়ানি জল (Sullage)—রান্নাঘর, কলতলা, স্নানের ঘরের ময়লা জল, ঘর বা উঠান-ধোয়া জল। মাথাপিছু রোজ ১০০ লিটার হয়। খুব দুর্গন্ধ নেই বলে খোলা নালা দিয়ে সরানো হয়।

(৩) পায়খানার জল (Sewage)—মল মেশানো জল। গন্ধময়। খোলা নালা দিয়ে সরানো উচিত নয়। ঢাকা সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতর শোধন করে ঢাকা সোক-পিটে ছেড়ে দেওয়া উচিত। মাথাপিছু রোজ ৫০ লিটার ধরা হয়।

(৪) বর্ষার জল (Storm Water)—মাঠ, ঘাট, পথ ধোয়া এই জল অন্য অনেক আবর্জনা বহন করে নিয়ে যায়। কাজেই গন্ধ না থাকলেও এ জল আবিল ও দূষিত। খোলা নালা দিয়ে জনবসতির বাইরে খাল-বিলে নিয়ে গিয়ে ফেলা উচিত।

দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক রোগের ডিপো হচ্ছে সিউয়েজ বা পায়খানার জল। বাদবাকি আবর্জনা হয় মাটিতে পুঁতে দিলে বা খোলা নর্দমায় বইয়ে দিলেই কাজ চলে যায়। কিন্তু পায়খানার জলের জন্য চাই বিশেষ ব্যবস্থা, যাকে চলতি বাংলায় বলে স্যানিটরী পায়খানা। স্যানিটরী পায়খানার আদি রূপ হচ্ছে অ্যাকোয়া প্রিভি (৭.৪.১ নং নকশা)। এর আসল অংশটি হল মাটির তলাকার জলাধারটি। ফানেলের মত প্যান দিয়ে মল এসে মেশে এই জলাধারের জলে। প্যানের তলাটা জলে ডোবানো থাকে বলে মলের গ্যাস বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। বন্ধ জলাধারের ভেতর অন্ধকারে ও গরমে কঠিন মল রাসায়নিক ক্রিয়ায় তরল ও গ্যাসে পরিণত হয়। গ্যাস অংশ ভেন্ট পাইপ দিয়ে আকাশে চলে যায় আর তরল অংশ শোয়ানো পাইপ দিয়ে ঢাকা সোক্‌-পিটে তলিয়ে যায়।

স্যানিটরী পায়খানার আধুনিকতম রূপ হল সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক (৭.৪.২ নং নকশা)। সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক মূলতঃ অ্যাকোয়া প্রিভিই। সেপ্‌টিক
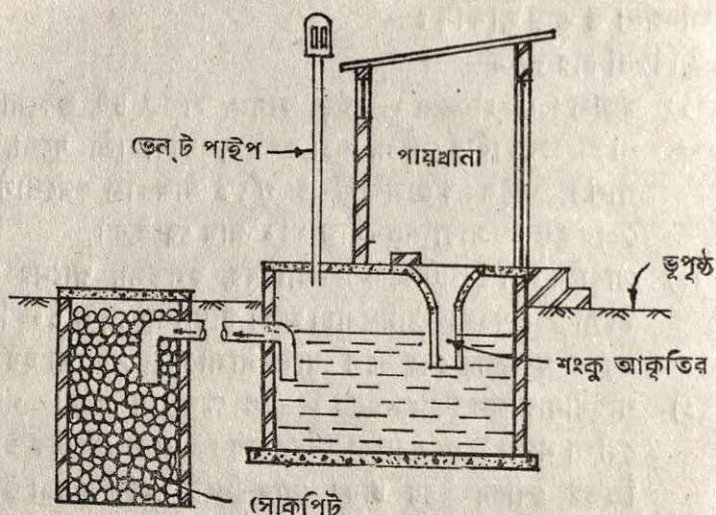
৭.৪.১—অ্যাকোয়া প্রিভি

ট্যাঙ্কের জলাধার দু' ভাগে ভাগ করা। ময়লা অংশে থিতানোর কাজ হয়। জলের সঙ্গে ভারী ভাসমান ময়লার কণাগুলি মেঝের উপর থিতিয়ে পড়ে। এই থিতানো ময়লাকে বলা হয় স্ল্যাজ (Sludge)। হালকা ভাসমান কণাগুলি (তেল, ঘি বা চর্বি জাতীয় ময়লা) ফেনার আকারে
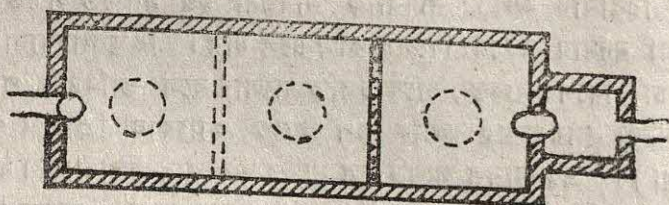
৭.৪.২—সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক (উপর থেকে)

জলের উপর ভেসে ওঠে। একে বলে স্কাম (Scum)। বাকি ময়লাটুকু দুসরা অংশে গিয়ে অন্ধকার, আর্দ্রতা ও গরমে তরল ও গ্যাস—এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তরল ভাগ সোক-পিটে চলে যায় এবং গ্যাস ভাগ ভেন্ট পাইপ দিয়ে আকাশে উড়ে যায়।

কতগুলি লোক পায়খানায় যাবে, তার উপর নির্ভর করে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের আয়তন। ধরুন, ট্যাঙ্কে জলের গভীরতা ১'২ মিটার। এখন লোকের সংখ্যা হিসাবে ট্যাঙ্কের মোট লম্বা ও চওড়া (ভিতরে ভিতরে) হবে নীচের তালিকা অনুযায়ী ঃ

১০ জন	...	২ মিটার	×	১ মিটার
২০ জন	...	২'৫ মিটার	×	১ মিটার
৩০ জন	...	৩ মিটার	×	১ মিটার
৪০ জন	...	৩'৫ মিটার	×	১ মিটার
৫০ জন	...	৩'৫ মিটার	×	১'৫ মিটার
৬০ জন	...	৪'০ মিটার	×	১'৫ মিটার
৭০ জন	...	৪'৫ মিটার	×	১'৫ মিটার
৮০ জন	...	৫'০ মিটার	×	১'৫ মিটার
৯০ জন	...	৫'০ মিটার	×	২ মিটার
১০০ জন	...	৫'৫ মিটার	×	২ মিটার

সেপ্‌টিক্ ট্যাঙ্ক তৈরীর সময় কয়েকটি বিষয়ে নজর দিতে হবে ঃ

(১) পায়খানা থেকে মল একটি জল-ট্র্যাপ ও ইন্‌স্পেকশন পিটের ভেতর দিয়ে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কে আনতে হবে।

(২) ভাসমান স্কাম যাতে বেরিয়ে না যেতে পারে সেইজন্য জল
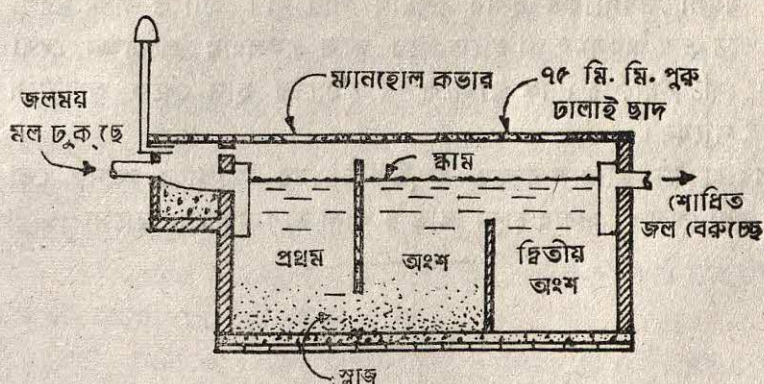
৭.৪.৩—সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক (পাশ থেকে)

ঢোকা ও বেরুনোর পাইপ দুটি জলের ভিতর ডোবানো অবস্থায় রাখা

উচিত। মনে রাখবেন পুরু স্কামটি ট্যাঙ্কের রাসায়নিক ক্রিয়ায় ভীষণভাবে দরকার।

(৩) ট্যাঙ্কের গাঁথনি, পলেস্তারা ও নীট সিমেণ্ট ফিনিশ পুরোপুরি জলরোধক হওয়া দরকার।

(৪) যাতে দরকার মত পরিষ্কার করা যায়, সেই কারণে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের উপর দরকার মাফিক ঢাকনা সমেত ম্যানহোল বসিয়ে দিতে হবে।

(৫) ভেণ্ট পাইপ বা হাওয়া বেরুনোর নল সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের অতি দরকারী অংশ। বসাতে ভুল না হয়ে যায়।

(৬) সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কে মলের আংশিক শোধন হয়, তাই বেরিয়ে আসা জল খোলা নালায় বা খাল-বিলে ফেলতে নেই। এর জন্য মাটিতে গর্ত করে তাতে ইটের টুকরো ভরে সোক্ পিট করে, তাতে ফেলুন।

অনেকে আমায় প্রশ্ন করেন, সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক কত বছর বাদে বাদে পরিষ্কার করা উচিত? ১১৭ পৃষ্ঠায় বাড়ির লোকসংখ্যা অনুযায়ী যে মাপগুলি দেওয়া হল তা যদি যথাযথ ভাবে মেনে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক তৈরী করা হয় তা হলে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক চিরদিন কার্যকরী থাকবে। তা পরিষ্কার করার প্রশ্ন কখনই উঠবে না। জায়গা কম থাকার দরুন বা খরচ কমাতে প্রয়োজনের তুলনায় ছোট মাপের সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক তৈরী করা হয় প্রায়শই। সেক্ষেত্রে ট্যাঙ্কের রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর অত্যধিক চাপ পড়ে এবং পুরো ময়লা তরলায়িত হবার সুযোগ পায় না। ট্যাঙ্কে কঠিন ময়লা জমে ওঠে এবং একসময় তা হাতে করে তুলে ফেলবার প্রয়োজন দেখা দেয়। সঠিক মাপের ট্যাঙ্ক বানালে এ ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে অনায়াসে রেহাই পাবেন।

ঘর-বাড়ীকে নীরোগ করতে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের অন্ধকারে অনেক তো সফর করা গেল। এবার চলুন বেড়িয়ে আসা যাক আলোর রাজ্যে…

৮

বিদ্যুৎ কি বিপদের দূত ?

● আগুন নিয়ে খেলা নয়

এই অবধি আপনাদের কান ঝালাপালা করেছি ; নিজে বুঝুন, নিজে গড়ুন, নিদেন পক্ষে নিজে তদারকী করুন। যেন আপনি চুরির দায়ে পড়েছেন, ঘানি না ঘুরিয়ে ছাড়ান নেই। বেশ, ঘাট মানছি। আর সেই সঙ্গে শুরু করছি উল্টো সুরের গাওনা। এই দফা মানে ইলেক্‌ট্রিকের কাজে নিজে কিছু করতে যাবেন না। লাইসেন্স পাওয়া মিস্ত্রির তদারকীতে কাজ করান, খরচ বেশী হলেও। কত আর বেশী হবে ? 'পরান' তো একটাই ; তার দামের থেকে বেশী নয় নিশ্চয়ই। তাছাড়া লাইসেন্স পাওয়া মিস্ত্রির তদারকী ছাড়া ইলেকট্রিক লাইনের কাজ করানোটা ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন মোতাবেক বেআইনীও।

● আলো, পাখা, সুইচেরও একটা নকশা

কোথায় আলোর বা পাখার পয়েন্ট হবে, কোথায় হবে প্লাগ, সুইচ-বোর্ড, রান্নাঘরে ইলেক্‌ট্রিক হিটার বসবে কোথায়, কোথায় থাকবে জলের পাম্প, গীজার, রেডিও, টিভি, মিটার, মেন সুইচ—এই সব বাড়ীর একটা নকশার উপর ছকে নিন। ভেবে-চিন্তে ঠিক করুন মোট ক'টা পয়েন্ট হবে। মনে রাখবেন বেশীর ভাগ মিস্ত্রিই চেষ্টা করে বিনা দরকারে পয়েন্ট বাড়াতে। তাতে তার ষোল আনা লাভ। আপনার শুধু যে পয়সা খরচই বাড়তি হবে তাই নয়, বেশী পয়েন্ট থাকলেই ইলেক্‌ট্রিক পুড়বে। বাড়তি বিলের খেসারত গুনতে হবে জীবনভোর। নকশা করার সময় আরো কয়েকটা বিষয়ে খেয়াল রাখবেন ঃ

(১) সুইচ বসাবেন ঘরে ঢোকার মুখে ; যাতে অন্ধকার ঘরে ঢোকার মুখেই আলো জ্বেলে নেওয়া যায়।

(২) মিটারের সঙ্গে একটা মেন সুইচ রাখতে হয়, আইন মোতাবেক। মিটার সাধারণতঃ বসানো হয় একটেরে কোণে। সিঁড়ির তলায়, নয়ত পাম্প রুমে, কম-প্রয়োজনীয় ঘরে। আপনি কিন্তু একটু বাড়তি খরচ করবেন। বাড়ীর মাঝখানে চলাচলের পথে বসাবেন আর

একটি ইমারজেন্সী মেন সুইচ। তারে আগুন লাগলে বা কেউ শক্ খেলে যাতে চট করে বাড়ির লাইন কেটে দেওয়া যায়।

(৩) প্লাগ, সুইচ সমেত সব পয়েন্টই মেঝে থেকে কম করেও সওয়া মিটার উঁচুতে রাখুন যাতে ছোটরা হাতে নাগাল না পায়। টিভি., রেডিও, ফ্রিজ বা স্ট্যাণ্ড ল্যাম্পের জন্য যদি নিচে প্লাগ করতে বাধ্য হন, প্লাগের সঙ্গে লকিং সুইচ রাখবেন। এতে সুইচ বন্ধ না করা অবধি প্লাগের মাথাটা খোলা যায় না। শিশুরা হাতের নাগালে কোন ফুটো পেলেই তার ভিতর আঙ্গুল, কাঠি ও পেরেক ঢোকাবার চেষ্টা করে। খোলা প্লাগের গর্তে পেরেক বা পিন ঢোকাতে গিয়ে বহু সর্বনাশ হয়ে গেছে।

● নানা রকম তার, নানা রকম লাইন

তার টানার কাজ আজকাল তিনভাবে হয়ঃ

(ক) দেয়ালে কাঠের ব্যাটেন মেরে তাতে পি. ভি. সি., বা সি. টি. এস. তার ক্লিপ দিয়ে আটকে দেওয়া হয়।

(খ) কাঠের ব্যাটেনে পি. ভি. সি.-র বদলে লেড বা সিসে মোড়া তার টানা হয়।

(গ) দেয়ালে গর্ত কেটে পলিথিনের পাইপ বসিয়ে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। তারপর সেই পলিথিনের পাইপের ভেতর দিয়ে পি. ভি. সি. বা সি. টি. এস. তার টানা হয়। দেয়ালের ওপর কোন তার দেখা যায় না বলে একে কন্‌সিল্ড বা লুকানো বলা হয়।

সস্তার বাড়ীতে কাঠের উপর পি. ভি. সি. তার দিয়ে খোলা লাইন টানা ভাল। সুদৃশ্য করতে হলে ড্রপ কন্‌সিল্ড বা সেমি-কনসিল্ড করুন। এতে দেয়ালের গায়ে যে জংশন বক্স থাকে তা থেকে তার খাড়াভাবে নেবে আসে সুইচে বা পয়েন্টে—সেই খাড়া অংশটুকু দেয়ালের ভেতর পলিথিন পাইপে লুকানো থাকে। সুইচ বোর্ডও বেরিয়ে থাকে না, দেয়াল কেটে বসানো হয়। বাদবাকি মেন লাইন, ছাদের লাইন কাঠের ব্যাটেনে খোলা পি. ভি. সি. তার দিয়ে করা হয়। এতে খরচ খুব একটা বাড়ে না অথচ মোটামুটি সুন্দর দেখতে হয়।

কন্‌সিল্ড বা পুরোপুরি দেয়াল ও ছাদের ভেতর দিয়ে পলিথিনের পাইপের মাঝখানে তার চালিয়ে যে লাইন হয়, তাতে কোন তার দেখা

যায় না বলে দেখতে খুবই সুন্দর হয় কিন্তু খরচ পড়ে বহুগুণ বেশী। এতে আগুন লাগার ভয় নেই-ই। শক খাওয়ার ভয়ও কম। নিচে নানান তারের একটা তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হল।

	কাঠের ব্যাটেনে খোলা পি. ভি. সি.	কাঠের ব্যাটেনে সিসে মোড়া তার	পলিথিন পাইপে ঢাকা পি. ভি. সি.
টেঁকসই কিনা	মোটামুটি টেঁকসই	টেঁকসই	খুব বেশী টেঁকসই
খরচ	সস্তা	দামী	খুব দামী
আঘাত সহন	ভাল	কম	খুব ভাল
আগুন লাগা	লাগে	কম লাগে	লাগে না
ড্যাম্প লাগা	লাগে	লাগে না	লাগে না
তৈরী করার সময়	কম লাগে	কম লাগে	বেশী লাগে
কত তার লাগে	বেশী	বেশী	কম

বাড়ির তার টানার কাজে মিটার থেকে একটি মূল তার (Main Line) টানা হয়। এই মূল তার কয়েকটা শাখা-মূল তারে (Sub-main line) এবং এক একটা শাখা-মূল কয়েকটি পয়েন্ট লাইনে ভাগ হয়। এক একটি পয়েন্ট লাইনের শেষে থাকে এক একটি বাতি, পাখা কিম্বা প্লাগ। যেখানেই একটি লাইন থেকে একাধিক শাখা বেরিয়েছে, সেখানেই একটি জংশন বক্স ও প্রতি শাখায় একটি করে ফিউজ দেয়া দরকার। ফিউজ হচ্ছে এমন একটি পাতলা তার যার ভেতর দিয়ে দরকারের বেশী বিদ্যুৎ গেলেই তা পুড়ে যায় ও লাইন অচল হয়ে যায়। কেউ শক খেলেই তারের ভিতর দিয়ে বেশী বিদ্যুৎ চলতে শুরু করে এবং ফিউজ নিজে পুড়ে গিয়ে শক খাওয়া মানুষটিকে বাঁচিয়ে দেয়।

● আলোকের ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দাও

কোথায় কত শক্তির (যাকে ইংরাজীতে বলে ওয়াটেজ) বাল্ব বা টিউব লাগাবেন ? এটি প্রধানতঃ নির্ভর করে আলোকিত স্থানটি কি ভাবে ব্যবহৃত হবে তার উপর। ঘরের সাধারণ আলো হবে নরম ও অপেক্ষাকৃত কম শক্তির। বিশেষ অংশে কাজ অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তির বাল্ব

বা টিউব লাগাতে হবে। গাইড হিসেবে নিচের তালিকাটি কাজে লাগান :

আলোকপাতের পদ্ধতি	ঘরের সাধারণ আলো (প্রতি বর্গ মিটারে)		অংশ-বিশেষে স্থানীয় আলো (প্রতি পয়েন্টে)	
	সিঁড়ি, গ্যারাজ, স্টোর, বারান্দা, বাড়ির প্রবেশপথ, পাম্পরুম, গেট	বসা, খাওয়া বা শোবার ঘর, করিডোর, লবী, প্যাসেজ, পুজোর ঘর	পড়ার বা খাবার টেবিলে, রান্নার কাউন্টার, বিছানার, সাইড টেবিল বা শিল্প-বস্তুর উপর আলোক-পাত	সেলাই কল, ড্রেসিং টেবিল, বাথরুমের আয়না, ড্রইং বোর্ড
ডাইরেক্ট	১০ ওয়াট	২০ ওয়াট	৪০ ওয়াট	৬০ ওয়াট
সেমি-ইনডাইরেক্ট	১২ "	২৪ "	৪৮ "	৭২ "
ইনডাইরেক্ট	২১ "	৪২ "	৪৮ "	১২৬ "

ডাইরেক্ট মানে যেখানে সরাসরি আলোকপাত করা হচ্ছে। সেমি-ইনডাইরেক্ট অর্থাৎ আংশিক ভাবে সরাসরি এবং ইনডাইরেক্ট হচ্ছে ঢাকা আলো দেয়ালে প্রতিফলিত করে ব্যবহার। ডাইরেক্টের আলো কড়া, ছায়া পড়ে : ইনডাইরেক্টের আলো নরম, ছায়াহীন।

ঘরের ও আসবাবের রং-এর উপরও আলোর শক্তি বেশ কিছুটা নির্ভরশীল। সাদা, হলদে ও গোলাপী রং-এর প্রতিফলন-ক্ষমতা বেশী। নীল, বেগুনে বা খয়েরী রং-এর প্রতিফলন অনেক কম। ঘরে এই সব রং-এর আধিক্য থাকলে আলোর শক্তি তালিকা থেকে ১০% বাড়িয়ে দেয়া উচিত। ঘরের মোট প্রতিফলনের ৬৫% আসে ছাদ থেকে, ২৫% দেয়াল থেকে এবং ১০% মেঝে থেকে। বিদ্যুৎ বাঁচাতে ছাদের রং সাদা বা হাল্কা হলদে হওয়া দরকার। ব্যবহারকারীর উপরও নির্ভর করে আলোর শক্তি। রণবিজয়ের তুলনায় দিগ্বিজয় হাজরার ঠিক ভাবে দেখতে হলে পাঁচ গুণ বেশী আলোর প্রয়োজন। বুড়ো মানুষের ঘরের বাল্বটা বেশী ওয়াটের হওয়াই দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে টিভির প্রচলন বাড়ছে, বাড়বে। আলোকমানের দিক থেকে এর কিছু নিজস্ব প্রয়োজন আছে। টি-ভির পর্দাটি সিনেমা হলের পর্দার থেকে ১০ গুণ বেশী উজ্জ্বল অথচ মাপে মাত্র ৫-৬%! অন্ধকার

ঘরে এই অতি উজ্জ্বল আলোকবিন্দুর দিকে একটানা তাকিয়ে থাকলে মাথাব্যথা, চোখ খারাপ—সবই হতে পারে। অথচ ঘর অন্ধকার না করলে ঠিক শো দেখার মানসিকতাও আসে না। এ ক্ষেত্রে তিনটি ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন :

(১) নিকটতম দর্শকের কাছ থেকে টিভি থাকবে পিকচার টিউব বা পর্দার খাড়াইয়ের ১০ গুণ দূরে।

(২) টি-ভির পিছনের দেয়াল বা পর্দা হবে গাঢ় রং-এর। তার উপর হালকা প্রিন্ট বা কাজ করা থাকলে আরও ভাল।

(৩) টিভির ঠিক পিছনে জিরো ওয়াটের একটি বাল্ব এমনভাবে লুকানো থাকবে যাতে পিছনের দেয়াল বা পর্দার কারুকার্য আবছা আবছা দেখা যায়।

এই সব ব্যবস্থায় দর্শকের চোখে পর্দার তীব্র আলোর আঘাত কমে যায় এবং দর্শক নিজের অজান্তে মাঝে-মধ্যে ২।৩ সেকেণ্ডের জন্য তাঁর দৃষ্টি পর্দা থেকে সরিয়ে টি-ভির পশ্চাদপটে নজর বুলিয়ে আনেন চোখকে বিশ্রাম দিতে।

আলোকসজ্জার বিষয়ে তিন দফা টিপস্ দিয়ে ঝরনা ধারায় আসুক লোড-শেডিং :

(১) টিউবে বিদ্যুৎ খরচ ৬৬% বেঁচে যায় কিন্তু সারা বাড়ীতে কেবল টিউব লাগালে আলোকসজ্জা বড় একঘেয়ে হয়ে যাবে। টিউব, বাল্ব, ডাইরেক্ট, ইনডাইরেক্ট মিশিয়ে সাজান ; আকর্ষণীয় হবে।

(২) আলোর উৎস থাকবে হয় দাঁড়ানো মানুষের কোমরের নীচে, নয়ত তার মাথার অন্ততঃ দেড় ফুট উপরে। এর মাঝামাঝি আলোর উৎস থাকলে তার গ্লেয়ার বা তীব্র ছটা চোখকে ধাঁধিয়ে দেবে।

(৩) রঙ্গীন বাল্ব লাগানো অনুচিত। এতে ঘরের বা জামাকাপড়ের রং কিম্ভূতকিমাকার অন্য রং-এর দেখায়।

● তমসো মা জ্যোতির্গময় :

দিগ্বিজয় বাবুর বাবার ঠাকুরদাদা জন্মেছিলেন ১৮১০ সালের ২২শে জুলাই ভরা বর্ষার গভীর রাতে। বাড়ির কাঠকুটো সব ভিজে গেছল বলে একশো বার চকমকি ঠুকেও আগুন জ্বালানো যায় নি। নাড়ি কাটা থেকে

সব কিছু হয়েছিল অন্ধকারে, আকাশে তারার আলোও ছিল না। ঘুট-ঘুটে অন্ধকারে বাপ-মা কেউ ছেলের মুখও দেখতে পারেননি পরের দিন সকাল না হওয়া অবধি। অথচ এঁরই নাতির নাতি রণবিজয় ছিল সিজারিয়ান বেবী। জন্মেছিল ১৯৪২ সালে কোলকাতার এক নামকরা হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে।

জন্মের সময় মাথার উপর জ্বলছিল কয়েক হাজার ওয়াটের অপারেশন ল্যাম্প। এতো আলো যে চোখ ধাঁধিয়ে গেছল। আলোর বন্যায়, পয়লা চোটে ছেলের মুখ দেখাই যায় নি। এই পাঁচপুরুষে অন্ধকার থেকে আলোয় আসার কাহিনী বেশ লম্বা। এই যুগ নিয়ে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যা বেলা ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়ার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ।"

পয়লা এল কেরোসিনের তেলের কুপি। তারপর গ্যাস বাতি বা হ্যাজাক ১৮৫০ সাল নাগাদ। ১৯০০ সালে বেরুলো ইলেকৃট্রিকের ফিলামেন্ট বাল্‌ব, যার এদেশী নাম হল 'আলোর ভুম'। মিট্‌মিটে বাল্‌ব কয়েকবছর বাদে আরো জোরালো আলো দিতে শুরু করল যখন তাতে গ্যাস ভর্তি করা হল। দেশ স্বাধীন হবার মুখে পর পর এল টিউব লাইটের দল—ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প, নিয়ন ল্যাম্প। হালে এসেছে মার্কারী বাল্‌ব, সোডিয়াম ভ্যাপর ল্যাম্প। কলকাতার মোহনবাগান মাঠে হ্যালোজেন আলোর বন্যা বইয়ে শুরু হয়েছে রাত-বিরেতে ফুটবল খেলা। ধাপে ধাপে আলো বেড়েই চলেছে। বছর পঞ্চাশ বাদে এমন সময় আসবে যে অন্ধকার বলে আর কিছু থাকবে না। মানুষের তৈরী ইলেকৃট্রিকের 'দিবাকর' রোজ রাতে আকাশ থেকে আলো পাঠিয়ে পৃথিবীর রাতকে 'দিন' করে রাখবে।

● খানতিনেক হুঁশিয়ারি

তবে আপাততঃ এমন 'দিবাকর' আমাদের আকাশে ঝুলছে না। কাজেই আমাকে, আপনাকে, দিগ্বিজয়বাবুকে যে যার বাড়ীতে নিজের নিজের ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করে নিতে হবে। এই কাজে তিনটি বিষয়ে নজর রাখবেন।

(১) যে কোন আলো বা পাখার পয়েন্টে দুটি তার যায় যার একটি দিয়ে ধরুন, বিদ্যুৎ যায় ও অপরটি দিয়ে বিদ্যুৎ ফিরে আসে। যেটি দিয়ে যায় সেটিকে বলা হয় জীবন্ত বা 'লাইভ ওয়ার'। সুইচ বা ফিউজ এই লাইভ ওয়ারের গোড়াতেই বসাতে হবে, অন্যটিতে নয়। এতে করে সুইচ বন্ধ করলে বা ফিউজ পুড়ে গেলে পুরো তার সমেত পয়েন্টটি বিদ্যুতের আওতার বাইরে চলে যাবে। কোথাও শক লাগার বা আগুন লাগার ভয় থাকবে না।

(২) একটি লাইভ ওয়ারে যদি বাড়ীর সব আলো-পাখা পর পর জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে খুব অল্প তারেই কাজ সারা যাবে। কিন্তু পয়লা দু'চারটে আলো-পাখা ঠিকমত জ্বলবে, চলবে ; তারপর বাদবাকি বাতিগুলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলবে, দপ্‌দপ্‌ করবে, পাখাগুলি ঘুরতেই চাইবে না ; আর ফ্রিজ, টিভি থাকলে, পুড়েও যেতে পারে। একে বলে ভোল্‌টেজ ড্রপ। এই ভোল্‌টেজ ড্রপের হাত থেকে বাঁচতে হলে প্রতিটি পয়েন্টে আলাদা আলাদা লাইভ ওয়ার টেনে নিয়ে যেতে হবে। একে বলা হয় প্যারালাল বা সমান্তরাল কানেকশান।

(৩) আগেও বলেছি, আবার বলছি, শক থেকে বাঁচবার জন্য হরেক পয়েন্ট তা সে বাতি, পাখা, পাম্প, ফ্রিজ, কুলার, হিটার, কি টিভি, যাই
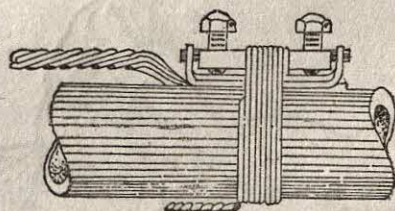
৮.১—জলের পাইপে আর্থিং

হোক না কেন, মোটা লোহার বা ৭/১৬ সাইজের তামার তার দিয়ে আর্থ করা উচিত। এই আর্থের তার ৮.১ নং নকশা অনুযায়ী জলের পাইপের সঙ্গে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে দিন।

● ঠেলা সামলানো

এত সব করেও যদি শক লেগে যায় কারু, ইলেক্‌ট্রিক ঠেলায় চেতনা হারায় কেউ, আপনার করণীয় কি ? ইলেকট্রিকের শকে সাধারণতঃ চামড়া

পুড়ে যায়, মাংসপেশীতে টান ধরে এবং শেষ-মেশ হার্ট (হৃদযন্ত্র) রক্ত পাম্প করার শক্তি হারিয়ে ফেলে…মরণ ঘনিয়ে আসে। শরীরের ভিতর দিয়ে যত বেশী বিদ্যুৎ যাবে, এই বিপদগুলো তত বেশী ঘনিয়ে আসবে। কাজেই শক লাগলে পয়লা কাজ হল যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বিদ্যুৎ বন্ধ করা বা শক লাগা শরীরটাকে কোন শুকনো লাঠি দিয়ে ইলেকট্রিক তারের থেকে আলাদা করে দেওয়া। যদি হাতের কাছে কিছু না পাওয়া যায়, শক-খাওয়া মানুষটির কোটের ঝোলা অংশ, টাই বা ধুতির কোঁচা ধরে টেনে আলাদা করাও যায়। তারপর যদি দেখা যায় শক-খাওয়া মানুষটি অচেতন হয়ে গেছেন বা তার নিঃশ্বাসের কোন কষ্ট হচ্ছে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মালিশ (আরটিফিসিয়াল রেস্‌পিরিশন) করতে হবে। এই মালিশ দরকার হলে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা চালাতে হবে। যে বিশেষ নিয়মে মালিশ করতে হবে তা ছবি দিয়ে বোঝানো হল :

৮.২.১ নং ছবি অনুযায়ী উপুড় করে তার কোমরের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পাঁজরার তলায়, পিঠের দুপাশে এমন ভাবে হাত রাখতে হবে যে

৮.২.১—ইলেকট্রিক শকের চিকিৎসা

বুড়ো আঙ্গুল দুটো ঠিক শিরদাঁড়ার দুপাশে সমান্তরাল ভাবে থাকে এবং বাকি আঙ্গুলগুলো দুদিকে যতটা পারে ছড়িয়ে থাকে। এরপর ৮.২.২ নং ছবির মত সামনে ঝুঁকে পড়ে চাপ দিতে হবে তিন সেকেণ্ডের মত। তারপর দু সেকেণ্ডে ফিরে আসতে হবে হাঁটু গেঁড়ে বসা ভঙ্গীতে, চাপ কমাতে কমাতে। এই ভাবে মিনিটে ১০-১২ বার চাপ দিতে হবে। যত সময় ধরে এই মালিশ চলবে, শক-খাওয়া মানুষটিকে কম্বল জড়িয়ে বা

গরম জলের ব্যাগ বা বোতল দিয়ে শেঁক দিয়ে গরম রাখতে হবে। চেতনা ফিরে আসার পরও এক-আধ ঘন্টা মালিশ চালিয়ে যাওয়া উচিত।

৮.২.২—ইলেকট্রিক শকের চিকিৎসা

বিদ্যুৎকে বিপদের দূত ভেবে অনেক হুঁশিয়ারি তো দেওয়া হল। এবার আসুন আর এক হুঁশিয়ারির পর্বে যাওয়া যাক। বাড়ী তৈরীর কর্মকাণ্ডে কোথায় কোথায় মার এড়াতে সাবধান হবেন, তারই ফর্দ…।

সাবধানের মার নেই !

● শোলকৃটা বেবাক উল্টে গেছে…

বিশেষ করে জমি-বাড়ি করার বেলায়, আপনি শুধু ফলেরই অধিকারী, কর্মকাণ্ডে আপনার বিশেষ কোন হাত নেই। মানে, জমি কেনাবেন দালাল চন্দোর আর উকিলমশাইকে দিয়ে; প্ল্যান তৈরী করবেন নকশাকার, বাড়ী করবে রহমন মিস্ত্রির দল, মালমশলা যোগাবে সিদ্ধি সাপ্লায়ার। এ সবের মাঝে আপনি একটি মাকাল ফল; দিগ্বিজয়বাবুর মত ছাতা হাতে কেবল হাঁফাবেন হন্তদন্ত হয়ে! তবু ফলটা যাতে বিফল না যায়, ভোগ করবার মত মিষ্টি আর পুষ্ট হয় তার জন্য কিছু তদারকী করা আপনার উচিত এবং দরকারও। কোথায় কোথায় ফাঁক থেকে যেতে পারে সেটা জানা থাকলে তদারকি করা সার্থক হবে। অতএব আসুন তারই একটা ফর্দ করা যাক:

[ক] **জমি বাছাই ও কেনা**

(১) ধরে নিলাম আপনি জমি কিনছেন কোলকাতা কর্পোরেশন এলাকার ভেতর। অনেক সময় জমির মালিক বড় জমির মাঝে পথ রেখে ছোট ছোট প্লটে জমি বিক্রি করেন। আইনের ভাষায় একে বলা হয় প্রাইভেট ডেভালাপ্‌মেন্ট। এই সব প্রাইভেট ডেভালাপ্‌মেন্টের প্লট ভাগের নকশা কর্পোরেশন থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। নকশায় দেখানো পথ ৯·১৫ মিটার চওড়া না হলে সে নকশা কর্পোরেশনের অনুমোদন পাবে না। অননুমোদিত প্রাইভেট ডেভালাপ্‌মেন্টের প্লটে বাড়ী করতে চাইলে তার নকশাও কর্পোরেশন অনুমোদন করবেন না। কাজেই প্রাইভেট ডেভালাপ্‌মেন্টে প্লট কেনার আগে খতিয়ে জেনে নিন ওই ডেভালাপ্‌মেন্টটি কর্পোরেশনের অনুমোদিত কিনা। না হলে পরে ঠকবেন।

(২) সি. আই. টি. (Calcutta Improvement Trust) বা সি. এম. ডি. এ. (Calcutta Metropolitan Development Authority) শহরের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বেশ কিছু জমি অধিকার করেছেন

বা করছেন নতুন বসতি গড়ে তুলতে। যতদিন সেখানে রাস্তাঘাটের নকশা শেষ না হচ্ছে, ততদিন ওই সব অঞ্চলে ঘরবাড়ী করা বেআইনী। রাস্তা বা পার্কের দরকারে ওরকম বেআইনী ঘরবাড়ী সরকার অধিকার করলে কোন রকম ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন না। এসব এলাকায় জমি হলে এইসব সংস্থার বিনা অনুমতিতে কেনাকাটা করবেন না।

(৩) কিছু কিছু এলাকা আছে যা দুটি বা তিনটি রেজিস্ট্রি অফিসের এলাকাধীন (যেমন, সোনারপুর থানা এলাকার জমি, আলিপুর সদর রেজিস্ট্রি অফিস, বারুইপুর ও সোনারপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে যে কোন একটিতে কেনা-বেচা, বন্ধক বা দায়বদ্ধ হতে পারে)। উকিলবাবু যদি জমির টাইটেল পরীক্ষা করতে যে-কোন একটি অফিসে সার্চ করেই দায় সারেন তা হলে সেই সার্চে সবকিছু ধরা নাও পড়তে পারে। উকিলবাবুকে এ বিষয়ে সজাগ করে রাখুন।

(৪) আপনার জমির পাশ দিয়ে যদি কোন কমন প্যাসেজ যায় এবং তাতে অন্যদের সংগে আপনার সমান অধিকার থাকে, তা হলে ওই প্যাসেজে আপনার ইজমেণ্ট রাইট (easement right) যে আছে তা আপনার দলিলে লেখা থাকা চাই। উকিলবাবুরা অনেক সময় এই বিষয়টি লিখতে ভুলে যান। ফলে বাড়ী করার সময় প্যাসেজ থাকা সত্ত্বেও ওদিকে আপনাকে ১·২ মিটার (৪ ফুট) ছাড় দিতে হবে, প্যাসেজের নীচ দিয়ে আপনার ইলেকট্রিক, টেলিফোন, জলের লাইন বা নর্দমার পাইপ চালানো যাবে না। উকিলবাবুকে এবিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিন।

(৫) বাড়ি করতে হলে পাশে ১·২ মিটার (৪ ফুট) ও পিছনে ৩ মিটার (১০ ফুট) খোলা জায়গা ছাড়তে হয়। অনেক লোভী জমির মালিক একেবারে নিজের বাড়ী ঘেঁসে জমি বিক্রি করে দেন। ওই রকম জমি কিনলে, মালিকের পাপে আপনাকে ভুগতে হবে। দু'বাড়ীর মাঝে আইন মোতাবেক ছাড় তখন আপনার জমি থেকেই পুষিয়ে দিতে হবে। জমি কেনার সময় আপনার জমি যিনি জরিপ করবেন তাঁকে দেখে নিতে বলবেন যে সামনের ও পাশের বাড়ী থেকে আপনার জমির সীমানা যেন যথাক্রমে তিন মিটার (১০ ফুট) ও ১·২ মিটার (৪ ফুট) থাকে।

(৬) জমি কেনবার আগে ভাল জরিপকার (Surveyor) দিয়ে জমি মাপিয়ে সঠিক মাপসহ নকশা করে নেবেন। তাতে সার্ভেয়ারের ফি বাবদ ২/৪ শত টাকা খরচা হলেও, এটা দরকার। এতে পৌনে তিন

কাঠা জমি কিনে তিন কাঠার দাম দেওয়া এড়ানো যায় এবং বাড়ী করার সময় নকশার ও তৈরী বাড়ীর মাপের কোন গরমিল হয় না।

[খ] বাড়ীর নকশা ও এস্টিমেট করানো

(১) আপনার নকশার মাপগুলি ও স্কেল নিখুঁত হওয়া দরকার। অনেক সময় দেখা যায় দু'পাশের ছাড়, দেয়ালের মাপ ও ঘরগুলির মাপ যোগ করলে জমির মাপের চেয়ে বেশী হয়ে যাচ্ছে। এর মানে যখন বাড়ী করা হবে তখন ঘরের মাপ ও নকশার মাপ মিলবে না। ঘর ছোট হয়ে যাবে। অনেক সময় এর ফলে প্রমাণ সাইজের দরজা-জানালা বসানোও শক্ত হয়ে পড়ে। শিব গড়তে যাতে বাঁদর না গড়ে ওঠে, তার জন্য আগেভাগে সাবধান হোন। নকশাকারের সঙ্গে বসে স্কেল আর মাপগুলি ভালভাবে মিলিয়ে নিন।

(২) বেশীর ভাগ সময়ই দেখা যায়, নকশাকার মূল বাড়ীর নকশা সযত্নেই করেছেন। কিন্তু সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক, সোক্ পিট, ভূতল বা ছাদের জলাধার, ইলেক্‌ট্রিক মিটার ও পাম্প ঘর, ছাদের জল বেরুবার নালা (Rain Water Pipe), টিউবওয়েল বা নলকূপ—এককথায় বাড়ীর নানান ছোটখাট আনুষঙ্গিক কোথায় থাকবে, কিভাবে গড়া হবে—এ সবের কোন বিবরণই নকশায় দেন না। ফলে বাড়ি করার সময় জায়গার অকুলান হতে থাকে। নকশা তৈরী করার সময়ই এ বিষয়ে নকশাকারকে সচেতন করে দিন।

(৩) নকশায় ঢালাই ছাদ, বিম ও পিলার থাকলে তার কোথায় কতখানি মাপ, লোহার ছড় কিভাবে কত সেন্টিমিটার পর পর থাকবে তার বিশদ বিবরণ নকশায় থাকা একান্ত দরকার। নকশাকারের কাছে এটি আদায় করে নিতে ভুলবেন না।

(৪) নকশার সঙ্গে মাল-মশলার ও গঠনবিধির একটা লম্বা বিবরণও আপনার প্রাপ্য। অনেক নকশাকার এখানে ফাঁকি দেন। এই বিবরণকে বলে স্পেসিফিকেশান (Specification)। আপনার তাঁকে দিয়ে এটি তৈরি করিয়ে নেবার ষোল আনা হক আছে। এটি থাকলে অনেক কাজে লাগবে।

(৫) এই সঙ্গে নকশাকার তৈরির ক্রম অনুযায়ী একটি দফাওয়ারী এস্টিমেট (Item-wise Estimate) দিতে বাধ্য যা থেকে আপনি

একনজরে বুঝতে পারবেন ভিত, গাঁথনী, কাঠের কাজ বাবদ মোটামুটি কত খরচ হওয়া উচিত। এস্টিমেট আপনাকে পদে পদে জানিয়ে দেবে যে আপনার খরচ বেহিসেবী হয়ে পড়ছে কিনা। আপনিও সেই মত সাবধান হতে পারবেন। এই এস্টিমেটে অনেক সময় ছোটখাট জিনিস ছেড়ে যায়। যেমন সেপ্‌টিক ট্যাংক, সোক্ পিট, জলাধার, নর্দমা, বাঁধানো আঙ্গিনা, মিটার ঘর, পাম্প রুম, সীমানার দেয়াল, গেট, রেন ওয়াটার পাইপ, ইলেক্‌ট্রিকের কাজ, স্যানিটারী কাজ। ছোটখাটো জিনিসগুলির খরচ হয়ত খুব বেশী নয়—কিন্তু রাই কুড়িয়েই বেল হয়। এস্টিমেটে এগুলো ধরা না থাকলে আসল খরচ এস্টিমেটের দেড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। কাবুলীওয়ালা এড়াতে নজর রাখুন—এস্টিমেটে সব কিছু ধরা হল কিনা।

(৬) এস্টিমেটটি চল্‌তি বাজার দর অনুযায়ী হওয়া উচিত। অনেক নকশাকার বাড়ন্ত দরের কোন খোঁজ রাখেন না—মান্ধাতার আমলের রেট দিয়েই এস্টিমেট তৈরি করে দেন। অনেক সময় নকশাকার জাহির করেন যে তাঁর নকশা-মাফিক বাড়ী করলে দারুণ সস্তায় কাজ সারা যাবে। আর এই ব্যাপারে বিশ্বাস জাগাতে এস্টিমেট করেন পাঁচ বছর আগের পুরানো রেটে। নকশাকারের এহেন দাবী থাকলে সে বিপদে পা দেবেন না। মনে রাখবেন নকশাকার যাদুকর নন। বিশকে উনিশ করা যায়। কেউ তাকে এগারো করার দাবী করলে বুঝবেন সেটা ভাঁওতা। এরকম পুরানো দরের এস্টিমেট নিয়ে কাজে নামলে আপনারই বিপদ। আর তখন দেখবেন নকশাকারের টিকিটিও খুঁজে পাবেন না।

[গ] কণ্ট্রাক্টার নিয়োগ

(১) অনেক সময় দেখা যায় নকশাকার বেনামীতে বা নিজের নামেই বাড়ী তৈরি করে দেওয়ার কণ্ট্রাক্ট নেন। এটা বেআইনী। কারণ এক্ষেত্রে নকশাকার শুধু শুধু বিনা দরকারে মোটাসোটা গাঁথনী, বেশী বেশী লোহা ও সিমেণ্ট দিয়ে ঢালাই, অনর্থক চওড়া ও গভীর ভিতের নকশা বানিয়ে কাজ বাড়িয়ে চলেন এবং অন্যায়ভাবে মুনাফা লুটতে থাকেন। আর্‌কিটেক্ট অ্যাক্ট, ১৯৭২ মোতাবেক ভারত সরকার রেজিস্টার্ড আর্‌কিটেক্টদের (এঁদের ডাক্তারদের মত আলাদা আলাদা রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকে যার বলে এরাই ভারতের একমাত্র স্বীকৃত নকশাকার) কোন কণ্ট্রাক্টারী

কোম্পানীর সংগে নিজের নামে বা বেনামে যুক্ত থাকা বেআইনী ঘোষণা করেছেন। আপনারও নিজের স্বার্থেই দেখে নেওয়া উচিত যে নকশাকার ও কণ্ট্রাক্টার বা হেড-মিস্ত্রির মাঝে যেন কোন সমঝোতা না থাকে। বরং এদের ভিতর একটু রেষারেষি থাকলেই আপনার স্বার্থ বেশী করে রক্ষা পাবে।

(২) কনট্রাক্ট করার সময় যতটা পারা যায় দফাওয়ারী রেটের (Item Rate) বোঝা-পড়া করে ঠিক করে নিতে হবে। কোন আইটেমের রেট, কাজ শুরু করার আগে ঠিক করা না থাকলে, কাজের পর সেই আইটেম নিয়ে নানা আব্দার, বায়না করে দর চড়াবার চেষ্টা করবে ঠিকাদার। সেই সংগে দেখবেন, অনেক লেবার কনট্রাক্টার তাদের রেটে গলতা, ডব্ল গলতা, পট্টি, উড়াপট্টি নামে অনেক ভুয়ো আইটেমের রেট দেন। এগুলো বিল বাড়ানোর কৌশল ছাড়া কিছুই নয়। এইসব অইটেমের পয়সা দিতে কিছুতেই রাজী হবেন না।

(৬) লেবার কনট্রাক্টের হুনিয়ায় 'সলিড মেজারমেন্ট' বলে একটা অদ্ভুত কথা আছে। এর মানে দরজা-জানালা বসাবার জন্য, তার উপরের লিন্টেল ঢালার জন্য বাড়তি পয়সা দিতে হবে কিন্তু গাঁথনীর মাপের বেলায় ধরে নিতে হবে এই ফাঁক-ফোঁকরগুলোতেও গাঁথনী হয়েছে। শাঁখের করাত, আপনার পকেট কাটা যাবে হু' বারই আসতে-যেতে। এই পুরো ব্যাপারটাই বে-আইনী। এ রকম কনট্রাক্টে কিছুতেই রাজী হবেন না। ভেন্টিলেটার বা খুব ছোট জানলার (যার আয়তন আধ বর্গমিটারের কম) বেলায় সলিড মেজারমেণ্ট চলতে পারে কিন্তু প্রমাণ সাইজের বেলায় নৈব নৈব চ।

[ঘ] লে-আউট করা

(১) ৯.১ নং নকশায় দেখুন একটা তিন মিটার চওড়া ও চার মিটার লম্বা ঘরের লে-আউট করা হয়েছে ঠিকভাবে ও বাঁকা ভাবে। যদি হুটি কোণাকুণি মাপই এক হয় (এখানে পাঁচ মিটার হবে), তা হলে জানবেন লে-আউট ঠিক হয়েছে। একে বলে ডায়গোনাল চেকিং বা গুনিয়া পরীক্ষা। মিস্ত্রিরা প্রায়ই এটি করে না। গোড়ায় এ ভুল ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে মেঝের টালী লাগাবার সময়। তখন ভুল শোধরাবার আর উপায় থাকে না। কাজেই লে-আউট করার সময় গুনিয়া চেকিং করতে কখনোই ভুলবেন না।
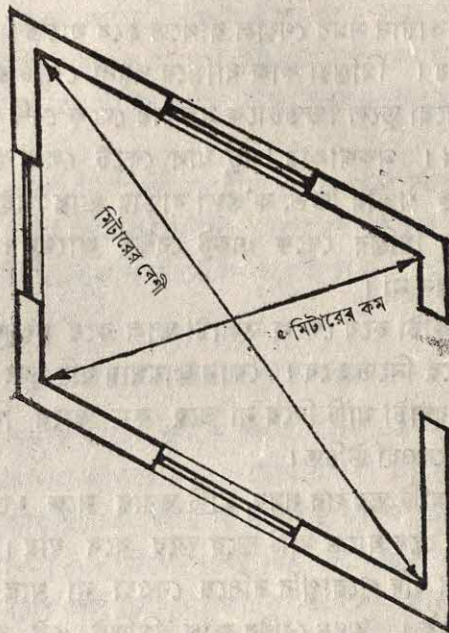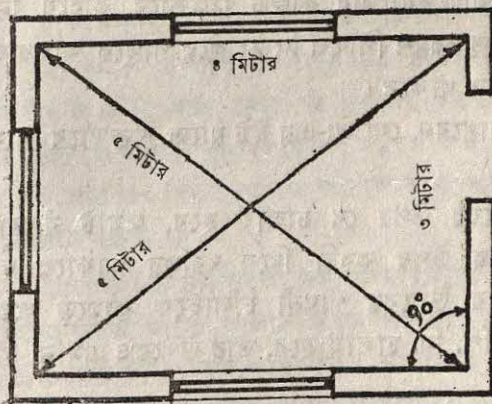
৯.১—৩ মি. × ৪ মি. ঘরের লে-আউট ঠিকভাবে ও বাঁকা ভাবে। ঠিকভাবে করলে লে-আউটে কোণাকুণি মাপ দুটোই ৫ মি. হবে।

[ঙ] ভিতের কাজ : মাটি কাটা, ঢালাই, গাঁথনী

(১) ভিত কাটার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে মাটি কাটার কাজ নকশা-মাফিক হয়। মিস্ত্রিরা কাজ বাড়িয়ে পয়সা লোটার তালে অনেক সময় মজবুতির ধুয়ো তুলে ভিতটাকে নকশার থেকে বেশী গভীর ও চওড়া করে কাটে, গাঁথে। নকশাকার কিছু ঘাস কেটে লেখাপড়া করেন নি। কত চওড়া ও কত গভীর ভিত, ক'তলা বাড়ীর ভার বইতে পারবে, এ বাবদে নকশাকার মিস্ত্রির থেকে একটু বেশীই জানেন। নকশা-মাফিক কাজ করুন, ঠকবেন না।

(২) ভিত কাটা হয়ে গেলে তলাটা ভাল করে দুরমুশ পিটিয়ে মাটি বসিয়ে সমতল করে নিতে হবে। কোন জায়গায় যদি ভুল করে বেশী কাটা হয়ে যায়, সে জায়গাটা মাটি দিয়ে না ভরে কম ভাগে সিমেন্ট মেশানো বালি দিয়ে ভরে দেওয়া উচিত।

(৩) ভিতে মাটি ভরবার সময়, মাটি ভরার সঙ্গে সঙ্গে জল ছিটিয়ে দুরমুশ করে যেতে হবে যাতে মাটি স্তরে স্তরে বসে যায়। ভিতরে মাটি মেঝে করার আগে যদি পুরোপুরি বসিয়ে নেওয়া না যায় তাহলে মেঝে ফেটে চৌচির হবেই। অথচ বেশীর ভাগ মিস্ত্রিই এই কাজটি দায়সারা ভাবে করে। এদিকে কড়া নজর রাখুন ও বকে, ধমকে, মিষ্টি কথায়— যে ভাবে পারেন, মাটি বসানোর কাজটি ঠিকভাবে করিয়ে নিন। পুরো বসে যাওয়া মাটিতে দুরমুশ পিটলে ঠং ঠং করে পাথুরে আওয়াজ বেরুবে। হাত ঝন ঝন করতে থাকবে।

(৪) নজর রাখবেন, সোলিং-এর ইট যাতে শক্তভাবে বসে, নড়্‌বড়্‌ না করে।

(৫) সোলিংয়ের উপর যে ঢালাই হবে, জমাট বাঁধবার আগেই মিস্ত্রিকে দিয়ে তার উপর করনি দিয়ে বরফির আকারে দাগ কাটিয়ে নিন। যাতে তার উপরের গাঁথনী ঢালাইকে কামড়ে ধরে। মেঝের লেভেলে যে ডি. পি. সি. ঢালাই হবে, তার উপরেও এমনি দাগ কাটিয়ে নিতে হবে।

(৬) ঢালাইয়ে পাথরকুচি লাগালে খানিকটা ১২ মিমি. সাইজের ও খানিকটা ১৮ মিমি. সাইজের পাথরকুচি মিশিয়ে নিন। ঝামা খোয়া হলেও ছোটবড় সাইজের মিশিয়ে নেবেন। খুব ছোট (১২ মিমি.-এর কম) সাইজ দেবেন না।

(৭) ইটের উপর দিকে আধ ইঞ্চি মত গর্ত করে কোম্পানির নাম বা মার্কা ছেপে দেওয়া থাকে। একে ইংরাজিতে বলে ফ্রগ। গাঁথনীর সময় (কেবল ৭৫ মিমি. দেয়াল বাদে) এই ফ্রগ সব সময় উপর দিকে থাকবে। যাতে মশলা উপরের ইটের চাপে তার ভিতর ঢুকে জোরালো বাঁধন তৈরী হয়ে যায়।

(৮) ১২৫ বা ৭৫ মিমি. দেয়ালে কোন ভিত দরকার হয় না, কেবল মেঝের ১০০ মিমি. পুরু ঢালাইটা দেয়ালের তলার ৩৭৫ মিমি. চওড়া অংশে ১৫০ মিমি. পুরু করে ঢেলে দিলেই চলে। ওই মোটা ঢালাইটাই ভিতের কাজ করবে।

[চ] গাঁথনী আর ঢালাইয়ের স্নান-যাত্রা

(১) গাঁথনীর আগে ইটকে জলে ভেজাতে হবে। পাঁজার উপর ছিড়িক্ ছিড়িক্ জল ছড়িয়ে নয়। চৌবাচ্চা বা ড্রামের জলে ইট ডুবিয়ে রাখতে হবে চার ঘণ্টা। তারপর গাঁথনীর কাজে লাগাবেন।

(২) গাঁথনী হয়ে গেলে পরের দিন থেকে শুরু করে সাত দিন সকাল বিকেল গাঁথনীকে জল ঢেলে ভেজাতে হবে। হোস্ পাইপ দিয়ে কাজ করতে পারলে ভাল, না হলে ভিস্তি লাগান। মিস্ত্রির উপর ভরসা করে চোখ-কান বুঁজে থাকলে ঠকবেন।

(৩) ঢালাই হয়ে গেলে তার উপর মাটির বাঁধ দিয়ে জল বেঁধে রাখুন। কম করে ১৫ দিন। ঢালাই পিলারে চট বেঁধে ভিজিয়ে দিন। নজর রাখবেন বাঁধ ও চটের জল যেন ১৫ দিনের ভিতর শুকিয়ে না যায়। ১৫ দিন ভেজালে গাঁথনী বা ঢালাইয়ের যা জোর হবে, না ভেজালে হবে তার অর্ধেক আর ৩০ দিন ভেজাতে পারলে হবে তার সওয়া গুণ। বুঝ লোক যে জান সন্ধান !

(৪) ঢালাই যদি চুন সুর্‌কী আর ঝামা খোয়া মিশিয়ে হয় তা হলে দেখে নেবেন সুর্‌কী যাতে কাল্‌চে লাল রং-এর হয়। হলদে সুরকীতে মাটির ভাগ বেশী থাকে, কমজোরী হয়। ঝামা যত কাল্‌চে হবে তত ভাল, তত মজবুত। খুব কালো তাল পাকানো ঝামাকে বলে তাল ঝামা। ভিত ঢালাইয়ের কাজে তাল ঝামার খোয়া পাথরকুচির চেয়েও বেশী উপযোগী।

(৫) একদিনে চারফুটের বেশী গাঁথনী করতে দেবেন না। একদিকের দেয়াল-ছাদ বরাবর উঠে গেল, অপর দিকে মোটেই উঠল না এমনটা ঘটা

উচিত নয়। চারদিকের দেয়াল সমান ভাবে ধীরে ধীরে একই সঙ্গে গড়ে তোলা উচিত। ঢালাই পিলারও একদিনে ছয় ফুটের বেশী ঢালাই করা উচিত নয়। তার বেশী এক সঙ্গে ঢাললে তলার দিকটা কমজোরী থেকে যেতে পারে।

(৬) গাঁথনী জোড়াই মশলা ১৫ মিমি.-এর চেয়ে যাতে পুরু না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। বেশী পুরু মশলায় যে শুধু সিমেণ্ট বরবাদ হয় তাই নয়, গাঁথনীর মজবুতিও কমে যায়।

[ছ] ঢালু ছাদ

(১) ছাদের তলায় বিম বরগা (এমনকি দরজা জানালার চৌকাঠও) বসাবার আগে আলকাতরা লাগিয়ে বা রং করে নেওয়া নিয়ম। করাও হয় তাই। কিন্তু একটা ভুল প্রায়ই হয়ে যায়। লম্বা কাঠের ডগা দুটো ইংরেজীতে যাকে বলে Ends—রংয়ের মজুরেরা গাফিলতিতে ছেড়ে যায়। আর এই পথেই ঢুকে পড়ে উই পোকা বা মরচে। যে কোন কাঠের বা লোহার মাথার উপর ও পায়ের তলা রং করা হয়েছে কিনা দেখে নেবেন।

(২) ছাদের অ্যাস্‌বেস্‌টস্ বা টিনের শীট তলার কাঠ বা লোহার ফ্রেমের সঙ্গে খুব টাইট করে আটকাতে হবে। একটু ঢিলা থাকলেই ঝড়ে শীট উড়ে যাবার ভয় থাকে। বেশী ঝড়ের এলাকা (যেমন দক্ষিণ বাংলা) হলে শীটের প্রান্তে ইটের গাঁথনী করে চাপান দিন।

(৩) এই ভাবে আটকাতে হলে টিন বা অ্যাস্‌বেস্‌টসে ফুটো করে নাট্‌বল্টু লাগাতে হবেই। এই ফুটো দিয়ে যাতে জল না পড়ে সেই জন্য এক রকম বিটুমেন কাপ ওয়াশার পাওয়া যায় ; নাট্ লাগাবার আগে প্রত্যেক বোল্টুতে একটা করে ওয়াশার উল্‌টো করে পরিয়ে দিন।

(৪) টিনের বা অ্যাস্‌বেস্‌টসের ছাদ রং করে দিলে অনেক বেশী দিন টিকবে, জল পড়াও বন্ধ হয়ে যাবে।

[জ] ঢালাই ছাদ

(১) মেলাই খবরদারী দরকার। একেবারে সিমেণ্ট আনা থেকে শুরু করি। পাড়ার ছোট খুচরো দোকান থেকে সিমেণ্ট কিনবেন না। বড় এজেন্ট, হোলসেলার বা সম্ভব হলে সিমেণ্টের কারখানা থেকে মাল নিন। ওজনে বেশী পাবেন (এক বস্তায় ৫০ কেজি মাল থাকার কথা—যতবার

গুদাম-জাত করা হয়, এক কেজি মত মাল বস্তা পট্‌কানিতে বেরিয়ে যায়। কাজেই কারখানায় ৫০ কেজি মাপ করে ভরা হলেও, নানা হাত ঘুরে ছোট দোকানে যখন বস্তা পৌছায়, তাতে ৪৫ কেজি মত মাল থাকে)। এ ছাড়া কারখানা বা হোল-সেলারের মাল টাটকা ও ভেজাল-হীন হয়। টাটকা সিমেন্টের যা তাগদ, একমাস বাসী হলে তার শতকরা ১০ ভাগ, তিন মাস বাসী হলে শতকরা ২০ ভাগ ও ছয় মাস বাসী হলে শতকরা ৩০ ভাগ কমে যায়। ছোট দোকানে ভেজাল মেশানোর সম্ভাবনা থাকে। যেচে নিজের সর্বনাশ করবেন না। সিমেণ্ট গুদাম-জাত করার কয়েকটা নিয়ম আছে। মেনে চল্‌লে সিমেণ্ট অনেক দিন টাটকা থাকবে। যেমন কাঠের তক্তা বা খড়ের বিছানায় প্লাস্টিক শীট বিছিয়ে বস্তা রাখুন একটার উপর আর একটা চাপিয়ে। আট বস্তার বেশী উঁচু গাদা লাগাবেন না। বস্তার গাদা ও দেয়ালের মাঝে একফুট বা ৩০০ মিমি. ফাঁক রাখবেন।

(২) বালিতে মাটি মেশানো হলে চলবে না। মাঝারী বা মোটা দানা দেখে নেবেন। এক গেলাস জলে একমুঠো বালি ফেলে দেখুন, জল যদি ঘোলাটে হয়ে যায়, বুঝবেন বালিতে মাটির মিশেল আছে।

(৩) ঘোলাটে বা নোনতা জলে ঢালাই না করাই উচিত।

(৪) ঢালাইয়ের তক্তার তলায় শালের খুঁটি লাগানোই নিয়ম। অভাবে আজকাল বাঁশের খুঁটি দিয়ে কাজ সারা হচ্ছে। বাঁশের খুঁটিতে মজবুতি অনেক কম। মজবুতি বাড়াতে, খুঁটির মাঝামাঝি আড়াআড়ি-ভাবে বাঁশ রেখে চার পাঁচটি খুঁটিকে এক সঙ্গে বেঁধে ফেলুন। একে বলে পাড় বাঁধা। রাতারাতি ঢালাইয়ের ওজনে বাঁশের খুঁটি বসে যাওয়া বা বেঁকে যাওয়ার মত কেলেংকারী এড়াতে পাড় দেওয়াটা খুবই দরকার। খুঁটির তলার মাটি যদি নরম হয়, খুঁটির তলায় তক্তা পেতে দেবেন। খুঁটি বসবে না।

(৫) লোহা বাঁধবার আগে মরচে থাকলে বা তেল গ্রীজ মাখানো থাকলে ভাল করে শিরিষ কাগজ ঘসে পরিষ্কার করে নিন।

(৬) দরকার মত পাখা ঝোলাবার আংটা (Fanhook) ঢালাইয়ের আগেই বসিয়ে নিতে ভুলবেন না।

(৭) টর্‌র্ (Torr) হচ্ছে এক রকম বিশেষ লোহার ছড় যাতে বোল্টুর প্যাঁচের মত শির (Rib) দেওয়া থাকে। এই লোহা কাজে

লাগালে সাধারণত লোহার প্রান্ত দুটো হুক বা আঁকশির মত মুড়ে দেবার দরকার হয় না। টর্‌র্ লাগালে এই কথাটা মিস্ত্রিকে বলে দেবেন, তার নাও জানা থাকতে পারে। এতে খরচের বহর কমবে।

(৮) হিসেব করে ততটাই মাল জল দিয়ে মাখবেন যা দুঘণ্টায় ঢালাই করে ফেলা যায়। মাল শেষ হয়ে এলে আবার নতুন করে মাখবেন। কোন কোন মিস্ত্রি সারাদিনের খোরাক একবারেই মেখে নিতে চায়। সে রকমটি হতে দেবেন না।

(৯) ঢালাইয়ের তক্তা খোলার একটা নিয়ম আছে। তার আগে খুলতে দেবেন না। নিয়মটা এই রকম ঃ

স্ল্যাব-পাশের	তক্তা	১	দিন	বাদে।	তলার	তক্তা	৮	দিন	বাদে
লিন্টেল	”	” ৩	”	” ।	”	”	১০	”	”
বিম	”	” ৩	”	” ।	”	”	১৬	”	”
বড় বিম	”	” ৭	”	” ।	”	”	২১	”	”
পিলার	”	” ৭	”	” ।					

(১০) সস্তা করতে গিয়ে অনেকে ছাদ ঢালাইয়ে পাথরকুচির বদলে ঝামা খোয়া মেশান। ঝামা ঝাঁঝরা হলে ছাদে জল বসতে পারে। যদি দেখেন কোন ঝামা খোয়া ২৪ ঘণ্টা জলে ভেজালে ১০ শতাংশ ওজন বেড়ে যাচ্ছে, সে ঝামা দিয়ে ছাদ ঢালাই করবেন না।

(১১) যে কোন ঢালাই-ছাদ বা লিন্টেল বা মেঝের উপর, ঢালাইয়ের দিন থেকে ৭ দিনের ভিতর কোন ওজন চাপানো, যেমন গাঁথনী করা, পাথরকুচি, ইট বা বালি গাদা করে রাখা উচিত নয়।

(১২) ছাদের ঢালাইয়ের আগে তলার ১২৫ মিমি. বা ৭৫ মিমি. দেয়ালগুলি গেঁথে ফেলা উচিত নয়, কারণ তাতে ছাদের অনেকটা ওজন এই পাতলা দেয়ালের উপর এসে পড়ে ও দেয়াল বসে যাবার ভয় থাকে।

(১৩) ঢালাইয়ে লোহার জাল সব সময় সিমেন্ট মশলা দিয়ে ঢাকা থাকে, যাতে লোহায় জল লেগে মরচে না ধরে। এই ঢাকাটা স্ল্যাবে ১২ মিমি., বিমে ২৫ মিমি. ও পিলারে ৩৭ মিমি. পুরু হওয়া দরকার। এইসব ঢালাইয়ে মশলা মেশানোর সময় ১ ভাগ সিমেন্ট, ২ ভাগ বালি ও ৪ ভাগ পাথরকুচি দিতে হবে। অন্য ঢালাইয়ের ভাগটা ১ ঃ ৩ ঃ ৬ বা ১ ঃ ৪ ঃ ৮ দেওয়া যায়।

(১৪) ঢালাইয়ের ব্যাপারটা একটু জটিল। পারলে কেবল মিস্ত্রির উপর ভরসা না করে, শুধু এইটুকু তদারকির জন্য একজন ওভারশিয়ার গোছের লেখাপড়া ও টেক্‌নিক্যাল কাজ জানা লোককে নিযুক্ত করুন। তাতে ক্ষতি হবে না, লাভ হতে পারে।

[ঝ] সিঁড়ি

(১) সিঁড়ির ঢালাই ১২৫ মিমি. (৫ ইঞ্চি)-র কম পুরু হওয়া উচিত নয়।

(২) কাটা, বাঁকা, ঘোরালো বা অসমান খাড়াইয়ের ধাপ থেকে নানা দুর্ঘটনা ঘটে। এসব করতে দেবেন না।

(৩) ধাপ ঢালাই বা গাঁথনী—দু ভাবেই করা যায়। গাঁথনীতে খরচ কম। ঢালাইয়ে মজবুতি বেশী। যাতেই করুন, প্রত্যেকটি ধাপের খাড়াই একরকম হওয়া দরকার। চওড়াও সমান হতে হবে।

(৪) ধাপের খাড়াই ৭ ইঞ্চির বেশী ও চওড়া সাড়ে ৯ ইঞ্চির কম হওয়া অনুচিত।

[ঞ] জানালা

(১) চৌকাঠের তলাটা কাঠে না করে, ঢালাই করে করুন। বেশীদিন টিকবে। এরকম চৌকাঠকে বলে তে-কাঠা বা তিন কাঠের ফ্রেম।

(২) গ্রীল করার সময় এমন নকশা বেছে নেবেন যাতে কোন ফাঁকের ভেতর দিয়ে মাথা না ঢুকে যায়। কায়দা জানা চোর, যেখান দিয়ে মাথা ঢোকাতে পারে সেখান দিয়ে পুরো শরীরটাই বেঁকিয়ে চুরিয়ে ঢুকিয়ে নেবে। আবার খুব ঘন গ্রীলে ঝুল-ময়লা জমে, খাঁচা খাঁচা দেখতে হয়। আলো-বাতাস আটকাতে পারে।

[ট] পলেস্তারা ঃ চুন রং

(১) শুকনো দেয়ালে পলেস্তারা করলে তা ফেটে যাবে। দেয়াল ভিজিয়ে জল ঝরবার আগেই পলেস্তারা করলে তাও ফেটে যাবে। দেয়াল জল টেনে নিয়েছে অথচ ভিজে ভিজে ভাব রয়েছে—এমনি সময় পলেস্তারা করা সব চেয়ে ভাল। মিহি বালিই এ কাজে উপযুক্ত।

(২) পশ্চিম বাংলার আবহাওয়ায় ঘরের দেয়ালে পয়েন্টিং, বিশেষ করে রুল পয়েন্টিং করলে দেয়ালে ঘরের ভেতর দিকে স্যাঁতা বা ড্যাম্প হয়। কোলকাতার বেশ কিছু নাম-করা আর্কিটেক্ট বাড়ীগুলিকে নয়নাভিরাম করার দোহাই দিয়ে বাইরের দিকের পলেস্তারা বাদ দিয়ে নানা ডিজাইনের রুল পয়েন্টিং চালাচ্ছেন। আমাদের নোনা আবহাওয়ায় এটা বোকামি হচ্ছে বলেই মনে হয়।

(৩) লাইম পানিং বা পংকের কাজে চুন ফোটাতে হবে কম করে ১০ দিন। অনেক মিস্ত্রি ৪।৫ দিনের মাথায় কাজ শুরু করে দেয়। তাতে লাইম পানিং ফেটে যায়। চুনের প্রলেপ যত পাতলা করে লাগানো যায় ততই ভালো। মোটা হলে ফাট ধরবেই।

(৪) লাইম পানিং বা চুনকামের পর ডিস্‌টেম্পার বা প্লাস্টিক রং লাগাতে হলে ৯০ দিন অপেক্ষা করতে হবে যাতে চুনে রং খেয়ে ফেলে দেয়ালটাকে ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া না করে দেয়।

(৫) রং করবার সময় গোলা রংটাকে সবসময় গোলাতে হবে। না হলে দেয়ালে রং কম-বেশী হয়ে ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া দেখাবে।

[ঠ] মেঝের কাজ

(১) মেঝেতে মোজাইক করতে হলে, মোজাইকের তৈরি টালি কিনে বসান। মেঝেতে ঢালাই করা মোজাইকের থেকে এগুলি বেশী টেকসই ও মজবুত। মেসিনের চাপে জমাট বাঁধানো হয় তো! তাছাড়া অর্ডার দেবার সময় দশ বিশটা বাড়তি টালি যদি কিনে রাখেন, মেঝের কোন টালি ভেঙ্গে ফেটে গেলে রং মিলিয়ে বদলী করার কোন অসুবিধা নেই। ঢালাই-করা মোজাইক ফাটলে আর রং মিলিয়ে মেরামত করার উপায় থাকে না।

(২) বাথরুমে অনেকে সাদা রং বা রঙ্গিন গ্লেজড্ টালি লাগান। এগুলির পালিশ খুব বেশী, কাজেই মেঝেতে লাগানো মোটেই নিরাপদ নয়। দেয়ালে লাগাতে পারেন, সহজে পরিষ্কার হয়। লাগাবার আগে টালিগুলি আধঘন্টা জলে ভিজিয়ে নেবেন। খুব কম মিস্ত্রই এই ভেজানোর নিয়মটুকু মানেন।

[ড] জল-ছাদ :

(১) অনেকে জল ছাদের খরচ কমাতে চুন-সুরকির খোয়া পেটানোর বদলে ছাদে সুরকীর উপর ইট পেতে জোড়াগুলো সিমেন্ট বালি দিয়ে ভরে দিতে বলেন। বেশীর ভাগ জায়গাতেই দেখেছি এতে জল পড়া বন্ধ হয় না। উল্টে ইটের তলায় জল জমে মালিকের অজান্তে এক ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। আঠাশ বছর লাইনে রয়েছি ; জল-ছাদকে টেক্কা দিতে পারে এমন কিছু চোখে পড়েনি।

[ঢ] বুঝ লোক যে জানো সন্ধান :

অঙ্ক ? না, অঙ্ক ঠিক নয় (অঙ্কে আমার বেজায় ভয়)। কিছুটা মামুলী হিসেব বলতে পারেন। এই হিসেবগুলো মোটামুটি জানা থাকলে মালমশলা নিয়ে মিস্ত্রি-মজুর-ঠিকাদার আপনার সঙ্গে খুব একটা কারচুপি করতে পারবে না। কাজেই আপনার জানা দরকার—

১. কত ধানে কত চাল !

(ক)

১ ইঞ্চি = ২৫ মিমি.	১ মিমি. = ০·০৪ ইঞ্চি
১ ফুট = ৩০৪ মিমি.	১ সেমি. = ০·৪০ ইঞ্চি
১ গজ = ৯১৪ মিমি.	১ মিটার = ৩·২৮ ফুট

(খ) বর্গ ফুট থেকে বর্গ মিটার পেতে হলে ০·০৯৩ দিয়ে গুণ করুন
" মিটার " " ফুট পেতে হলে ১০·৭৬৪ " " "
ঘনফুট " ঘনমিটার " " ০·০২৮৩ " " "
" মিটার " " ফুট " " ৩৫·৩১৪ " " "

(গ)

১ একর = ০·৪০৪৭ হেক্টর	১ ছটাক = ৪৫ বর্গফুট
১ হেক্টর = ২·৪৭১১ একর	১ কাঠা = ১৬ ছটাক
১ মাইল = ১·৬০৯ কিমি.	১ বিঘে = ২০ কাঠা
১ কিমি. = ০·৬২১ মাইল	১ একর = ৩ বিঘে

(ঘ) এক ঘন ফুটে ২৮.৩১৬ লিটার জল ধরে।
এক ঘন মিটারে ৯৯৯·৯৭ লিটার জল ধরে।

২. এবার কোন্ চাল ভাতে বাড়ে !

এতো গেল কত ধানে কত চাল তার মাপের কেতা। এবার আসুন একটু তলিয়ে দেখা যাক—কত মাপে কতটা মালমশলা লাগে। আমরা অবশ্য কেবল সিমেন্ট, ইট, বালি আর পাথরকুচি মানে যেসব মাল বেশী

লাগে, শুধু তাই নিয়েই কারবার করব। হিসেবটা সাবেকি ফুট-ইঞ্চিতেই দিলাম। আপনি তো জেনে ফেলেছেন কত ধানে কত চাল। নিজেই হিসেব করে বার করুন না মিটারের হিসেবটা!

(ক) **সিমেণ্ট :**

কংক্রীট (৬ : ৩ : ১)—প্রতি ১০০ ঘনফুটে লাগে—১৩ বস্তা
কংক্রীট (৪ : ২ : ১)— " " " " " —১৭ বস্তা
ইটের গাঁথনী (৬ : ১)— " " " " " —৪ বস্তা
পলেস্তারা (৪ : ১)— " " বর্গফুটে " —১ বস্তা
(১২ মি. মি. পুরু)
পলেস্তারা—(৬ : ১) " " " " " —১ বস্তা
(১৮ মিমি. পুরু)

(খ) **ইট :**

ইটের গাঁথনী (৬ : ১)—প্রতি ১০০ ঘনফুটে লাগে ১০৫০ টি

(গ) **বালি :**

কংক্রীট (৬ : ৩ : ১)—প্রতি ১০০ ঘনফুটে লাগে—৪৫ ঘনফুট
কংক্রীট (৪ : ২ : ১)— " " " " —৫০ "
ইটের গাঁথনী (৬ : ১)— " " " " —৩১ "
পলেস্তারা (৪ : ১)— " " বর্গফুটে " —৪ "
(১২ মিমি. পুরু)
পলেস্তারা (৬ : ১)— " " " " —৮ "
(১৮ মিমি. পুরু)

(ঘ) **পাথরকুচি :**

কংক্রীট (৬ : ৩ : ১)—প্রতি ১০০ ঘনফুটে লাগে—৯০ ঘনফুট
কংক্রীট (৪ : ২ : ১)— " " " " —৮৮ "

মোটামুটি এই সব হিসেব যদি মিস্ত্রি-মজুর ঠিকেদারের সমানে কপচাতে পারেন, আপনার জানকারিকে তারা ডরাবে, কুরনিশ করবে; আপনাকে মালমশলা বাবদ ঠকাতে ভরসা পাবে না। ব্যাস, বাড়ী শেষ করুন; ছুটি দিন মিস্ত্রি-মজুরকে। অন্ততঃ পাঁচ বছর নিশ্চিন্তি। তারপর অবশ্য শুরু হবে টুকটাক মেরামতি। তবে তার বেশীর ভাগই সামলে নিতে পারেন যদি জানা থাকে মেরামতির কেরামতি…

১০

ইমারতি মেরামতির কেরামতি !

আস্তো একটা বাড়ী করেছেন—জল, কল, ইলেকট্রিকের লাইন সমেত, টুক্‌টাক মেরামতি লেগে থাকবেই। বিশেষ করে বাড়ীর বয়েস পাঁচ বছর হবার পর থেকে। আর বয়েস যত বাড়তে থাকবে এই চিকিৎসার হার বাড়তেই থাকবে। কতবার মিস্ত্রি ডাকবেন? বিশেষ করে খুচরো কাজে মিস্ত্রি আসতে চায় না ; এলেও গলাকাটা মজুরি চেয়ে বসে। অথচ এসব মেরামতির বেশীর ভাগই খুব সামান্য ব্যাপার। কেরামতিটা জানা থাকলে পাঁচ মিনিটে নিজেই সেরে নেওয়া যায়। যেমন ধরুন :

(১) ফিউজ উড়ে যাওয়া (২) কলের ওয়াশার কেটে যাওয়া (৩) পায়খানার সিস্টার্নের বল ভাল্ব নষ্ট হওয়া (৪) জানালার কাঁচ ভেঙ্গে যাওয়া (৫) দরজার কজার ইস্ক্রুপ খুলে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

● **যন্তর মন্তর**

এর সবগুলো কাজ জানা থাকলে আর হাতে ঠিক ঠিক যন্ত্র থাকলে আধঘন্টায় তা নিজেই মেরামত করে ফেলা যায়।

ঠিক ঠিক যন্ত্রের একটা তালিকা এখানে দিলাম। একটা দুটো করে এগুলি কিনে ফেলতে পারলে আপনার বাড়ীতেই একটা ছোটখাট মেরামতি কারখানা গড়ে তুলতে পারেন :

(১) স্পিরিট লেভেল (২) পেরেক তোলার দাঁতওয়ালা হাতুড়ি (৩) বাটালী (৪) তেকোণা ফাইল (৫) তিন ব্যাটারি টর্চ (৬) ভাঁজকরা ফুটরুল বা গজকাটি (৭) ১৬ মিটারের মাপবার ফিতে (৮) প্লাস্টিকের ফানেল (৯) কাঁচ কাটা ছুরি (১০) লোহাকাটা করাত (১১) কাঠ কাটা করাত (১২) স্কাউট্‌দের ছুরি (১৩) পেন্সিল্ (১৪) চক (১৫) রাজমিস্ত্রির কর্নি (১৬) মশলা মাখার কড়াই (১৭) অ্যাডজাস্টেবল্ রেঞ্চ (১৮) কাঁটা পেরেক ঠোকার হাতুড়ি (১৯) তেলের কুপি (২০) শান দেয়ার পাথর (২১) রং করা বুরুশ (১ ইঞ্চি ও ৩ ইঞ্চি) (২২) ওলন (২৩) মাঝারী স্ক্রু ড্রাইভার (২৪) ছোট স্ক্রু ড্রাইভার (২৫) কাঠ চেঁচে সমান করার যন্ত্র (২৬) প্লাস্টিকের মাঝারী সাইজ বালতি (২৭) তাতাল (২৮) কাঠের

কাজের মাটাম (২৯) মাঝারী মাপের ঘোড়ঞ্চি (৩০) তার কাটা প্লায়ার্স বা প্লাস (৩১) হাতে ঘোরানো ড্রিল (৩২) ভাইস (৩৩) এক প্যাকেট মোমবাতি (৩৪) ফিউজের তার (৫, ১০ ও ১৫ অ্যাম্‌পিয়ার) (৩৫) ফেবিকল আঠা (৩৬) মেশিনের তেল (থ্র-ইন-ওয়ান) (৩৭) নানান সাইজের পেরেক, স্ক্রু, নাট-বল্টু, লোহার ও চামড়ার ওয়াশার—এক টিন (৩৮) ১০ গজ প্লস্টিকের টিউব (৩৯) শিরিষ কাগজ (লোহা ঘষা ও কাঠ ঘষা) (৪০) রাং ঝালের রাং (৪১) স্পন্‌জ (৪২) টনের সুতো এক বাণ্ডিল (৪৩) লোহা ও তামার তার—১০ মিটার করে (৪৪) তুলো ও ব্যাণ্ডেজ (৪৫) আইডিন (৪৬) এক রোল ব্ল্যাকটেপ (৪৭) এক রোল সেলো টেপ (৪৮) চটের সুতলী (৪৯) একটা রাওল প্লাগের ছেনি (৫০) এক টিন ডেটো
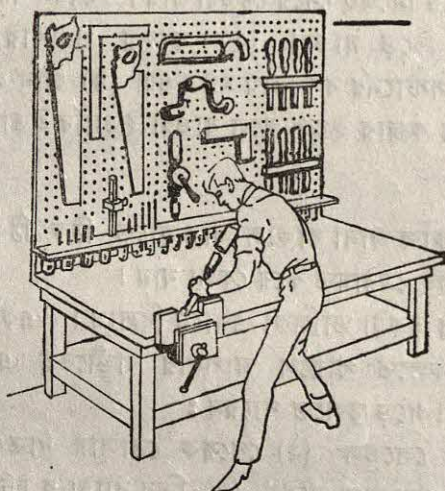
১০.১.—মজবুত টেবিল : একপাশে ভাইস, পেছনের খোপে যন্ত্রপাতি।

ফিক্স। এর সঙ্গে চাই ১০.১ নং নকশা অনুযায়ী একটা খুব মজবুত টেবিল যার একপাশে আটকানো থাকবে ভাইস আর পেছনের খোপে বা তাকে থাকবে যন্ত্রপাতি। খুচরো জিনিস (যেমন পেরেক, নাট-বল্টু, ওয়াশার) ১০.২ নং নকশা মাফিক তাকের তলায় ঢাকনা আটকানো জারে থাকতে পারে বা কাজের টেবিলের দেরাজে। এই টেবিলই আপনা মিনি কারখানা। আপনি যেখানে খুশী পাততে পারেন—গ্যারাজে, মিটার বা

পাম্প ঘরে, চিলে কোঠায় বা বড় রান্না ঘর থাকলে তার এক কোণে— মেরামতি, লুচিভাজা, প্রেমালাপ সব এক সঙ্গে চলবে ! যেখানেই করুন,

১০.২—তাকের তলায় ঢাকনা আটকানো জার।

হাতের নাগালে জলের একটা কল এবং টেবিলের উপর জোরালো আলোর ব্যবস্থা থাকা দরকার।

● একটু গোয়েন্দাগিরি

বাড়ীতে ন'মাসে ছ'মাসে তদারকি করতে হবে কিছু বিগড়েছে কিনা। অনেকে বছর বছর বাড়ী রং করান। রং করানোর আগে একদফা নজরদারী দরকার কোথায় ফুটো-ফাটা হয়েছে, কি কি মেরামত করা প্রয়োজন। একটা তালিকা বানাতে হবে। এই ইন্সপেকশনটা নিয়ম মাফিক পর পর করতে হবে ; নিয়মটা অনেকটা এই ধরনের :

১. আঙ্গিনা :

* (ক) ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে দেখুন, তা কাদা মাটিতে ভরে গেছে কিনা, জল ঠিকমত বয়ে যাচ্ছে তো ?

(খ) বাগানের বেড়া কি নড়্‌নড়্‌ করছে ? তার দিয়ে বেঁধে মেরামত করে দিন।

* (গ) গেট কব্জার দোষে ঝুলে পড়ে, ঠিকমত খোলা-বন্ধ করা যায় না। সেরকম হয়েছে কি ?

(ঘ) উঠোন বা কলতলা শান বাঁধানো হলে দেখে নিন তার কোথাও

বসে বা ফেটে গেছে কিনা। ফাটল দিয়ে ভিতে জল বসছে কি? সিমেন্ট, বালি দিয়ে সারাতে হবে।

(ঙ) খোলা বা ঢাকা নর্দমায় আঁশ, পাতা, তরকারীর খোসা আটকে জল যাবার পথ বন্ধ হয় নি তো? ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ুন।

(চ) ভিতের কোলে, জানলার চৌকাঠের তলায়, শান বাঁধানো উঠোনের ফাটলে অনেক সময় বট, অশ্বত্থ ও নানা রকম আগাছা জন্মায়। এগুলো ছোট অবস্থায় তুলে ফেলা দরকার।

২. **দেয়াল ঃ**

* (ক) দেয়ালে কি কোন ফাটল দেখা দিয়েছে? সে ফাটল মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে শোয়ান ফাটল, না মেঝে থেকে লম্বালম্বি খাড়া? শোয়ান ফাটল মামুলী, খাড়া ফাটলে ভয় থাকতে পারে—ইঞ্জিনিয়ারীং জানা লোককে দেখিয়ে নিন।

* (খ) দেয়ালের ফাটল দিয়ে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে আসে কি?

(গ) দেয়ালে ড্যাম্প বা নোনার দাগ ফুটে থাকলে সাবধান হতে হবে। নোনার উপর ফটো, ইলেকট্রিকের তার বা মিটার থাকলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দেয়াল আলমারীর ভেতর নোনা লাগলে, আলমারীতে রাখা জিনিস, বিশেষ করে বই, কাগজ, দলিল, কাপড়-চোপড়ে স্যাঁতা লেগে যাবে। নোনা সারাতে হলে ওখানকার পলেস্তারা ফেলে দিয়ে কড়াভাগে সিমেন্ট দিয়ে পলেস্তারা করুন।

(ঘ) দেয়ালের পলেস্তারা কোথাও ফুলে ফেঁপে উঠেছে কিনা বা চাপড়া বেঁধে খসে গেছে কি না?

৩. **ছাদ ঃ**

* (ক) ছাদে কোথাও ফাট ধরেছে কি? ফাটল দিয়ে জল পড়ে?

(খ) লাঠি দিয়ে ছাদের তলার পলেস্তারা ঠুকে দেখুন। ঢপ্‌ ঢপ্‌ আওয়াজ করলে বুঝবেন পলেস্তারা ছাদের ঢালাই থেকে আলগা হয়ে গেছে। আলগা পলেস্তারা খসিয়ে মেরামত না করে নিলে যে কোনদিন মাথায় পড়ে বিপদ ঘটাবে। হাসপাতালে ছুটতে হবে অমলেশের মত।

* (গ) অ্যাসবেস্টসের ছাদ হলে অনেক সময় ইট, শিলা, তাল, নারকোল পড়ে, অ্যাসবেস্টস-এর চাদর ফেটে যায়। বদলানো ছাড়া উপায় নেই।

(ঘ) ছাদে পাখীতে বট অশ্বত্থের ফল খেয়ে পায়খানার সঙ্গে বীজ ফেলে যায়। তার থেকে চারা গজিয়ে ছাদ ফুটিফাটা করে দিতে পারে। এদিকে নজর রাখুন।

(ঙ) বর্ষার জল যাবার পাইপের মুখ শুকনো পাতা পড়ে বন্ধ হয়ে যায় ; বর্ষার আগে এই মুখগুলো খুলে দেওয়া দরকার।

(চ) ছাদে যদি জলের চৌবাচ্চা থাকে, নজর করে দেখুন তাতে পলিমাটি জমেছে কিনা। পলিমাটি জমলে তা পরিষ্কার করা দরকার, নয়ত তা পাইপে ঢুকবে, পাইপ আস্তে আস্তে বুজে আসবে।

৪. দরজা ও জানালা :

(ক) নজর করতে হবে কোথাও উই ধরেছে কিনা। উইয়ের ঘর ভেঙ্গে দিয়ে ভাল করে কেরোসিন দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

(খ) কব্জা কঁ্যাচ কঁ্যাচ করলে মেসিনের তেলে ভিজিয়ে দিতে হবে।

(গ) পাল্লার কাঁচ পেরেক ও পুটিং দিয়ে আটকানো থাকে। নজর করুন এগুলি খসে গেছে কিনা, নয়ত ঝড় ঝাপ্টার মুখে কোনদিন কাঁচটাই খসে পড়ে বরবাদ হবে।

(ঘ) ভাঙ্গা ফাটা কাঁচ বদলে ফেলুন। হাত কেটে যেতে পারে।

(ঙ) জানালা আটকাবার হুক, ঠেস, ছিটকানি চৌকাঠের সঙ্গে বেশ শক্ত করে আটকানো আছে কিনা দেখে নিন। কালবৈশাখীর ঝড়ে নড়বড়ে হুক, ঠেস, ছিটকানি, আংটার উপর ভরসা রাখা বোকামি।

৫. সিঁড়ি :

* (ক) সিঁড়ির ধাপের ধারি বা নোসিংগুলো (হিন্দিতে মিস্ত্রিরা যাকে বলে আন্‌জ) অনেক সময় জুতোর শক্ত গোড়ালির ঠোক্করে ভেঙ্গে যায়। এই ধরনের ধারি বা কোণা ভাঙ্গা ধাপ থেকে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অথচ এগুলো সিমেন্ট-বালি দিয়ে মেরামত করলে দুদিন বাদে চাকলা উঠে যায়। পাকাভাবে মেরামতির একটিই উপায় : ধাপের কোণায় লোহার বা অ্যালুমিনিয়ামের এঙ্গেল বসিয়ে নেওয়া।

* (খ) সিঁড়ির বা বারান্দার রেলিং কাঠের বা লোহার হলে তাকে মাঝে মাঝে নেড়ে দেখতে হবে নড়্‌ বড়্‌ করছে কিনা। বেশী আলগা হবার আগে যদি সেগুলোকে আঁটসাঁট করে নেওয়া না হয়, শুধু যে দুর্ঘটনারই ভয় থাকে

তাই নয়, বেশী নড়বড়ে হয়ে গেলে সেগুলিকে খুলে আবার নতুন করে লাগাতে হয়। তাতে ঝামেলাও বেশী, খরচও অনেক।

৬. **মেঝে :**

(ক) মেঝেতে অনেক রকম বিশ্রী দাগ হয় হলুদ, চা, পোড়া সিগারেট থেকে। এর বেশীর ভাগ সাবান জল দিয়ে ধুলেই মুছে যায়। অনেক-দিনের পুরানো হয়ে গেলে জলে অল্প হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে ঘসে দিলে উঠে যাবে।

(খ) মেঝেতে আর এক রকম খস্‌খসে ধুলোর দাগ হয় আসবাবের নিচে। পায়াওয়ালা আসবাব থাকলে এই দাগ এড়ানো যায়। আপনার ঘরে যদি এমন আসবাব থাকে যার পায়া নেই, মেঝের উপর বসানো, তা হলে ছ'মাসে একবার করে নতুন ঢংয়ে আসবাব সাজান। ঘরও নতুন নতুন লাগবে, আসবাবের তলার জমা ধুলোও পাকাপাকি ভাবে মেঝে নষ্ট করতে পারবে না।

* (গ) মোজাইকের টালি অনেক সময় তলায় মশলা থেকে আলগা হয়ে যায়। একটা লাঠি দিয়ে ঠুকলে আটকানো টালিতে ঠক্‌ঠকে ও আলগা টালিতে ঢপঢপে আওয়াজ হবে। আলগা টালি তুলে ফের সিমেন্ট বালি দিয়ে বসিয়ে দিন। মেঝের আয়ু বেড়ে যাবে।

* (ঘ) অনেক সময় মেঝের টালি ফাট ধরে নষ্ট হয়ে যায়। মেঝে করার সময় একই রংয়ের বিশ পঁচিশটা বাড়তি টালি পালিশ করিয়ে ঘরে রেখে দেবেন ও দরকার মত ভাঙ্গা ফাটা টালি তুলে তার বদলী লাগিয়ে দেবেন। মেঝে নতুনের মত থেকে যাবে বছরের পর বছর।

৭. **নল-কল-পায়খানা :**

* (ক) টিউব ওয়েলের জল হলে, পাইপে মাটি ও নুনের আস্তর পড়ে পাইপ বুজে আসে। চার পাঁচ বছর বাদ বাদ এগুলি পরিষ্কার করিয়ে না নিলে, দামী পাইপ একদিন অকেজো হয়ে পড়বে। এগুলি পরিষ্কার করতে হয় পাইপের ভেতর দিয়ে উল্টো পথে সজোরে জল পাম্প করে।

(খ) অনেক কল বন্ধ থাকলেও মুখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে দেখা যায়। ওয়াশার পাল্টে এই লিক্ সারিয়ে নেওয়া খুবই সহজ।

(গ) পায়খানার ফ্লাশের সবচেয়ে অপল্‌কা অংশটি হল এর বল্ ভাল্‌ব। আগে পিতলের হত, এখন পিতলের দাম অনেক বেশী বলে প্লাস্টিকের

হয়। প্লাস্টিকের বলে প্যাঁচের ভিতর দিয়ে জল ঢুকে এগুলি খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। ফ্লাশ কাজ না করলে বল্ ভাল্‌ব বদলে দিন। ফ্লাশ কাজ না করলে পায়খানা থেকে বাড়ির আবহাওয়া দূষিত হতে পারে।

* (ঘ) সেপ্‌টিক ট্যাংক পরিষ্কার করানো একটা বিরাট ঝামেলার ব্যাপার, বিশেষতঃ শহরে। কিন্তু সেপটিক ট্যাংককে চিরজীবী করতে হলে ১২।১৪ বছর বাদ বাদ এই কাজটি করাতেই হবে।

৮. ইলেকট্রিক :

* (ক) সবচেয়ে দরকারী কাজ হচ্ছে ইলেকট্রিকের তারের উপর নজর রাখা। নোনা লেগে বা অপর কারণে তার গলে-পচে গেলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে পাল্‌টে ফেলতে হবে। খরচ বাঁচাতে টুকরো তার দিয়ে কাজ সারবেন না। পুরো তারটাই বদলে দিন।

*(খ) সুইচ বোর্ড, ফিউজের বাক্স, মেন সুইচ, রেগুলেটার ও জংশনের বাক্সের ভিতর পিঁপড়ে, আরশোলা, টিকটিকি বাসা বেঁধে শর্ট সারকিট ঘটাতে পারে। এ থেকে বাড়ীতে আগুন লাগাও সম্ভব। এগুলি ন'মাসে ছ'মাসে খুলে দেখে নেওয়া দরকার।

* (গ) এই সব বোর্ড ও বাক্সের ঢাক্‌না খুলে গেলে, তা সঙ্গে সঙ্গে লাগাতে হবে। একেবারেই খুলে রাখা চলবে না।

*(ঘ) ফিউজ বার বার পুড়ে যেতে থাকলে বিরক্ত হয়ে ফিউজ তারের বদলে মোটা তার লাগাবেন না। মিস্ত্রি লাগিয়ে খুঁজে বার করুন কোথা দিয়ে কারেণ্ট লিক করে এমনটা হচ্ছে এবং তা বন্ধ করুন। এই লিক থেকে বাড়ীতে আগুন লাগতে পারে।

* (ঙ) পাখা থেকে কঁ্যাচ কঁ্যাচ আওয়াজ হলে বুঝবেন পাখার অয়েলিং দরকার। অয়েলিং না করালে পাখা জ্বলে যেতে পারে। পাখার দাম ৩০০ থেকে ৬০০ টাকা। অয়েলিং-এর চার্জ ১২।১৫ টাকা।

এই তালিকার বাইরেও অনেক কিছু ঘটতে পারে। নজরদারীতে একবার রপ্ত হয়ে গেলে তখন সবকিছুই চটপট ধরা পড়বে। এক, দুই, তিন, চার করে কাজের একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলুন। তারপর ঠিক করতে হবে কোন্ কাজটা নিজে করতে পারবেন, আর কোন্‌টার জন্যে মিস্ত্রি-মজুর ডাকতে হবে। পয়লা ঝোঁকে মনে হবে সব কাজেই মিস্ত্রি

লাগবে। জোর করে যদি দুচারটে কাজে হাত লাগাতে থাকেন, দুচার মাস বাদে দেখবেন মেরামতির কেরামতি আপনার অনেকটাই জানা হয়ে গেছে। অর্ধেকেরও বেশী কাজ আপনি নিজেই সারতে পারছেন…পয়সা বাঁচছে, নিজের উপর বিশ্বাস বাড়ছে, শরীর ভাল হচ্ছে। যে সব কাজ সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সারা যায়, সেগুলো আগে ধরুন। কারিগরী জানকারী দরকার যে সব কাজে তা শিখতে সময় নেবে। পূর্ব-লিখিত তালিকায় যে সব কাজের আগে তারা মার্কা রয়েছে পয়লা দফায় সে সব কাজে মিস্ত্রি ডেকে নেওয়াই ভাল।

তবে মিস্ত্রিকে কাজে লাগিয়ে আপনার সরে পড়া চলবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারকি করুন। মিস্ত্রি কাজটাও মন দিয়ে করবে আর অনেক ছোটখাটো কাজের মারপ্যাঁচ আপনার জানা হয়ে যাবে, যেগুলোকে পরের বার আপনি নিজের হাতেই সেরে ফেলতে পারবেন। মনে রাখবেন, মিস্ত্রি কিছু মায়ের পেট থেকে কাজ জেনে আসে নি। আর পাঁচটা মিস্ত্রির কাজ দেখেই সে শিখেছে। আপনি এত এলেমদার লোক, চেষ্টা করলে আপনি আরো অনেক সহজে এবং তাড়াতাড়ি ওই সব কাজ শিখে ফেলতে পারবেন।

সব রকম কাজের খুঁটিনাটি এই ছোট্ট বইয়ের ভেতর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। বেশী দরকারী সহজ কাজগুলোর বিষয়ে একটা সাধারণ আলোচনা করছি যা পড়ে আপনার হাতে-কলমে কাজ করার ইচ্ছে জেগে উঠবে।

● কাঠ ও কাঠের কাজ

কাঠ ভালভাবে সিজনীং করা না থাকলে মাপে কমে, বাড়ে, বেঁকে যায়। যে কাঠ কিনবেন তার একটা টুকরো ওজন করে গরম চুল্লীর আশে-পাশে রেখে দিন। কয়েক ঘণ্টা উনুনের তাতে থাকবার পর ফের ওজন করুন। ওজন যদি মোটামুটি একই থাকে, জানবেন কাঠ সিজন্ করা। পরে তেড়া-বেঁকা হবে না। কাঠ কেনবার সময় লগ্ চিরিয়ে রেঁদা করিয়ে নেবেন। তাতে পরে আপনার খাটুনী অনেক কমবে। সাধারণতঃ যে সব সাইজের কাঠ কাজে লাগে তা হচ্ছে ২৫ মিমি. × ২৫ মিমি., ২৫ মিমি. × ৭'৫ মিমি., ৩৭ মিমি. × ৫০ মিমি., ৩৭ মিমি. × ১০০ মিমি.। লম্বায় ২½/৩ মিটার যা পাবেন তাই নেবেন। দরকার মত এর থেকে কেটে ছোট

করে নিতে হবে। কিছু ৬ মিমি. মোটা কমার্শিয়াল প্লাইউডও কিনে রাখবেন (৯০০ × ২১০০ মাপের)। সময়ে কাজ দেবে।

পালিশ বা রং করা কাঠের গায়ে অনেক রকম দাগ লাগে। এক গেলাস গরম জলে বড় চামচের এক চামচ তারপিন তেল গুলে তাই দিয়ে মুছে ফেলুন। বেশীর ভাগ দাগই উঠে যাবে। যদি কোন আঁচড়ানো দাগ হয়ে গিয়ে থাকে, দাগের উপর ভিজে তোয়ালে চাপা দিয়ে আধা গরম ইস্ত্রি চেপে ধরুন। আঁচড় যদি রং পার হয়ে কাঠে গিয়ে পৌঁছে না থাকে তা হলে মিলিয়ে যাবে। কাঠ জখম হয়ে থাকলে পুরো পালিশ বা রং তুলে, কাঠ শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ফের নতুন করে পালিশ বা রং
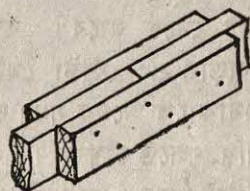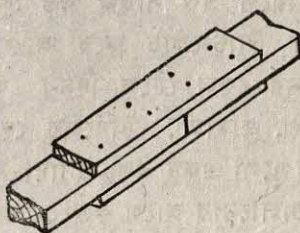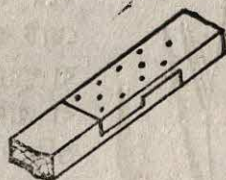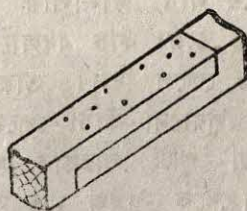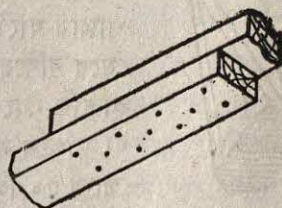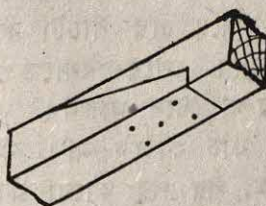
১০৩—কাঠের নানান রকম জোড়াই।

করতে হবে। ফুটো হয়ে থাকলে রং পালিশের আগে পুটিং দিয়ে ভরে সমান করে নিতে হবে। হোইটিং আর তিসির তেল মিশিয়ে কি ভাবে পুটিং তৈরী হয় তা এই বইয়ের ('দরজা ও জানালা : চৌকাঠ ও পাল্লা') ৬ অধ্যায়ের শেষে পাবেন। সিগারেটের পোড়া দাগ হয়ে থাকলে পুটিং ভরার আগে আধপোড়া কাঠ বা টালী দিয়ে চেঁচে পরিষ্কার করে নিন।

দরজা-জানলার কব্জা ঢিলে হয়ে যাওয়া একটা খুব সাধারণ রোগ। এর ফলে দরজা বন্ধ হতে চায় না; বন্ধ হল তো ছিট্‌কিনি লাগে না, মেঝেতে ঘসে দাগ হয়। মেরামতিটা খুব সহজেই করা যায়। কব্জার স্ক্রু খুলে ফুটোর ভিতর একটা দেশলাইয়ের কাঠি ঢুকিয়ে দিন। তারপর ফের স্ক্রু এঁটে দিন। পারলে এক সাইজ বড় স্ক্রু লাগান। কব্জা টাইট মেরে যাবে। কব্জায় ক্যাঁচ-কোঁচ করে আওয়াজ হলে তার শিরদাঁড়ায় ২।৩ ফোঁটা মেসিনের তেল ঢেলে দিন। কব্জা নীরব হবে। বর্ষাকালে অনেক সময় দরজা, জানালা, টেবিলের দেরাজ ফুলে আট্‌কে যায়, খুলতে চায় না। ধারগুলো একটু একটু র‍্যাঁদা করে দিলে ঝামেলা মিটে যাবে। তবে র‍্যাঁদা চালানোর আগে কব্জা থেকে পাল্লাটাকে খুলে নিতে হবে। না হলে র‍্যাঁদার কাজ ভাল করে করা যাবে না। জানালার আর একটা ছোট কাজ হচ্ছে ভাঙ্গা কাঁচ বদলানো। ভাঙ্গা বা পুরানো কাঁচ ফেলে দিন। তারপর সাঁড়াশী বা প্লাস দিয়ে পুরানো কাঁটা পেরেকগুলো ও শুকিয়ে যাওয়া পুটিং পরিষ্কার করে ফেলুন। কাঁচের দোকান থেকে সাইজ মত কাঁচ কাটিয়ে আনুন। কাঁচ কাটা ছুরি থাকলে আপনি বাড়ীতেও সাইজ করে নিতে পারেন। কাঁচটাকে পাল্লার ঘাটে বসিয়ে চার পাঁচটা কাঁটা পেরেক মেরে বসিয়ে নিন। পেরেক বসাতে ছোট হালকা হাতুড়ি কাঁচের গা ঘেঁসে মারুন। তাতে কাঁচে ঘা লাগবে না, কাঁচ ফাটবে না। কাঁচ আটকে গেলে ৫০ মিমি. পর পর আরো কাঁটা পেরেক ঠুকে দিন পাল্লার চার ধারে। এরপর পুটিং-এর সরু লম্বা লেচি বানিয়ে তা ঠেসে দিতে হবে কাঁটা পেরেকের সারির উপর দিয়ে। ১০.৪ নং নকশার

১০.৪—কাঁচের শার্সিতে পুটিং লাগানো।

মত করে বাটালী দিয়ে বাড়তি পুটিংটা চেঁচে ফেলুন। পুটিং শুকিয়ে গেলে তুলি দিয়ে বাকি পাল্লার সঙ্গে তার রং মিলিয়ে দিতে হবে।

● দেয়াল, মেঝে ও ছাদের নোনাধরা, ফুটোফাটা বা ময়লার দাগ :

নোনার পরিমাণ যদি অল্প হয়, পলেস্তারা খসিয়ে ফেলে নতুন করে পলেস্তারা করলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। নোনা থাকে ইটের ভেতর। শীতের শুকনো দিনে ইটের ভিতর জমে থাকা জলের সঙ্গে নুনও বেরিয়ে আসে ; দেয়ালে ভিজে ছোপ ধরায়, ঘরের রং নষ্ট করে, দেয়ালের গায়ে সাদা পাউডারের মত নুন জমে। সব ইটে নোনা হয় না। নদীর পলি থেকে যে ইট তৈরী হয়, তাতে নুন জমতে পারে না, নদীর জলে ধুয়ে যায়। ঘরের রং'কে নোনার হাত থেকে পাকাপাকি বাঁচাতে হলে একটাই উপায়। ২৫ মিমি. মোটা ও ৩৭ মিমি. চওড়া সেগুন বা অন্য কোন ভাল নরম কাঠের ব্যাটন দেওয়ালের গায়ে স্ক্রু দিয়ে আটকাতে হবে ৬০ সেন্টিমিটার বাদ বাদ—খাড়াখাড়ি এবং আড়াআড়ি ভাবে। কাঠ লাগাবার পর দেয়ালটাকে দেখতে হবে দাবার ছকের মত, চৌখুপী ঘর কাটা। এই কাঠের ফ্রেমের উপর স্ক্রু দিয়ে বোর্ড আটকে দিতে হবে। বোর্ড ৬ মিমি. প্লাইউড, অ্যাসবেস্টস্ বা খুব ভাল করে কাজ করতে হলে প্লাস্টার অব্ প্যারিস দিয়ে হতে পারে। জোড়গুলি পুটিং বা প্লাস্টার অব্ প্যারিসের তাল দিয়ে মিলিয়ে দিতে হবে। রং করলে আসল দেয়ালের মতই দেখতে লাগবে। বোর্ড ও দেয়ালের মাঝে ২৫ মিমি. ফাঁক থাকায় বোর্ডের গায়ে নোনা ধরবে না।

মেঝেতে ফাট বা ড্যাম্প ধরলে মেরামত করা শক্ত। একমাত্র উপায় হচ্ছে লিনোলিয়াম, কার্পেট বা রাবারইজাড্ টাইল জাতীয় কোন আচ্ছাদন দিয়ে মেঝে ঢেকে দেওয়া। মাটির সঙ্গে লাগোয়া মেঝেতে লিনোলিয়াম লাগালে অনেক সময় নীচে থেকে গ্যাস উঠে লিনোলিয়াম ফোস্কার মত ফেঁপে ওঠে। কাঠের বা কর্কের মেঝেতে এ ভয় থাকে না, তবে খরচ প্রচুর। ১০০ মিমি. চওড়া দেড়হাত লম্বা কাঠের টুকরো নীচে এক পরত লম্বালম্বি ও তার উপর এক পরত আড়াআড়ি করে মেঝেতে সেঁটে দেওয়া হয়। এ মেঝে দেখতে খুবই সুন্দর ও শীতকালে খুব আরামদায়ক। খুব ফুটিফাটা হয়ে গেলে মেঝের উপর থেকে ২৫ মিমি. মত তুলে ফেলে সিমেন্টের বা মোজাইক টালি বসিয়ে নিতে পারেন। সিমেন্টের টালিতে খরচ কম হবে।

দেয়াল বা ছাদে দু'রকম ভাবে ফাটল দেখা দিতে পারে। এক. পলেস্তারায় হিজিবিজি ফাটল। পলেস্তারা করার সময় দেয়াল পুরো ভিজিয়ে না নিলে এই ধরনের ফাটল দেখা দেয়। দুই. জায়গায় জায়গায় ভিত বসে গিয়ে দেয়াল ও ছাদ ফেটে জল বসতে বা ঢুকতে পারে। এই ফাটল অনেক গভীর হয়। পলেস্তারার ফাটলে, ফাটা জায়গায় পুরানো পলেস্তারা ফেলে দিয়ে নতুন করে সিমেন্ট-বালি লাগালেই ঝামেলা চুকে যায়। দেয়াল বা ছাদ ফাটলে ফাটার দুপাশে ধারালো ছেনি দিয়ে অন্ততঃ তিন আঙুল চওড়া করে একটা ৪০/৫০ মিমি. গভীর নালার মত করে কেটে নিতে হবে। তারপর কড়া ভাগে সিমেন্টের মশলা (১ ভাগ সিমেন্ট, ১ ভাগ বালি ও দুভাগ ছোট পাথরকুচি) তৈরী করে ছোট কর্নি দিয়ে সমান করে এই নালাটা ভরাট করে দিতে হবে। এই ধরনের ফাটল সাধারণতঃ আড়াআড়িভাবে থাকে। খাড়াখাড়ি ফাটল দেখা দিলে সাবধান হতে হবে। যদি দেখা যায় ফাটার দাগ আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছে তা হলে ৬ মিমি. মোটা লোহার রড দিয়ে হুকের মত তৈরী করে ফাটলের উপর আড়াআড়ি ভাবে বসিয়ে দিতে হবে আধহাত অন্তর। মিস্ত্রিদের ভাষায় একে বলে 'সেলাই' করা। নতুন মশলা ভরবার সময় নালাটাকে খু-উ-ব ভাল করে জল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে।

পলেস্তারা অনেক সময় ছাদ ও দেয়াল থেকে ছেড়ে গিয়ে ফেঁপে ঢপ্ ঢপ্ করতে থাকে। ছাদে ও দেয়ালে লাঠি ঠুকলে বুঝতে পারবেন। এরকম পলেস্তারা খসিয়ে নতুন করে নেওয়া ভাল। নয়ত কোনদিন মাথায় খসে পড়ে অমলেশের মত বিপদ ঘটাতে পারে।

বাথরুম বা রান্নাঘরের দেয়ালে সেরামিক টালি লাগানো হয়। এর এক-আধটা মাঝে মাঝে খুলে যেতে পারে। খোলা টালির পেছনে এরালডাইট, মোয়িকল্, ফেবিকল বা ডেনড্রাইট আঠা মাখিয়ে দেয়ালে আটকে দিতে হবে। দু এক মিনিট চেপে ধরে থাকতে হবে যাতে টালিটা ভালভাবে দেয়ালে আটকে যায়। পাশ দিয়ে বাড়তি আঠা বেরিয়ে এলে, শুকোবার আগে ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে।

ঘরে প্লাস্টিক রং করা খুব খরচের—রংটাও খুব টেঁকসই। চার পাঁচ বছর বাদে বাদে সাবান জল দিয়ে ধুয়ে নিলে রং খুব চক্চকে থাকে। কোন কম খর গুড়ো সাবান জলে গুলে দেয়ালের তলা থেকে উপর দিকে নরম কাপড় দিয়ে ঘষতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বালতিতে পরিষ্কার

জল দিয়ে সাবান গোলা জল ধুয়ে ফেলতে হবে। সাবান জল ১৫/২০ মিনিটের বেশী দেয়ালে লেগে থাকলে রং খেয়ে ছোপ ছোপ দাগ ধরিয়ে দিতে পারে। কাজেই সারা দেয়াল এক সঙ্গে না করে টুকরো টুকরো অংশে কাজ সারুন। দেয়ালকে একই সঙ্গে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে। জল মাঝে মাঝে বদলে নিন। দাগ তোলার ঝোঁকে খুব বেশী ঘষাঘষি করবেন না।

● রং করার দু'চার কথা

রং-এর টিনে রং বসে যায়, তেল ভেসে ওঠে। রং লাগাবার আগে তাকে ভাল করে গুলিয়ে নিতে হবে। পাতলা তেল অংশটা একটা অন্য টিনে ঢেলে নিন। এবার একটা লাঠি দিয়ে ঘন অংশটা জোরে জোরে ঘুলিয়ে নিয়ে একটু একটু করে তেল পাতলা অংশটার সঙ্গে মেশান ও পাতলা অংশটা নাড়তে থাকুন। দুটো এক হয়ে গেলে বার কয়েক ঢালা-উপুড় করে নিন। ভাল করে মেশানো রং-এ খোলতাই হবে অনেক বেশী। রং করার সময়টুকু বাদ দিয়ে সব সময় টিনের ঢাকনা বন্ধ রাখবেন। না হলে রংয়ে সর পড়ে যেতে পারে, সর পড়ে গেলে কাপড়ে বা মিহি ছাঁক্‌নী দিয়ে রং ছেঁকে নেবেন। ছাঁকবার সময় একটা কাঠি দিয়ে ছাঁকনীর রং নাড়তে থাকবেন। রং করবার আগে একটা লোহার বাটালী ও পরে শিরিষ কাগজ দিয়ে পুরোনো রং পরিষ্কার করে তুলে নিতে হবে। বাজারে একরকম তরল পেণ্ট রিমুভার কিনতে পাওয়া যায়, দরকার হলে ব্যবহার করতে পারেন। এর ব্যবহারবিধি টিনের গায়েই পাবেন।

রং করার একটা সময়-বিধি আছে। শীতকালের শুক্‌নো দিনে রং করলে খোলতাই বেশী হয়। বর্ষাকালে রং করবেন না। তেল রং করতে হলে জমি একেবারে শুকনো খট্‌খটে হওয়া দরকার। জল রং-এ উল্টো। জমি জব্‌ জবে ভিজে হওয়া চাই। দুকোট রং করার মাঝে পয়লা কোট শুকিয়ে যাবার মত সময় দিতেই হবে—যেটা উৎসাহের চোটে দেওয়া হয় না। এক একটা রং শুকতে এক এক রকম সময় নেয়। দু'কোটের মাঝে ২৪ ঘণ্টা ফাঁক দেওয়া ভাল। রং হয়ে গেলে রংয়ের বুরুশের চুলগুলো তারপিন বা কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। বার্নিশের বুরুশ বার্নিশে, জল রং-এর বুরুশ পরিষ্কার জলে।

টাটকা লাইম পানিং করা দেয়ালে রং করতে হলে তিন মাস অপেক্ষা করুন। চুনের ঝাঁঝ কাটবার আগে রং করলে রং খেয়ে যাবে। রং করার

আগে দেয়ালের ঝুল, কালি, তেল, ময়লা ধুয়ে নিয়ে ৭২ ঘণ্টা শুকিয়ে নেওয়া দরকার। রং যত পাতলা করে লাগাবেন তত টেকসই আর খোলতাই হবে। খরচ কম তো হবেই।

● জল-কল-নল

সপরিবারে বেড়াতে যাচ্ছেন পুরী কি দার্জিলিং! বাড়ী বন্ধ করার সাথে সাথে ছাদে জলের ট্যাংক থেকে যে ডেলিভারী পাইপ বেরিয়েছে তার সাথে লাগানো ভাল্‌বও বন্ধ করে দিন। ভাল্‌বের মাথায় যে ছোট্ট চাকা বসানো আছে সেটাকে পুরো ঘুরিয়ে আঁট করে দিন ; তা হলেই ভাল্‌ব বন্ধ হয়ে যাবে। ট্যাংক থেকে আর জল বেরুবে না। শুকনো পাইপ ভাল থাকবে। কোথাও দিয়ে লিক্ করে অযথা জলের অপচয় হবে না। সারা বাড়ী বন্ধ না করে যদি শুধু দোতলা কি তেতলার জল বন্ধ করতে হয়, তাহলে নজর করে দেখুন কোন্ পাইপ দিয়ে ওখানে জল সরবরাহ হর্চ্ছে। শুধু তারই গোড়াতে লাগানো চাকা ভাল্‌ব বন্ধ করতে হবে। এতে করে অন্যান্য তলার বাসিন্দাদের জলের ঘাটতি হবে না।

জল সরবরাহের এক নম্বর ঝামেলা হল কলের ওয়াশার কেটে যাওয়া। বাড়ীতে নানান মাপের কিছু চামড়া ও প্লাস্টিকের চাকতি ও কাপ ওয়াশার কিনে রাখুন। দাম সামান্যই। যেই দেখবেন কল বন্ধ করলেও জল পড়া বন্ধ হচ্ছে না, বুঝবেন ওয়াশার কেটে গেছে। পাইপের গোড়ায় যে ভাল্‌ব্ আছে তা এঁটে দিলে জল পড়া বন্ধ হবে। এইবার কলের হ্যাণ্ডেলের তলায় যে ছয় কোণা নাট আছে, রেঞ্চ লাগিয়ে খুলে ফেলুন। হ্যাণ্ডেলের ডাণ্ডাটা কলের পেট থেকে বেরিয়ে আসবে। এর তলার দিকে একটা ছোট নাট দিয়ে ওয়াশার আটকানো থাকে। ছোট নাট খুলে কাটা ওয়াশার বদলে, ঠিক সাইজ মাফিক নতুন ওয়াশার লাগিয়ে নিন। এবার দেখবেন কল ঠিক কাজ করছে। পাইপে অনেক সময় (বিশেষ করে বাড়ীর টিউবওয়েল থেকে জলের যোগান নিলে) বালি ও মাটি আটকে জলের ধারা কমিয়ে বা বন্ধ করে দেয়। বড় পিচকারীতে জল ভরে, কলের মুখে রবারের পাইপ দিয়ে ফিট করে খুব জোরে জোরে পিচকারীর জল পাইপের ভেতর চালান করুন (কল পুরো খুলে রাখতে হবে)। পাইপের গায়ে আটকানো ময়লা, কাদা, বালি সেই জলের সঙ্গে ছাদের ট্যাংকের ভেতর আছড়ে পড়বে। পাইপ পরিষ্কার হয়ে কলে জলের পুরানো তোড় ফিরে আসবে। পায়খানার সিস্টার্নে একটা জিনিসই খারাপ হয়। সেটা

হল সিস্টার্নের বল-ভাল্‌ব। বল্‌টা একটা পিতলের কাঠি দিয়ে ভাল্‌বের সঙ্গে আটকানো থাকে। প্যাঁচ খুলে বল্‌টা বার করে নিন। পেতলের বল্ হলে ঝালাই করে ফুটো সারানো যেতে পারে। প্লাস্টিকের হলে বদলে দেওয়াই ভাল। কাজটা করবার আগে ডেলিভারী পাইপে যে ভাল্‌ব আছে তা বন্ধ করতে ভুলবেন না। বল্ ফিট করবার পর যদি দেখেন ট্যাংক থেকে জল উপচে পড়ছে তা হলে পিতলের কাঠিটাকে হাতের চাপে একটু তুমড়ে বেঁকিয়ে বল্‌টাকে এক-আধ ইঞ্চি তলার দিকে নামিয়ে দেবেন। জল উপচানো বন্ধ হয়ে যাবে।

● ইলেকট্রিকের টুকিটাকি

লাইন ফিউজ হয়েছে? মিস্ত্রি ডাকাই ভাল। হাতের কাছে মিস্ত্রি না পেলে :

(১) মেন সুইচ বন্ধ করুন। মেন সুইচের লোহার হাতলটা সাধারণতঃ নীচে নামালে বন্ধ হয়। তীর দিয়ে সুইচের গায়ে অফ-অন লেখা থাকে। হাতলটা অফের দিকে ঠেলতে হবে।

(২) ফিউজ বাক্সের তলায় একটা শুকনো কাঠের টুল বা চেয়ার রেখে, তার উপর চড়ে কাজ করুন। হাত একদম শুকনো থাকা চাই। ঘেমো হাতও বিপজ্জনক।

(৩) বাক্সের ডালা খুলে এক এক করে দেখুন কোন্ ফিউজটা পুড়েছে, তাতে টান করে ফিউজের তার লাগান (ফিউজের তার ইলেকট্রিকের দোকানে পাওয়া যায়—তিন মাপের ৫, ১০ ও ১৫ অ্যাম্পিয়ার)। ফিউজ তারই হতে হবে। অন্য তার চলবে না।

(৪) বাক্সের ডালা বন্ধ করে মেন সুইচ চালু করুন। সঙ্গে সঙ্গে যদি আবার ফিউজ হয়ে যায়, বুঝবেন কোথাও কারেন্ট লিক্ করছে। মিস্ত্রি ডাকতেই হবে।

শুধু ঘর তুলে তার মেরামতি জানলেই চলবে না। পাঁচ জনের তারিফ পেতে হলে আপনার একটা নেশা থাকা দরকার। তা হোল ঘর সাজানোর নেশা······

১১

ঘর সাজানোর নেশা

আজকের দিনে ঘর সাজানো বা ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন্ যেন সব পরিবারের সামাজিকতার একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে সাজিয়ে তোলার নেশা মানুষের আদিম কাল থেকে। আর সেই সঙ্গে নেশা নিজের চারপাশের পরিবেশকে সাজিয়ে তোলার। সেই নেশাই যুগ-যুগের গবেষণা আর জ্ঞানের বিকাশে আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান—যার ইংরাজী নাম ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন্। বাংলায় এর ঠিক বিকল্প শব্দ নেই। কাজ চালানোর জন্য বেছে নিয়েছি 'ঘর সাজানো' কথাটা। বাঙ্গালী অল্পবিত্ত পরিবারেও আজ চল হয়েছে ঘর সাজানো কথাটা। অধিকাংশ বাঙ্গালী পরিবারেই ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন্ সম্বন্ধে একটা ভীতিজনক ধারণা চলে আসছে যে ওটা হচ্ছে একটা বিরাট খরচের ব্যাপার, শুধু বড়লোক-দেরই ওতে এক্তিয়ার; যারা মোটা ফি দিয়ে ডাকতে পারেন ইন্টিরিয়ার ডেকরেটারদের, কথায় কথায় বাতিল করতে পারেন বাড়ীর সমস্ত ফার্নিচার কিম্বা তাবৎ পর্দা-চাদর সুজনী-ওয়াড় কুশান কারপেট।

ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয়। বরং বলা চলে ঘর সাজানোর সঙ্গে রুচির যতটা সম্পর্ক খরচের সম্পর্ক তার দশ ভাগের এক ভাগও নয়। রুচির খাতিরে খুব কম খরচেই তারিফ করবার মত করে ঘর সাজানো চলে। সব পরিবারেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায় কতকগুলো গুণের সমাবেশ। কেউ পারেন ছবি আঁকতে, কেউ বা পারদর্শী ফটো তুলতে। একজন এমব্রয়ডারীতে ওস্তাদ, তো আর একজনের নেশা বাটিকের কাজ কিম্বা ফেব্‌রিক পেন্টিং। মাটির মডেলিং, কাগজের ফুল তৈরী বা অরিগ্যামি, কার্ডবোর্ডের মডেল তৈরী, পুতুল বানানো, পুঁতির কাজ, এমন কি আলপনা দেওয়ার নেশাকেও সুন্দর ভাবে ঘর সাজানোর কাজে লাগানো যায়। একটু মাথা খাটালেই দেখা যাবে এতে খরচ যেমন অল্প, আনন্দ তেমনি অসীম, যা নামকরা ডেকরেটারকে দিয়ে কোটি টাকা খরচ করলেও পাওয়া সম্ভব নয়। এই ধরনের ঘর সাজানোর কোন ফরমুলা নেই। অবস্থা, পরিবেশ ও সামর্থ্য অনুযায়ী কি করা হবে

আর কি করা হবে না তা ঠিক করতে হবে যিনি ঘর সাজানোর পরিকল্পনা করছেন তাঁকে নিজেকে। লেখার ভিতর দিয়ে আগে থেকে তা ঠিক করে দেওয়া যায় না। এ লেখার উদ্দেশ্য ডিজাইনারকে কতকগুলো পথনির্দেশ বা 'গাইড লাইন' ঠিক করে দেওয়া যা ধরে এগিয়ে তিনি নিজের কল্পনাশক্তি, বুদ্ধি ও আর্থিক তাগদ মাফিক পৌঁছতে পারবেন ঠিক সেই সমাধানটিতে, যা দরকার।

● ঘর, না ফার্নিচারের গুদাম !

বেশীর ভাগ মাঝারীবিত্ত বাড়ীতে দেখা যায় ঘরের অনুপাতে আসবাবের বিপুল সমারোহ। ঠাকুরদার আমলের পেল্লায় জোড়া খাট, যাতে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে হয়, তোরঙ্গ রাখার লম্বা বেঞ্চি, একাধিক জলচৌকি; ফোল্ডিং চেয়ার, কাঠের কুলুঙ্গী; টিনের র‍্যাক; আলনা; সাবেকী আলমারী; ড্রেসিং টেবিল; পুতুলের আলমারী; টুল-মোড়া; পড়ার টেবিল, কুঁজোর স্ট্যাণ্ড; রং চটা আবছা-আবছা পারিবারিক ছবির গাদা আর সিলিং থেকে ঝোলানো লেপ-তোষকের পাহাড়···আসবাবের জঙ্গলে মানুষের ঢোকা বারণ হয়ে পড়ে। একটু নজর করলেই দেখতে পাবেন এর শতকরা সত্তর ভাগ জিনিসই অকেজো। বছরে দুবার কাজে লাগানো হয় কিনা সন্দেহ। খোকা সামনের বছর কলেজে ঢুকবে; তার দোলনা আর প্যারাম্বুলেটার কিম্বা তিনচাকার সাইকেলটা 'নাতি চড়বে' এই আশায় ঘর জোড়া করে রেখে দেওয়াটা বাতুলতা। খোকার ঠাকুমা চলে যাওয়ার পর থেকে জলচৌকি, রামায়ণের স্ট্যাণ্ড আর কম্বলের আসনটা, ভেবে দেখুন, কেউ কাজে লাগান নি। রান্নাঘরের সামনের কালি লবীটুকুতে একটা কাঠের লফ্‌ট (Loft) বা মেজেনিন্ (Mezzanine) করে লেপ-তোষকগুলো তাতে রাখলে থাকেও ভাল আর আপনিও রেহাই পান আরশোলার হাত থেকে। ছবিগুলি খুলে একটা অ্যালবামে সেঁটে রাখলে ছবিগুলোও ভাল থাকবে—মাকড়সার জালে দেয়ালও নোংরা হবে না।

মোদ্দা কথা—দরকারের বেশী আসবাব ঘরে একটিও রাখবেন না। শোবার ঘরে আল্‌না যদি রাখতেই হয়, তাকে রাখুন চোখের আড়ালে। —হয় আলমারী, না হয় পর্দার পেছনে। ওই ছোট্ট আড়ালটুকু শ্রীমতীর কাপড় বদলানোর কাজেও লাগবে। সম্ভব হলে নীচু হাল্‌কা খাট ব্যবহার

করুন। জনাপ্রতি সাড়ে ছ'ফুট × আড়াই ফুট শোবার জায়গা যথেষ্ট। সম্ভব না হলে সাবেকি খাটজোড়া, পায়া কেটে নিচু করিয়ে নিন। একটু ভেবে-চিন্তে দেখলেই দেখবেন অনেক অযথা অলংকরণ রয়েছে খাটে যা যে-কোন কাঠের মিস্ত্রিই খুলে দিতে পারবে। এই অলংকারগুলো সাধারণতঃ আলগা টুকরো কাঠে খোদাই করে আসবাবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত। এগুলো খুলে নিয়ে নতুন করে একদফা পালিশ করে নেওয়া দরকার। সাবেকী আলমারী ও টেবিলের বেলাও এই রীতি (১১.১ নকশা)।
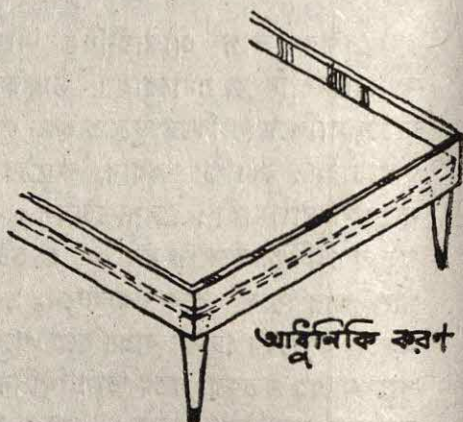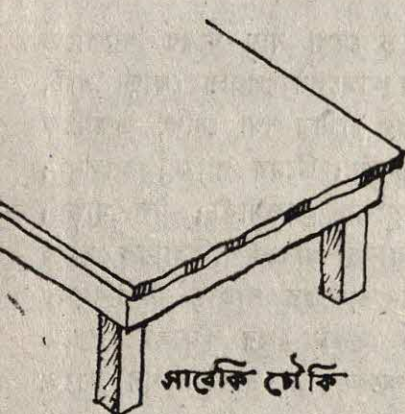
১১.১—চৌকির ধার সমান করে টিক প্লাইয়ের পট্টি লাগান চার পাশে, এর মধ্যে বসবে ডানলো-পিলোর কুশান। পুরানো পায়ার বদলে লাগান আধুনিক ট্যাপারিং পায়া।

আলমারীর বলের মত পায়া আর মাথার মোটিফ্ খুলে, প্যানেল পাল্লার উপর টিকপ্লাই সেঁটে এবং পুরোনো আমলের হ্যাণ্ডেলের বদলে হাল ফ্যাশানের হ্যাণ্ডেল লাগিয়ে পুরো আলমারীটার চেহারা একেবারে নতুন করে ফেলা যায়। সেই অনুপাতে টেবিলের রূপ বদলানো শক্ত। টার্নিং করা পায়াগুলো নিয়ে মুশকিল দেখা দেয়। বদলাতে হলে সেগুলো কেটে ফেলে পেতলের জুতো (shoe) পরানো ছুঁচলো কাঠের পায়া বা রবারের জুতো পরানো চৌকো লোহার (square bar) পায়া লাগাতে হয়। এটা কিন্তু খানিকটা খরচের ভেতর ফেলবে।

একটা দিকে নজর রাখতে হবে। একটা ঘরে আসবাব সব একরকম হওয়া দরকার। মানে যে ঘরে কাঠের পালিশ করা আসবাব—সে ঘরে লোহার, বেতের বা কাঠের রং-করা ফার্নিচার রাখলে তা বেমানান হবে।

আমার এক গায়ক বাস্তুবিদ বন্ধুকে দেখেছিলাম হাল্কা নীল রং করা বেতের আসবাব দিয়ে শোবার ঘর সাজাতে। বেতের একটি ডবল বেডের খাট, ছুটি ইজি চেয়ার, একটি সেন্টার টেবিল, আর একটি সাইড বোর্ডের সঙ্গে অর্ডার দিয়ে করানো গোটা চারেক বেতের পর্দার পেলমেট (যা দিয়ে পর্দার রড ঢেকে রাখা হয়) দিয়ে এক অপূর্ব বাতাবরণ হয়েছিল। আসবাবের নীল রং-এর প্রতিফলন করা হয়েছিল ঘরের দেয়ালগুলো নীল রং করে। এই সঙ্গে হয়তো যোগ করা যেত একটি বেতের ঝোলা যার মধ্যে দেওয়ালে ঝোলানো যায় কাঁচের শিশি, যা থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া যেত একটি মানি প্লান্ট (Money plant)। মানি প্লান্টের সবুজকে টেনে আনা যেত সবুজ রং-এর পর্দা, বিছানার সুজনী আর কুশান কভার তৈরী করে।

বসার ঘরেও বেতের পরিকল্পনা করা যায়। তবে তার রং সাদা বা বিস্কুটের মত হাল্‌কা বাদামী হওয়াই উচিত। খাবার জায়গা আর বসবার জায়গার মধ্যে বেতের পার্টিশানও সম্ভব। বারান্দায় বেতের আসবাবের ব্যবহার তো আগে থেকেই চলে আসছে। বেতের আসবাব হাল্কা ও মজবুত হয়। বহুদিন টেকে, জলে-রোদে পচে না এবং কাঠের আসবাবের চার ভাগ সস্তা।

সাধারণ আলমারীগুলো হয় ৬ ফুট থেকে সাড়ে ৬ ফুট উঁচু। আর এক ধরনের বেঁটে আলমারী হয় যার উচ্চতা সোয়া চার সাড়ে চার ফুটের বেশী নয়। ঘর সাজানোয় এগুলি বেশী উপযোগী। এগুলিকে পার্টিশান হিসাবেও কাজে লাগানো যায়। এই সব আলমারীর উপর রাখা একজোড়া ফুলদানী বা একটি টেবিল-বাতি ঘরের শোভা বাড়ায়। ঘরে একাধিক লম্বা আলমারী রাখতে হলে একটা দেয়াল বেছে নেওয়া দরকার যাতে জানালা বা দরকারী কোন দরজা নেই। এই দেয়ালের গায়ে পর পর সাজিয়ে রাখলে আলমারীগুলি বিল্ট-ইন্ কাপ্‌বোর্ডের (built-in cupboards) রূপ নেয়। এই ধরনের দেয়ালকে ইংরাজীতে storage wall বলা হয়। এইভাবে আলমারী সাজালে অন্ততঃ চোখের নজরে ঘরের জায়গা মার যায় না, আলমারীগুলিও বেখাপ্পা মনে হয় না।

● **রং-এর ভেলকি!**

ঘর-সাজানোর বিষয়ে আসবাবের পরই যে কথাটা মনে আসে তা হল রং...ঘরে, দেয়ালে, পর্দায়, ফারনিশিং এবং ফারনিচারে। কেবল সঠিক

রং-এর নির্বাচনেই ঘরের ভোল একেবারে পাল্টে দেওয়া যায়। অবশ্য রং বাছাই করা বেশ শক্ত। কোন্ রং-এর সঙ্গে কোন্ রং মানাবে তার একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার। কতটা আলো কোন্ দিক দিয়ে আসে তার উপরেও খানিকটা নির্ভর করে রং-এর নির্বাচন। এছাড়া শোবার ঘর, খাবার ঘর, বসার ঘর বা পড়ার ঘর—কোন্ ঘর কোন্ কাজে লাগে সে হিসেবেও রং-এর অদলবদল হয়। এক একটা রং, যেমন নীল—শুধু ছায়াতে ব্যবহার করা চলে। সোজাসুজি রোদ পড়লে নীল রং জ্বলে যাবে। সব দিক বিচার করে রং নির্বাচন করলে তবেই তার যাদুকরী শক্তি ফুটে ওঠে। সাধারণ মানুষের এতটা বিচার ও চিন্তা করার অবসর কোথায়?

তাই এখানে রং-এর রূপ ও রস সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আলোচনা করে বিভিন্ন ঘরের দু-একটা নির্দিষ্ট স্কীম করে দেওয়া হল। এই স্কীম অনুযায়ী রং করলে তা সাধারণভাবে সফলই হবে।

রামধনুর তাবৎ রংকে দুভাগে ভাগ করা যায়—চড়া রং (যেমন লাল, হলদে, কমলা, গাঢ় গোলাপী), আর ঠাণ্ডা রং (যেমন নীল, সবুজ, মভ, হাল্কা গোলাপী)। এ ছাড়া, আর এক ভাবেও ভাগ করা যায়—'শেড' (shade) হিসাবে। যে কোন রং-এর ফিকে বা লাইট (light) শেড ও গাঢ় বা ডার্ক (dark) শেড হতে পারে। এই সব রং ও শেডের আলাদা আলাদা গুণাগুণ আছে। সে সবের গভীরে না গিয়ে সাধারণভাবে বলা চলে:

(ক) চড়া রং মনে চঞ্চলতা আনে। লাল রং মানুষের কাজের ইচ্ছা বাড়িয়ে তোলে। হলদে মনে আনে খুশীর জোয়ার। কমলা রং উদ্দীপক। এদের বলা চলে 'কাজের রং'।

(খ) ঠাণ্ডা রং মানুষকে শান্ত করে। নীল ও কচি কলাপাতা শ্রান্ত মনকে সজীব করে তোলে। আকাশী রং বা মুক্তোর রং শান্তি আনে। গাঢ় সবুজ ও গাঢ় নীল ঘুমের সহায়ক। এদের বলা চলে বিশ্রামের রং।

(গ) গাঢ় শেডে ঘর ছোট দেখায়। পুরোনো আমলের বিরাট ঘর, খুব উঁচু ছাদ থাকলে—দূরের দেওয়াল বা সিলিংয়ে গাঢ় রং লাগানো হয়—ঘরটা আনুপাতিক ভাবে ছোট বা নীচু দেখাবে বলে।

জান
পেনি

নীল
সাদা

পার্দার
মাটি (

(ঘ) ফিকে শেডে ঘর বড় দেখায়। ফ্ল্যাটের ছোট ঘরে ফিকে শেড ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

এছাড়া হলুদ, সাদা, গোলাপী রং লাগালে ঘরে আলো বেড়ে যায়। অন্ধকার ঘর—যেখানে রোদের আলো বিশেষ ঢুকতে পায় না বা করিডোর কিম্বা সিঁড়ি, যেখানে আলো কম হলে দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব সেখানে এই সব রং দেওয়া দরকার। রং-এর পরিকল্পনা করতে হলেই কথা উঠবে একটা ঘরে কটা রং দেওয়া হবে। রং নিয়ে খেলতে জানলে তিনটে অবধি রং নিয়ে খেলা যায়। কোন্ রং-টা কতটা অবধি জায়গা জুড়ে হবে তা ঠিক করতে বিশেষ অভিজ্ঞতার দরকার যা বাস্তুবিদ বা ইন্টিরিয়ার ডেকরেটার বিনা সম্ভব নয়।

বাড়ীর কর্তা বা গিন্নী যেখানে নিজেই কাজ করছেন ডিজাইনার হিসাবে সেখানে একটার বেশী রং নিয়ে কাজ করা বিপজ্জনক। সাদা ও যেকোন একটি রং নিয়ে খুবই চমৎকার স্কীম করা যায়। প্রয়োজন হলে এই একই রং-এর ২।৩টি শেড ব্যবহার করা চলে। তবে সাদাটাকে খাঁটি সাদাই রাখতে হবে। লেখক বাটার একটি সিনেমা হলে কেবল মাত্র নীল রং-এর এগারোটি শেড (ব্লু-ব্ল্যাক থেকে হাল্কা আকাশী রং) দিয়ে যে colour scheme করেছিল…তা বহু লোকের মন কেড়েছিল। সাদা ও এক রং-এর স্কীমকে ইংরেজীতে বলে 'মনোক্রোম্যাটিক' বা একরঙা। একরঙা স্কীমে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এর মধ্যে শিল্পীসুলভ সংযত ভাব অনেক বেশী বলে শিল্প হিসাবে বেশী দামী।

বসবার ও শোবার ঘরের দুটি একরঙা পরিকল্পনা দিয়ে রং-এর খেলা এখানেই শেষ।

বসবার ঘর : বসবার আসন সোফাতেই হোক বা ফরাসেই হোক—পিছনের দিকের দেয়ালটি (এই দেয়ালে জানালা না থাকাই ভালো) এবং সিলিং (সিলিং ফ্যান থাকলে সেটিকে একই রং করবেন) হাল্কা গেরুয়া রং করুন। বাকি তিনটি দেয়াল থাকবে সাদা। পর্দা, কুশন, তাকিয়া, সোফা বা ফরাসের কাপড় বাদামী রং-এর হোক। তাতে ছাপা বা সুতোর কাজ থাকলে তা সাদা ও কালো মেশানো হওয়া উচিত। পেলমেট ও ফার্নিচারের কাঠের অংশগুলি হবে পালিশ করা 'ট্যান' বা চকোলেট রং-এর। গেরুয়া দেয়ালের উপর একটি বড় (২ফুট × ৪ফুট) সাইজের অয়েল পেন্টিং থাকবে সাদা ফ্রেমে। নজর করে কিনবেন বা আঁকবেন

—পেন্টিংটিতে যেন খয়েরী ও সবুজ রং-এর আধিক্য থাকে। অল্প হলদে বা লাল রং থাকলেও ক্ষতি নেই। আঁকার বদলে যদি ফটো টাঙাতে চান—বেছে নিন ৩।৪ খানা ল্যাণ্ডস্কেপ অথবা ৩।৪ খানা পোট্রেট। ১০×১২ ইঞ্চি সাইজের সিপিয়াটোনে এন্‌লার্জ করান। কাছাকাছি রেখে টাঙিয়ে দিন সাদা ফ্রেমে বাঁধিয়ে ওই গেরুয়া দেয়ালের মাঝখানে। ফরাস থাকলে যাতে দেয়ালে মাথার তেল না লাগে আড়াই ফুট চওড়া করে শীতল পাটি বা মাত্বর কেটে আড়াআড়ি ভাবে দেয়ালে আটকে দিন পাতলা কাঠের বিড দিয়ে। শীতল পাটির প্যানেল দেখতে সুন্দর লাগবে (১১.২ নং নকশা দ্রষ্টব্য)। ইচ্ছে করলে গেরুয়া রং-এর বদলে পুরো দেওয়াল জুড়ে শীতল পাটির প্যানেল লাগিয়ে সুতো দিয়ে তা থেকে ঝুলিয়ে দিন হরেক রকম পুতুল, যেমন গাড়ীর সামনের কাঁচের পেছনে অনেকে ঝোলান। শীতল পাটির দুপাশের দেয়াল গেরুয়া করতে পারেন। সামনের দেয়াল আর সিলিং থাকবে সাদা। দরজা ও জানালা সাদা হওয়া উচিত। গ্রীল গেরুয়া। কারপেট যদি পাতেনই তবে সেটার রং হবে লাল। ঘরের এক কোণে একটি ব্রাউন টবে লাগান মানি প্লান্ট। বাজি রেখে বলতে পারি, অতিথিদের তারিফে আপনার মন ভরে উঠবেই।

শোবার ঘর ঃ খাটের যেদিকে মাথা (এই দেয়ালে জানালা না থাকাই উচিত) সেই দেয়াল ও সিলিং করুন মাঝারী শেডের নীল। বাকি তিনটি দেয়াল খুব ফিকে নীল। ঘরের আসবাব যদি রং করা হয় তবে তাও রং করুন নীল মাঝারী শেডে। আর পালিশ করা হলে পালিশ মিস্ত্রিকে বলুন—যতটা সম্ভব সাদা করে পালিশ করতে। পর্দা, বিছানার চাদর, বালিশের ঢাকা, ড্রেসিং টেবিলের কভার ও টেবিল-বাতির শেড হবে গাঢ় নীল। মাথার দেয়ালে ঝোলানো থাকবে একটা পেন্টিং যাতে নীল, সবুজ, কালো রং থাকে বেশী। জ্যোৎস্না রাতের ল্যাণ্ডস্কেপ পাওয়া যায় কিনতে। তাই লাগান। নীল, সবুজ, কালো রং আপনি হয়ে যাবে। ফ্রেম অবশ্যই সাদা।

ফটো টাঙাতে হলে রঙিন সমুদ্রের ছবি (Sea scape) টাঙান। ঘরের এক কোণে নীল চাদরে ঢাকা টুলে বা বাক্সের উপর একটা সাদা পাথরের মূর্তি রাখুন। কার্পেট রাখতে চাইলে তার রং হবে গাঢ় নীল—চলতি ভাষায় যাকে বলা হয় নেভি-ব্লু। এমন ঘর যদি বানিয়ে দিতে পারেন দেখবেন ঘরের মানুষটি ঘর ছেড়ে বেরুতেই চাইছেন না।

● **আলোর মেলা**

ঘর সাজানোর তিন নম্বর পয়েন্ট আলো। আলো ফেলার নিয়ম মাফিক কায়দা দু'রকম: (১) সরাসরি বা ডিরেক্ট লাইটিং বা স্পট্, (২) ঢাকা আলো বা ইন্‌ডিরেক্ট লাইটিং।

কথা হচ্ছে কোথায় কোন্ কায়দা ধরবেন। এরও বাঁধাধরা কোন ফরমুলা নেই। তবে সদর দরজায়, সিঁড়িতে, খাবার টেবিলে, রান্নাঘরে (রান্নার টেবিলের উপর), বাথরুমের বেসিনে, পড়ার টেবিলে, ড্রেসিং রুমের আয়নায়, ঘরের কোণে যেখানে স্ট্যাচু বা গাছ-গাছালী (মানি প্লান্ট, ক্যাকটাস্ বা ফার্ন) আছে সেখানে টেবিল-বাতি, স্ট্যাণ্ড-বাতি বা দেওয়ালে আটকানো আলো থেকে স্পট্ লাইট থাকা দরকার। মানি প্লান্ট বা মূর্তির পেছন থেকে আলো দিলে সুন্দর দেখায়। আলোটা মূর্তির দিকে না ফেলে পেছনের দেয়ালে ফেলা উচিত। যাতে গাছ বা মূর্তিটি শিলুয়েটে দেখা যায়।

বিশ্রামের জায়গা, যেমন শোবার ঘর (বেডসাইড-বাতি ছাড়া) ইন্‌ডিরেক্ট আলো করা উচিত এমন ভাবে যে, বাল্বটা দেখা যাবে না। আলো দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে। মূর্তির পেছনে আলো দিলে তা এক সঙ্গে মূর্তির স্পট্ হিসেবে এবং সাধারণ ভাবে ঘরের ইন্‌ডিরেক্ট আলো হিসাবেও কাজ করবে। এক নাইট ল্যাম্প ছাড়া রঙিন আলো না লাগানোই যুক্তিযুক্ত। টিউব লাইট পেলমেটের আড়ালে লাগিয়ে ইন্‌ডিরেক্ট করা যায়। ছাদ থেকে ঝোলানো বাল্বে জাপানী লণ্ঠন লাগালেও ইন্‌ডিরেক্ট আলোর কাজ হবে। তবে ছাদ থেকে ঝোলানো আলোর চল উঠে যাচ্ছে। পুতুলের আলমারী থাকলে তার পাল্লার ভিতর দিকে মুখ করে আলো ফিট করা যায়। তাতে একাধারে পুতুলের স্পট্ ও ঘরের ইন্‌ডিরেক্ট আলোর কাজ চলে। আলোর সম্বন্ধে নানান নতুন ধরনের আইডিয়া পেতে হলে, পুজোর প্যাণ্ডেলের আলোক-সজ্জার দিকে একটু নজর করে দেখুন। আপনার বাড়ীতে করবার মত আইডিয়া পাবেন শ'য়ে শ'য়ে।

● **পকেট খালি করবেন না!**

ঘর সাজানোর যেটা সবচেয়ে বাধা, অন্ততঃ বেশীর ভাগ মানুষ যাকে সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে করে তা হচ্ছে খরচ। কাজেই ঘর সাজানোর

বিত্তাকে সার্বজনীন করতে হলে হাতে-কলমে দেখাতেই হবে কি ভাবে খুব কম খরচেও ঘর সাজানো যায় সুচারুভাবে।

পেন্টিং বা ফটো যাই বলুন কিম্বা দেয়ালের রং করাই বলুন—নিজে হাতে করার মধ্যে আছে অদ্ভুত এক আনন্দ। আর সেই সঙ্গে কাজটি হবে আধা খরচে। একটু চেষ্টা করলেই নানারকম হাতের কাজ নিজে নিজে করা যায়, যেমন :

(ক) বাতির বা টেবিল-ল্যাম্পের শেড। খাদির দোকানে হাতে তৈরী মোটা কাগজ পাওয়া যায় সুন্দর সুন্দর রং আর ডিজাইনের। দাম সিট প্রতি দু'টাকা থেকে আড়াই টাকা। তারের তৈরী নানান সাইজের ফ্রেম বা খাঁচা পাওয়া যায় নিউমার্কেট অঞ্চলে। এই দুয়ের সহযোগে তৈরী করা যায় চাহিদা অনুযায়ী রং-বেরং-এর আলোর শেড।

(খ) ঘর সাজাবার ছোট ছোট রঙিন পুতুল। এগুলি তৈরী হতে পারে খড়, প্লাস্টিসিন, বালসা কাঠ, প্লাস্টার অব্ প্যারিস ইত্যাদি নানা জিনিসে। এর ভেতর খড় ছাড়া বাকিগুলি পাওয়া যাবে India's Hobby Center-এ।

(গ) সদর দরজার নকশা। সদর দরজার প্যানেলগুলি কালো বা চকলেট রং করে তার উপর সাদা তেল রং দিয়ে আলপনা দিলে খুব সুন্দর দেখাবে। সাদা রং-এর বদলে সাদা শোলার যে চাঁদমালা পাওয়া যায় তাও সেঁটে দেওয়া যায় অ্যারাল্‌-ডাইট্‌ বা কুইক্‌-ফিক্‌স্‌ দিয়ে।

(ঘ) জানালা দরজার পর্দা, বেড কভার, টেবিল ক্লথ—পুরোনো কাপড়ে সুতোর কাজ করে কিংবা ফেব্রিক পেন্ট দিয়ে সুন্দর সুন্দর মোটিফ আঁকা যায়। ড্রাগন, ফুলের ঝুড়ি, গাছ, পাহাড়, নদী, বাঁকুড়ার ঘোড়া, আলপনার অনেক আধুনিক মোটিফ দিয়ে ঘর সাজিয়ে তোলা যায়। মোটা গাঢ় রং-এর কাপড়ে সাদা বা হলদে রং-এর মোটিফ সবচেয়ে ভাল দেখায়। হাল্কা রং-এর কাপড়ে মোটিফ বেছে নেওয়া উচিত চড়া গাঢ় রং-এর।

(ঙ) মডেলিং—উপাদান : মাটি, কাঠ, প্লাস্টিসিন, প্লাস্টার অব প্যারিস, মোম, সাবান ইত্যাদি। বাড়ীঘরের মডেল থেকে শুরু করে ছোটখাট মানুষ, পশুর মূর্তি সব কিছুই গড়া যায়। রং করতে

গেলে পোস্টার কালার সবচেয়ে ভাল। তার উপর ঘামতেল জাতীয় স্বচ্ছ বার্নিশ লাগিয়ে নিলে আরো বেশী খোলতাই হবে। কার্ডবোর্ড বা সাদা কাগজের অরিগ্যামি খুব গাঢ় নীল বা লাল ব্যাকগ্রাউণ্ডে স্পট্ লাইট দিয়ে সাজালে খুব চমৎকার লাগে। পুতুল খড়, রঙিন কাগজের বা কাপড়ের টুকরো, পুঁতি ইত্যাদি দিয়েও তৈরী করা যায়। মাটির ঘট কিনে রং করে নিলে তা খুব সুন্দর ফুলদানীর রূপ নেয়।

(চ) ফুল সাজানো বা ইকেবানা—ইকেবানা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প। কম কথায় তা শেখানো অসম্ভব। তবে এই ধরনের ফুল সাজানোয় যাদের হাত আছে, তাঁরা তাঁদের এই গুণকে কাজে লাগিয়ে সাজানো ঘরে অতুলনীয় পরিবেশের জন্ম দিতে পারেন।

এইভাবে নিজেদের পারিবারিক গুণাগুণগুলি কাজে লাগিয়ে খুব কম খরচে ঘর সাজানো সম্ভব। সব গুণগুলিই সব পরিবারে থাকবে না। যে গুণগুলি আছে, তার থেকে ঘর সাজানোয় কি সাহায্য হতে পারে, আগে তার একটা লিস্ট করুন। তারপর একটা পরিকল্পনা তৈরী করুন ঘর সাজানোর ; কোথায় কি রং হবে, কোন্ আসবাব থাকবে, আলো কেমন হবে, ডেকরেশন কি ভাবে হবে। তারপর এই পরিকল্পনা ধরে কাজে এগোন। শুরু করুন দেয়াল রং করা দিয়ে। একটা ঘর শেষ করে হাত দিন অপরটিতে। বসার ঘর দিয়ে শুরু করাই ভাল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে দেখবেন আপনার বাড়ী হয়ে উঠেছে শিল্পীর বাড়ী অথচ খরচ হয়েছে যৎসামান্য, যা আপনি প্রায় বুঝতেই পারেন নি।

এই প্রসঙ্গে একটি সুখবর দি। উইমেনস প্রফেসনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ৬, সৈয়দ আমীর আলী অ্যাভিন্যু, কলকাতা-১৭, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সাথে ঘর সাজানোর ব্যাপারেও এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চালান। মূলতঃ এটি গ্র্যাজুয়েট মহিলাদের জন্য হলেও গ্র্যাজুয়েট পুরুষদের পড়তে কোন বাধা নেই। কোর্সটির ইদানীং বেশ সুনাম হয়েছে। যাঁরা এক বছরের বেসিক কোর্সটি শেষ করে কোন বিশেষ বিষয়ে, যেমন আসবাব-তৈরী, ল্যাণ্ডস্কেপ ও গার্ডেন ডিজাইন, বিল্ডিং স্ট্রাকচার ও এস্টিমেট ইত্যাদিতে আলাদা আলাদা মডিয়ুলে ৩ মাসের এডভান্স ট্রেনিং নিতে পারেন। এই সব লাইনকে যাঁরা জীবিকা হিসাবে নিতে চান তাঁদের পক্ষে অ্যাডভান্স কোর্সের মডিয়ুলগুলি খুবই কার্যকরী।

প্রত্যেক মডিয়ুলের জন্য ডাবলু. পি. টি. আই আলাদা আলাদা সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। বছরে দুটি ব্যাচে ছাত্র ভর্তি করা হয় বেসিক কোর্সে—একবার মে মাসে ও একবার সেপ্টেম্বর মাসে। অ্যাডভান্সে ভর্তি হওয়ার সময় অক্টোবরে।

● **কি করবেন না !**

এ কয় পাতা আলোচনা হল কি করবেন বা কি করলে ঘরদোর সুন্দর হয়ে উঠবে। এর সবকিছুই যে সবাই করতে পারবেন তা নয়। কিন্তু করণীয়গুলি করুন বা না করুন—প্রায় সব বাঙালী পরিবারেই কিছু বদভ্যাস আছে—যেগুলি এড়াতে পারলে বাড়ী সুন্দর না হোক, ছিমছাম হয়ে উঠবেই। যেমন,

(১) ঘরে একটির বেশী ক্যালেণ্ডার রাখবেন না। ক্যালেণ্ডারটি সুরুচিপূর্ণ হওয়া দরকার। আগের আগের বছরের ক্যালেণ্ডারগুলি তলায় জমিয়ে রাখবেন না।

(২) যেখানে সেখানে ফটো টাঙাবেন না। ইচ্ছে করলে বাড়ীর একটি বাছাই করা গাঢ় রং-এর দেয়ালে একটি ফটো গ্যালারী গড়ে তুলতে পারেন। ফটো বা পেন্টিং যাতে বেঁকে না থাকে, সেদিকে নজর রাখুন।

(৩) ঘরের ভেতর রেডিওর এরিয়াল টাঙাবেন না। ধুলোর ভয়ে রেডিওর উপর কাপড়ের ঢাকনা চাপাবেন না। রেডিওর ল্যাকার পালিশ যথেষ্ট টেকসই। ধুলো জমলে তা পালকের ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে ফেলুন।

(৪) কয়লার উনুনে রান্না করবেন না। গ্যাসের আগুনে বা ইলেক-ট্রিক চুল্লীতে রান্না করলে ঘরে কালিঝুলি কম হয়।।

(৫) "মাকড় মারলে ধোকড় হয়"-জাতীয় পল্লী প্রবাদে বিশ্বাস করবেন না। ঘরের ঝুল ঝেড়ে পোকা-মাকড় তাড়িয়ে দিন।

(৬) ফুলদানীতে নিত্যনতুন ফুল আমদানি করুন বা নাই করুন, পুরোনো বাসি ফুলের শুকনো ডালপালা জমিয়ে রাখবেন না।

(৭) মোজাইক মেঝেতে wax বা মোম পালিশ করবেন না। মোজাইকের পালিশ সব চেয়ে ভাল থাকে জলে ভেজানো কাপড় দিয়ে বার বার মুছলে।

(৮) রেফ্রিজারেটার বা বরফ-মেসিন বসার ঘরে রাখবেন না। লোকে এটাকে কুরুচিপূর্ণ প্রদর্শনবাদ বলে ভাবে। সম্ভব হলে রান্নাঘরে রাখুন।

(৯) আলোর ঢাকা শেডে মরা পোকা জমিয়ে রাখবেন না। নভেম্বর মাসে একবার করে শেড পরিষ্কার করে ফেলুন।

(১০) বাথরুমে শ্যাওলা জমতে দেবেন না। বাথরুমে পিছলে পড়ে হাত-পা ভাঙা লোক, রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়া লোকের থেকে গুনতিতে কিছু কম নয়।

(১১) সদর দরজার দুধারে জুতোর এক্‌জিবিশন্ খুলবেন না। পাল্লা বা পর্দায় ঢাকা ছোট আলমারীতে কিম্বা আলনার তলায় জুতো রাখার জায়গায় জুতো রাখুন।

(১২) নেহাতই যদি ঘরে কাপড় শুকোতে হয়, শুকনো কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে দড়ি বা তার খুলে ফেলুন।

(১৩) দেয়ালে পেরেক মেরে মশারী টাঙ্গাবেন না। কাঠের পোস্টার বা ছত্রী লাগান। যথা-তথা অযথা পেরেক মারা কুরুচির পরিচয়।

(১৪) ধুলোর ভয়ে চব্বিশ ঘণ্টা জানালা-দরজা বন্ধ রাখবেন না। ঘরে হাওয়া খেলতে দিলে ড্যাম্প ও নোনার সম্ভাবনা কমে যায়।

(১৫) পুরোনো কাগজ, পাঁজী, সস্তা ম্যাগাজিন, শেষ হয়ে যাওয়া নোট বই, ডায়রী, খালি শিশি-বোতল, ছেঁড়া জুতো, পুরোনো ক্যালেণ্ডারের বা বাজে চিঠির বাণ্ডিল, ভাঙা স্টোভ, ঘড়ি, রেডিও, খেলনা, অকেজো মোটর পার্টস বা পচা টায়ার-টিউব, শাড়ি, জামা বা জুতোর খালি বাক্স, ফিউজ বাল্ব, ভাঙা কাপ, ডিশ, গেলাস, বাসন, ছেঁড়া জামা-ব্লাউজ, পূজোর বাসী ফুল, বেলপাতা—এক-কথায় যেসব জিনিসের আর কোন দরকার আপনার নেই, সে সব জিনিস জমিয়ে আবর্জনা বাড়াবেন না। আপনার বাড়ী বা ফ্ল্যাটের নকশা করার সময় বাস্তুবিদ এসবের জন্য কোন জায়গা রাখেন নি।

(১৬) ঘরে পোড়া সিগারেট, বিড়ি, দেশলাই-এর কাঠি ছড়াবেন না। হাতের কাছে ছাইদানি রাখুন।

(১৭) ঘরে পিন-আপ টাঙাবেন না। আপনি ইয়াংকি নন।

(১৮) বাইরে কাদা মাড়িয়ে ঘরে ছাপ ফেলবেন না। সদর দরজার কোলে একটা পা-পোষ রাখুন।

(১৯) রান্নাঘর ছাড়া অন্য ঘরে রান্না বা কুটনো কোটার কাজ করবেন না।

(২০) ছাদে কুকুর বাঁধবেন না বা মাটি ফেলে বাগান করবেন না।

(২১) ঘর সাজানোর ব্যাপারে আপনার আর্থিক শক্তির বাইরে যাবেন না। ওতে উল্টো ফল হতে পারে।

(২২) শেষ কথা, ঘরের সাথে সাথে বাইরের পরিবেশটাকে সাজান। ছোট্ট কিন্তু সাজানো বাগান, দেখবেন আপনার বাড়ীকেও সরস করে তুলবে...

১২
সবুজ বিপ্লব

বাড়ীর সঙ্গে বাগানের একটা নিবিড় যোগ আছে। তা সে রাজবাড়ীর হাজার-একরী বাগানই হোক, আর গরীবের খোড়ো কুটিরের আঙিনায় শিউলী কি বেল ফুলের চারাই হোক। লাগোয়া বাগান শুধু বাড়ীকে সুন্দরই করে তোলে না, চার পাশের ধুলোবালি আটকে, ঠাণ্ডা রেখে ও বাতাস শোধন করে, মিষ্টি গন্ধ ও ছায়া ছড়িয়ে একটা স্নিগ্ধ পরিবেশও গড়ে তোলে। তাই বাড়ীর লাগোয়া বাগানের এত চাহিদা!

● **বাগিচার ছক**

বাড়ীর মত আপনার বাগানেরও একটা মানানসই নকশা তৈরি করে নিন। আর সেই নকশা মাফিক গাছগাছালী কিনে বাগানে লাগান। ১২. ১, ১২. ২, ১২. ৩ নং নকশা তিনটি ছোট বাড়ীর লাগোয়া বাগিচার পরিকল্পনা-উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হল ঃ নকশা তৈরীর সময় যে যে বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তা হল—

(১) ছোট গাছ বা ফুলের ঝোপ (যেমন রজনীগন্ধা, গোলাপ, বেলফুল) থাকবে একেবারে বাড়ীর কাছে ঘাস-চত্বরে বা লনের তিন পাশে। তার পেছনে থাকবে মাঝারী সাইজের গাছ (যেমন শিউলী, টগর, কল্কে ফুল, কাঠ চাঁপা)। তার পেছনে, একেবারে জমির সীমানা বরাবর বড় গাছ (যেমন—স্বর্ণ চাঁপা, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ)। এতে করে কোন গাছ পেছনের গাছকে আড়াল করবে না। ঘরের জানালা বা দাওয়াতে বসে বসে পুরো বাগান উপভোগ করতে পারবেন। বাড়ীতে রোদ-বাতাসেরও কমতি হবে না।

(২) বাগান তিন রকম—ফুল, ফল ও সবজি। এদের মেশানো ঠিক হবে না। সাধারণতঃ বাড়ীর সামনেটা ফুলের বাগান, পেছনে সবজি বাগান, লাগোয়া কিন্তু খানিকটা দূরের খালি জমি বা
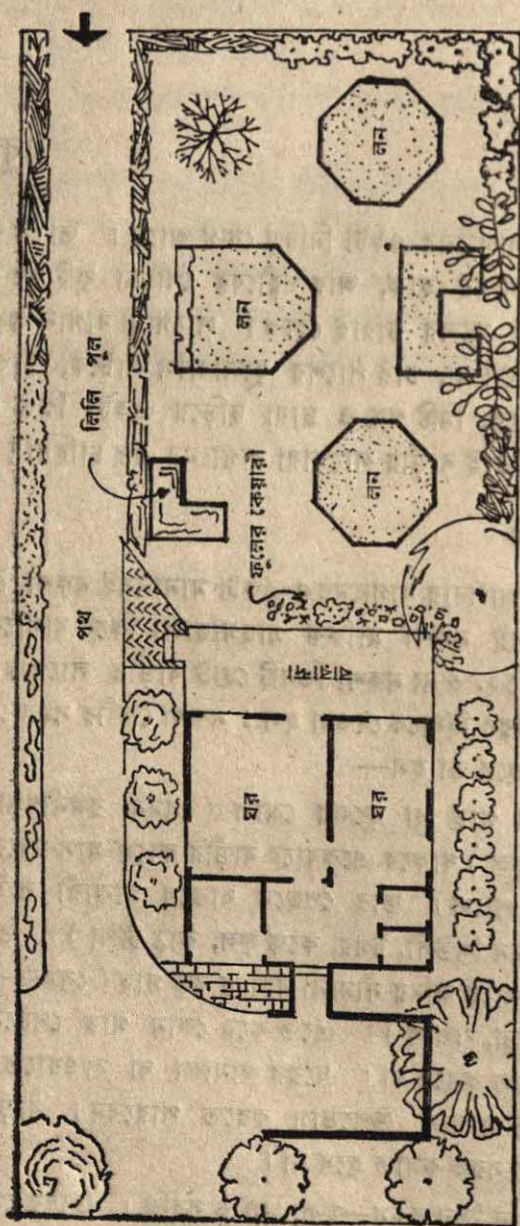
১২.১—বাগানের নকশা
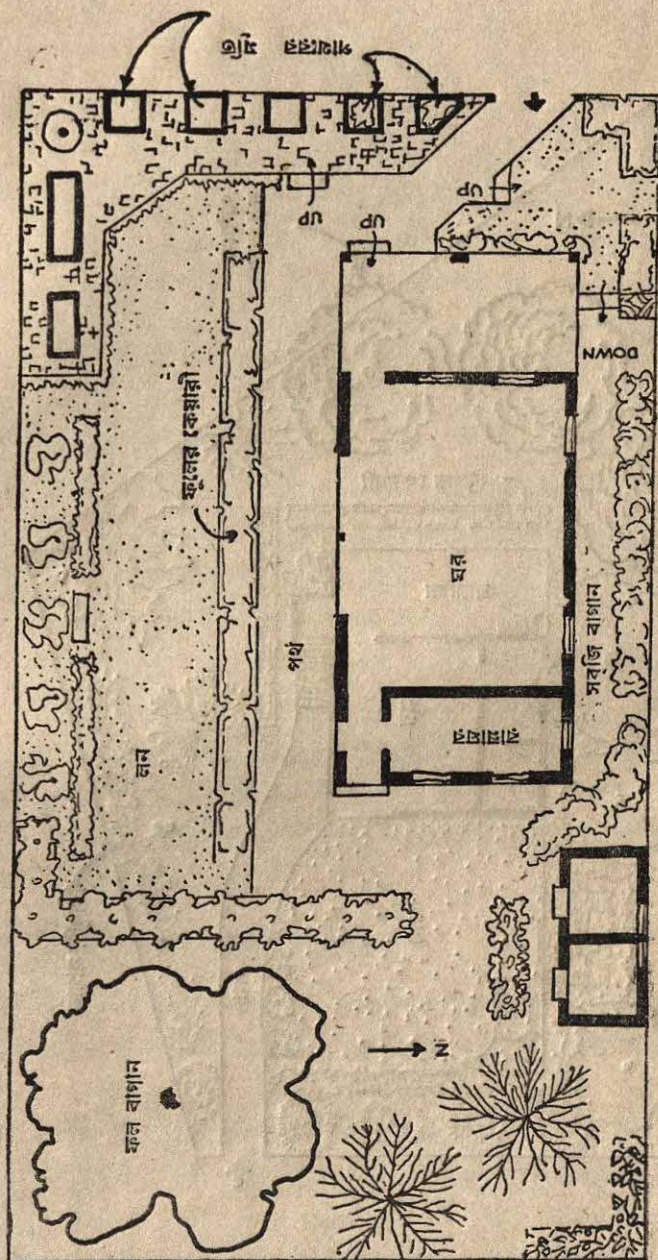
১২.২—বাগানের নকশা

১২.৩—বাগানের নকশা
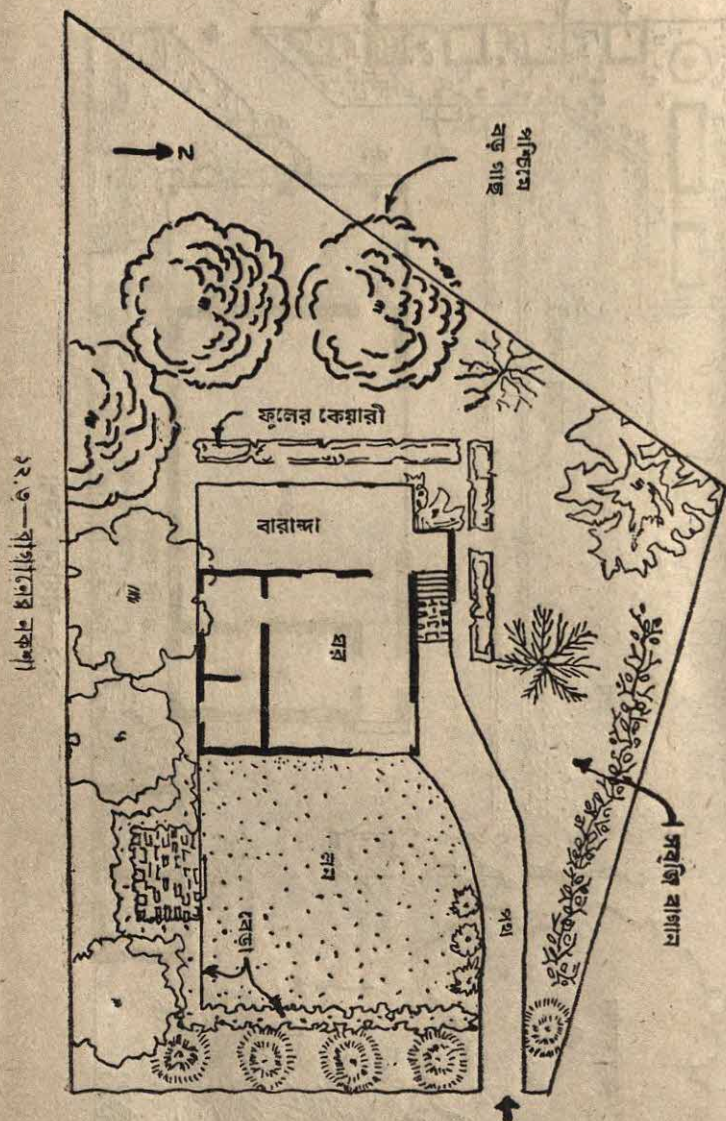
পুকুর পাড়ে ফলবাগান করা হয়। দরকার মত এর রকমফের হতে পারে। তবে ফল-ফুল-সব্‌জি একসঙ্গে চাষ করলে রোদ-বাতাস কম খেলবে, ছোট গাছ আওতায় পড়ে ফল কম হবে।

(৩) ফুলের বাগানে এমন ভাবে চাষ করতে হবে যেন বছরে সব-সময় বেশ কিছু রঙিন সুগন্ধী ফুল বাগানের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকে। একটা রং-এর সঙ্গে আর একটা রং যাতে মানানসই হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। আগের অধ্যায়ে রং মেলানোর যে সব নিয়ম বলেছি সে সবই ফুলের বেলাও খাটবে। ১২.৪ নং নকশায় একটা চার্টে খুব চলতি গাছ, ঝোপ ও লতায় কোন্ কোন্ মাসে কি কি রংয়ের ফুল হয় তা দেখানো হল। গাছ বাছাইয়ে এই চার্ট কাজে লাগান, বাগানের খোলতাই হবে।

(৪) মানুষকে সুন্দর করে সাজাতে হলে যেমন নানান অলঙ্কার দরকার, বাগানের সাজেরও তেমনি কিছু অলঙ্কার আছে। যথা— রকমারী (চৌকো, গোল, পানপাতা, ফুলের মত) ডিজাইনের ফুলের কেয়ারী, নকল পাহাড়, ফার্নের বাগান, বেড়া বা হেজ, বাঁশের তোরণ, কাঁচ ঘর, পাথর বা ইট বসান বীথি, কাঠের বেঞ্চ, দোলনা, ঝরনা, ফোয়ারা, পায়রার বা পাখীর খাঁচা, পদ্ম পুকুর (Lily pool), জলের উপর ছোট কাঠের বা বাঁশের সাঁকো। গোড়ার কয়েক দফা ছোট বাগানে ও শেষের কয়েক দফা বড় বাগানে মানানসই। তাক মাফিক নিজের বাগিচায় জুড়ে দিলে, তারিফ পাবেন।

● ফুলের বাগান—একগুচ্ছ কবিতা

বাহারী ফুল-বাগিচা করতে হলে যে সব ধরনের গাছ দরকার, তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল। এর থেকে পছন্দসই গাছ বেছে নিতে হবে।

ক. লতা বা **Climber**—ছোট বাগানের জন্য একটি বা দুটি ও খুব বড় বাগান হলে ৪/৫টি বেছে নিতে হবে। লতা গাছ ক্রমাগত বড় হয়ে যায় ও অন্য গাছকে ঢেকে তার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে থাকে। কিছুদিন পরপরই তাকে ছাঁটাই করে ঠিক রাখতে হয়। পরিচর্যার অভাব হলে

লতা গাছ খুব তাড়াতাড়ি বিশ্রী রূপ নেবে। আমাদের দেশের কিছু চলতি লতার বিবরণ দিলাম :

(১) মালতি লতা—(সাদা সুগন্ধী ফুল, বর্ষাকালে জন্মায়—ভারী বড় লতা।)

(২) এন্টিগোনান্—(গোলাপী ফুল, সারা বছর প্রচুর জন্মায়—ভারী লতা।)

(৩) রসুন ফুল—(হাল্কা গোলাপী ফুল, পাতায় রসুনের গন্ধ, সারা বছর জন্মায়—মাঝারী লতা।)

(৪) আলমান্ডা—(বড় হলদে ফুল, সারা বছরই দুটো-চারটে করে ফোটে—হাল্কা ছোট লতা।)

(৫) বোগেন ভিলা—(জাত অনুযায়ী লাল, কমলা, সাদা নীল, হলদে নানান রকম ফুল প্রচুর হয়। খুব একটা যত্ন করতে হয় না।)

(৬) লতানে ক্লোরোডেনড্রন—(শীতকালে গাঢ় গোলাপী ফুল হয়—হাল্কা লতা।)

(৭) অপরাজিতা—(সাদা ও বেগুনে ফুল, সারা বছর ফোটে —হাল্কা লতা।)

(৮) মাধবী—(হলদেটে-সাদা সুগন্ধী ফুল—ভারী লতা।)

(৯) রেললতা—(হাল্কা নীলচে-বেগুনে ফুল, সারা বছরই কম কম ফোটে—হাল্কা লতা।)

(১০) জুঁই—(জাত-ভেদে সুগন্ধী সাদা বা হলদে বর্ষার ফুল—ভারী লতা।)

(১১) হানিসাক্‌ল—(হাল্কা কমলা সুগন্ধী ফুল, শীতে ফোটে—হাল্কা লতা।)

(১২) ঝুমকোলতা—(গাঢ় গোলাপী সুগন্ধী ফুল, ঝুমকোর মতো দেখতে, গরমে ফোটে—ভারী লতা)।

(১৩) ভেনেস্তা—(সোনালী ফুল, শীতের শেষে প্রচুর ফোটে—ভারী লতা।)

(১৪) রেংগুন লতা—(সাদা ফুল, রোদে লাল হয়ে যায়, সারা বছর প্রচুর ফোটে—ভারী লতা, অনেকে মধুমালতীও বলে।)

বড় গাছ	
ঝোপ ও ঝাড়	
লতা	
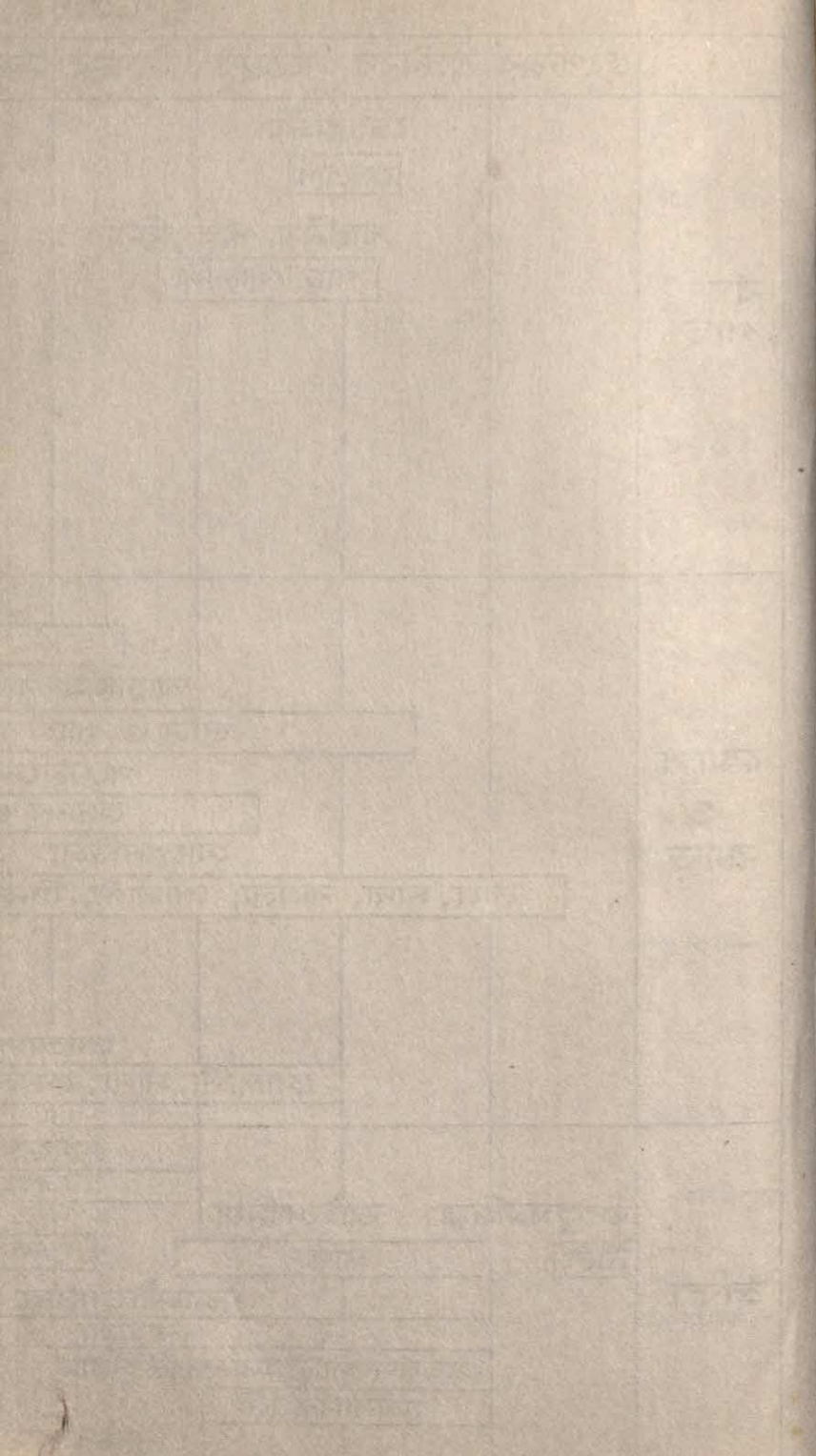
(১৫) পাখীলতা বা এরিস্টোলেচিয়া—(সাদাটে পাখীর মত দেখতে ফুল, সারা বছর ফোটে—হাল্কা লতা।)

খ. ঝোপ বা **Shrub**—ঝোপ বা ঝাড় হচ্ছে বাগানের আসল রূপকার। তাদের বাহারী পাতা, রঙীন ফুল ও সুন্দর ফল যে কোন বাগানের চেহারা পাল্টে দিতে পারে। বেড়া গাছের মত ঝোপঝাড় দিয়েও বাগানের আবরু রচনা করা যায়। ২ ফুট চৌকো ও ২ ফুট গভীর গর্ত করে মাটিতে গোবর ও পাতা পচা সার দিয়ে গাছের চারা বসাতে হবে। বছরে একবার করে ছেঁটে দিয়ে সার দিতে হবে। এর বেশী তদারকীর দরকার হয় না। কয়েকটি চলতি ঝোপ-গাছের নাম এখানে দেওয়া হল ঃ আজেলিস (বড় সাদাটে-গোলাপী ফুল, পাহাড়ে গাছ), ক্যান্‌ডিজ (মাঝারী ঝাড়, সাদা ফুল, গরমে ফোটে), ক্যামেলিয়া (লম্বা ঝোপ, সাদা ও হাল্কা গোলাপী ফুল, পাহাড়ে গাছ), হাস্‌নাহানা (ছোট সাদা, তীব্র সুগন্ধী ফুল ; বর্ষায় ফোটে ; ঝাড়ালো গাছ), জুঁই (সাদা সুগন্ধী ফুল, দিনে ফোটে, মাঝারী মাপের ঝাড়), ক্লোরোডেনড্রন (সাদা ফুল, বর্ষায় ফোটে, ছায়াতেও গাছ জন্মায়), ক্রোটোন (ফুল নয়, রঙিন বাহারে পাতাই এর আসল আকর্ষণ, মাঝারী ঝোপ), মিলি (লাল ছোট ফুল ; ছোট কাঁটা ঝোপ), জবা (জাতভেদে লাল, সাদা, গোলাপী ডবল, পঞ্চমুখী, নানান রকম ফুল সারা বছর ধরে ফোটে), রুক্মিণী (ছোট লাল, গোছা গোছা ফুল, বর্ষায় ফোটে, মাঝারী ঝাড়), টগর (সাদা ফুল গরমে ফোটে ; বড় ঝাড়), রঙ্গন (থোকা থোকা ফুল, জাতভেদে লাল ও হলদে ; সারা বছর ফোটে, ছোট ঝাড়), বেলি বা বেল (সাদা সুগন্ধী ফুল, গরমে ফোটে), জহুরী চাঁপা (হলদে সুগন্ধী ফুল ; ছোট ঝোপ), স্থল পদ্ম, কামিনী (সাদা সুগন্ধী ফুল, লম্বা ঝোপ) এবং সবশেষে ফুলের রাজা গোলাপ, যা না থাকলে বাগান পূরণ হয় না। (অগুন্তি রংয়ের গোলাপ হয়, শুধু গোলাপের ঝোপ দিয়েই বিশাল বিশাল বাগান তৈরী করা চলে।)

গ. বাহারে বা **Ornamental** গাছ—বড় গাছের জন্য বড় বাগানের দরকার। তবে ছোট বা মাঝারী বাগানের সীমানা বরাবর বা কোণে কোণে ২।৪টে মাঝারী মাপের বাছাই-করা বাহারে গাছ লাগালে বাগানের রূপও বাড়ে, আলো-ছায়ার খেলাও জমে। এখানে বাছাই-করা ছোট বড় গোটা পনেরো গাছের নাম দেওয়া হল। এগুলো লাগাতে হলে ৩×৩ ফুট চৌকো গর্ত ৩ ফুট গভীর করে মাটিতে পচা গোবর সার মিশিয়ে চারা

বসাতে হবে। সার বেঁধে গাছ লাগাতে হলে, দুই চারার মাঝে ফুট কুড়ি জায়গা ছাড়তে হবে।

(১) সপ্তপর্ণী—বিরাট লম্বা গাছ। সবুজ থোকা থোকা পাতা ; এক থোকায় ৪টি থেকে ৭টি হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় গাছ।

(২) কদম—লম্বা গাছ, বর্ষায় হলুদ ফুল হয়। বৈষ্ণবদের প্রিয় গাছ।

(৩) অর্কেরিয়া কুকি—ঝাউগাছ। লম্বা পিরামিডের মত দেখতে। চওড়া পথের বা তোরণের দু'পাশে খুব মানানসই।

(৪) সোনালী বাঁশ—ছোট হলদে-সবুজ ডোরা কাটা বাহারে বাঁশ।

(৫) পাম—নারকেল, সুপারীর মত বিশাল মাপ থেকে ছোট ছোট টবের বোতল পাম নানান সাইজের হয়। বাগান সাজাতে সব সাইজই কাজে লাগে।

(৬) সাইট্রস—নানান জাতের, নানান মাপের হয়। বাতাবী, কমলা, মুসুম্বি, কাগজী, পাতিলেবু। হলদে সবুজ ফলের রূপে বাগান আলো হয়ে থাকে।

(৭) গোলমহর—বড় বাগান, পার্ক বা চওড়া রাস্তা সাজাতে অতুলনীয়। চট করে বড় হয়। হলদে কমলা ফুল। গাছের বাংলা নাম কৃষ্ণচূড়া।

(৮) ইউক্যালিপ্‌টাস্—খুব লম্বা হাল্কা গাছ। সাদা, মোলায়েম ডাল, সরু সুগন্ধী পাতা। ওষধী গাছ ইউক্যালিপ্‌টাসের হাওয়া নাকি শরীরের পক্ষে ভাল।

(৯) জাকার্ণ্ডা—নীলচে-বেগুনী ফুল, বড় গাছ। ছোট-বড় সব বাগানেই মানায়। গোলমহরের সারিতে মাঝে মাঝে বসিয়ে দিলে দুই ফুলের বিপরীত রং খুব মানানসই হয়।

(১০) ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা—পাহাড়ে বড় গাছ। বড় সাদা ফুল।

(১১) পারিজাত—ছোট গাছ। হলদে সাদা সুগন্ধী ফুল।

(১২) দেবদারু—মাঝারী ঝাড়ালো গাছ। সুন্দর চিরসবুজ পাতা।

(১৩) চাঁপা—নানান জাতের হয়—কনক, কাঁঠালী, শ্বেত, স্বর্ণ। স্বর্ণ লম্বা ; বাকিরা বেঁটে ; সুগন্ধী ফুল—সাদা বা হলদে।

(১৪) পান্থপাদপ—ময়ূরের পেখমের মত বড় বড় পাতাওয়ালা ছোট মাপের গাছ। পাতা কাটলে জল ঝরে পড়ে।

(১৫) অশোক—জঙ্গুলে অথচ বাহারী মাঝারী মাপের গাছ। কমলা রং-এর থোকা থোকা ফুলে অপরূপ দেখায়।

ঘ. বেড়াগাছ বা Hedge—বেড়া বাগানকে গরু-ছাগলের হাত থেকে বাঁচায়, বাগানের আবরু রাখে। ঝোপকে ছেঁটে-ছুঁটে হাতি, ঘোড়া, পাখি বা মানুষের রূপ দেওয়া যায়, তাতে বাগানের এক নতুন মজার পরিবেশ তৈরী হয়। এসব কাজের সব চেয়ে উপযোগী গাছ হচ্ছে মেহেন্দী। মেহেন্দী খুব জোরালো গাছ; সহজেই বড় হয়, ঘন ঘন ছাঁটাইয়ে গাছের ক্ষতি হয় না। ছাঁটা ডাল থেকে খুব সহজেই চারা তৈরী করা যায়। মাঝে মাঝে ছাঁটাই করা ছাড়া আর কোন যত্ন করার দরকার হয় না। অন্যান্য যে সব গাছে বেড়া তৈরী হয় তা হল দুরন্তা, ডোডেনিয়া, আরলিয়া ও কারাওাস। তবে মেহেন্দীর সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারে না। মেহেন্দী ওষধী গাছ। রস থেকে যে খয়েরী লাল রং তৈরী হয় তা নানান কাজে লাগানো হয়। ভাল করে বেড়া করতে হলে দু ফুট দূরে দূরে বীজ বা কাটিং লাইন করে লাগাতে হবে। গাছ এক ফুটের মত বড় হলেই সব দিক দিয়ে সমান করে ছাঁটাই করে যেতে হবে ঘন ঘন। তাতে বেড়া ঘন হয়ে চৌকো পাঁচিলের আকৃতিতে বেড়ে উঠবে। ফুল ও বাগানের পটভূমি হিসেবে বেড়ার একটা বিশেষ দান আছে।

ঙ. ঘাস-চত্বর বা Lawn—বাগানকে খোলামেলা ব্যবহারের উপযোগী করতে হলে মাঝখানে একটা-আধটা সাইজ মাফিক ঘাস-চত্বর খুবই জরুরী। ঘাস-চত্বর বাড়ী ও বাগানকে রোদ দেয় অথচ ঠাণ্ডা রাখে। ভাল লন রাখার পেছনে অবশ্যই অনেক খিদ্‌মদ্‌গারী করতে হয়। চত্বরের চারপাশে গভীর করে নালা কেটে দিতে হবে যাতে বাড়তি জল চট করে নেমে যায়। এ ছাড়া চত্বরের নীচে এক ফুট গভীরে ইটের বড় বড় খোয়া বিছিয়ে দিলেও লনের জল তার ভিতর নেমে যায়। লনে বেশী জল দাঁড়ালে ঘাসের গোড়া পচে যেতে পারে। খোয়ার উপর এক ফুট পুরু পাতা পচা সার মেশানো দো-আঁশলা মাটি ভরে তাতে বাছাই করা দূর্বা ঘাসের বীজ বা চারা লাগাতে হবে। মাটিতে মাঝে মাঝে রোলার চালিয়ে নিতে পারলে, মাটি সমান ভাবে বসবে। তাতে ঘাস ভাল থাকবে। দূর্বা ২ ইঞ্চি মত সাইজের হলে তাকে মোয়ার (Mower) মেসিন দিয়ে ছেঁটে ফেলতে হবে। মাঝে মাঝে বাজে ঘাস তুলে ফেলতে হবে। সপ্তাহে একবার করে জল দেওয়া, মাসে একবার করে ঘাস বাছাই ও বছরে দু'বার (জুন ও নভেম্বরে) ১০০০ বর্গ ফুট প্রতি এক কেজি ইউরিয়া সার ছড়িয়ে রোলার চালিয়ে দেওয়া—এই হল ভাল লন তৈরীর ফরমুলা।

চ. পদ্মপুকুর বা Lilypool—সরোবরের সঙ্গে বাগানের একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক আছে। জলে যে শুধু পদ্ম ফোটে, বাগানের শোভা বাড়ে তাই নয়, জলের ঢেউয়ের নাচানাচি, লাল মাছ (Golden Fish)-এর খেলা নিথর বাগানে এক জীবন্ত ভাব জাগিয়ে তোলে। গাছপালা ও
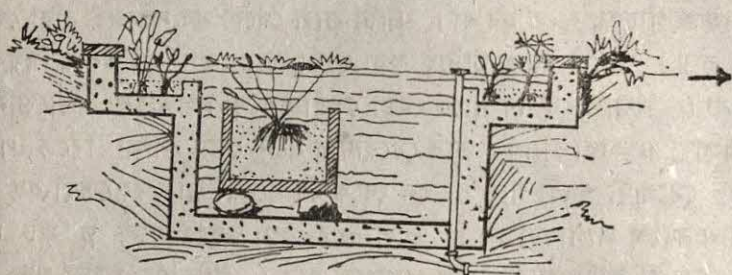
১২.৫—লিলিপুলের গড়ন

ঘাস-চত্বরে দেবার জল যোগায়। ঝরনা, সাঁকো, নকল পাহাড়—বাগানের নানা অলঙ্করণ করার সুযোগ করে দেয়।

লিলিপুল নানান চেহারার হতে পারে ; ছোট বাগানে গোল বা চৌকো সরল রূপই ভাল। বড় বাগানে প্রাকৃতিক নিয়মে আঁকাবাঁকা নদী বা দীঘির রূপ দেওয়া যায়। গভীরতা দুই ফুটের (·৬ মিটারের) বেশী দরকার নেই। ১২.৫ নং নকশায় লিলিপুল কি ভাবে তৈরী করতে হবে তা দেখানো হয়েছে। জলজ লিলি নানা রকমের হয়—পদ্ম, কুমুদ বা শালুক, মাখনা, নল বা শাপ্‌লা ইত্যাদি নানারঙের দিন বা রাতে ফোটা ফুল ছাড়াও ঝাঁঝি, পানিফল, কচুরীপানা, নানান রকম বাহারে ভাসন্ত গাছ লতা এবং শেওলাও পুকুরের শোভা বাড়ায়। জলার ধারে যে সব লিলি জন্মায় তাও লাগানো যেতে পারে। জলজ গাছের বিশেষ কিছু যত্ন করতে হয় না অথচ শোভা হয় অপরূপ।

ছ. মরসুমী ফুল বা Season flower—মরসুমী ফুলের গন্ধের চেয়ে রঙের শোভাই বেশী—যাতে মনে হয় সবুজ বাগানের মাঝে রঙ্গিন চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ; তাই মরসুমী ফুলের গাছ আলাদা আলাদা না লাগিয়ে, বেশ খানিকটা জায়গা (বাগানের মাপভেদে ২ ফুট × ৬ ফুট থেকে ৪ ফুট × ১২ ফুট গোল, চৌকো বা ডিমের আকৃতিতে) এক সঙ্গে

গোছা করে লাগান হয়। ফুল ফুটলে ওই জায়গাটা নিরেট রঙের চাদরের মত দেখায়। একেই ফুলের কেয়ারী বলে। কেয়ারীর চারপাশটা ইট, পাথর, নুড়ি, শ্লেট বা টালি দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে, ফুলগুলো ফ্রেমে বাঁধানো রঙ্গিন ছবির রূপ নেয়। শোভা আরো বাড়ে।

মরসুমী ফুল টবেও চাষ করা চলে। তাতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আনা-নেওয়ার সুবিধা। অনেকে কেয়ারীর থেকে টবই বেশী পছন্দ করেন। কারণ এতে সহজেই ফুল ঝরে পড়া টবগুলোকে চোখের আড়ালে রেখে শুধু ফুটন্ত ফুলের টবগুলিকে চোখের সামনে রাখা যায়। মনে হয় বাগান সব সময়ই তাজা ফুলে ছেয়ে রয়েছে। অগুনতি মরসুমী ফুলের ভেতর আমাদের দেশের উপযোগী চলতি গোটা ৩৫টি গাছের তালিকা পরের তিন পৃষ্ঠায় (১৮২, ১৮৩, ১৮৪) দেয়া হল।

● সবজি বাগান ! ঘরকা দাল মুরগী বরাবর ঃ

হিন্দীতে একটা কথা আছে, 'ঘরকা মুরগী দাল বরাবর।' মানে নিজের বাড়ীর পোষা মুরগীর স্বাদ ডালের সমান। সবজির বেলা কিন্তু ঠিক উল্টো। যতটুকুই বাগানে হোক, নিজের হাতে ফলানো বেগুনটা মুলোটার স্বাদ কিনে-আনা সবজির থেকে একেবারেই আলাদা। এই আনন্দময় মিষ্টি স্বাদটুকু পয়সা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না। কাজেই বাড়তি জমিটুকু ফেলে না রেখে পছন্দমত মুলো, গাজর, বীট, শালগম, ওলকপি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লেটুস, উচ্ছে, করলা, কাঁকরোল, ঝিঙ্গে, লাউ, কুমড়ো, শসা, বেগুন, টমাটো, লঙ্কা, ঢেঁড়শ, সীম, বরবটি, মটরশুটি, সিলেরী, কাঁচাপেঁপে, কাঁচাকলা, এঁচোড়, নানান শাক—নটে, লাল, পালং, পুঁই, মেথি, ধনে, পাট, পুদিনা, হিঞ্চে, শুষনি, থানকুনি, পুনর্নবা, যা খুশি লাগিয়ে দিন। আস্তে আস্তে চাষ হতে থাকবে। মন তাজা, শরীর শক্ত হতে থাকবে। একটু বেশী জমি থাকলে আলু, রাঙা আলু, কচু, পেঁয়াজ, পটল, মটর বা ছোলার চাষও লাগিয়ে দিতে পারেন। বাড়তি দু'পয়সা হাতে আসবে। রিটায়ার করার পর হয়ত এইটাই জীবিকা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জীবিকা হোক, না হোক, অন্ততঃ বাতের হাত থেকে তো বেঁচে যাবেন।

চারটি জিনিসে চাষ হয়—গাছের বীজ, জমির মাটি, সেচের জল ও সার। তেজী বীজ থেকে তেজী গাছ হয়, তেজী গাছে বেশী ফসল ফলে।

শীতকালের ফুল [১]

নাম	উচ্চতা (ইঞ্চিতে)	গাছের আকার	লাগাবেন রোদে/ছায়ায়	ফুল ফোটার সময়	ফুলের রঙ ও গন্ধ
এন্টারীনাম	১৮″-৩৬″	শাখাওয়ালা	দুই চলে	আগস্ট-নভেম্বর	নানা রঙ
এলিসিয়ম	৪″-১২″	ঝাঁকড়া	রোদে	মে-আগস্ট	সুগন্ধী ফুল
কারনেশান্	১৮″-৩৬″	"	"	জুন-সেপ্টেম্বর	সুগন্ধী লাল ছোট ফুল
কোচিয়া	৩০″-৩৮″	"	"	জুলাই-সেপ্টেম্বর	আগুনে গোলার মত
কোলিয়াস	১২″-২৪″	ঝাড়ালো	"	" "	পাতাবাহার
সর্বজয়া (কলাফুল)	৩০″-৭২″	ঝোপ	"	জুলাই-অক্টোবর	নানা রঙ
কালেন্‌ডুলা	১২″-৩৬″	"	"	জুন-আগস্ট	সিংগল, ডবল হলদে কমলা ফুল
জারবেরা	১২″-২৫″	শাখাওয়ালা	"	অক্টোবর-জানুয়ারী	"
টোরেনিয়া	১০″-১২″	ঝাড়ালো	ছায়ায়	মে-জুন	হলদে-বেগুনে নীল ফুল
ডালিয়া	৩৬″-৭২″	"	রোদে	মে-জুলাই	নানা রঙ
ডায়নথাস	১২″-১৫″	"	"	মে-অক্টোবর	সিংগল-ডবল নানা রঙের
ডেজি	১০″-৩০″	"	দুই চলে	মে-সেপ্টেম্বর	ছোট রঙিন

শীতকালের ফুল [২]

নাম	উচ্চতা (ইঞ্চিতে)	গাছের আকার	লাগাবেন রোদে/ছায়ায়	ফুল ফোটার সময়	ফুলের রং ও গন্ধ
ন্যাসটারসিয়াম	১২"-৯৬"	লতানে	রোদে	মে-সেপ্টেম্বর	সুগন্ধী ডবল ফুল
পপি	২৪"-৬০"	খাড়া	"	আগস্ট-অক্টোবর	সিংগল-ডবল নানা রঙের
প্যান্‌সি	৪"-৬"	ঝাড়ালো	দুই চলে	" "	প্রজাপতির আকার, রংঙিন ফুল
ফ্লক্‌স	১২"-১৮"	ঝোপ	রোদে	" "	নানা রঙের ছোট ফুল
দোপাটি	১৮"-৩০"	সোজা	"	মার্চ-মে	গোলাপী
বিগোনিয়া	১২"-১৮"	ঝোপ	ছায়ায়	মার্চ-মে	পাতাবাহার
ভায়লেট	৪"-৬"	"	"	— —	সাদা-বেগুনে
গাঁদা	৮"-৩০"	"	রোদে	ডিসেম্বর-জুলাই	হলদে, কমলা, বাসন্তী
লার্‌কস্পার	৩৬"-৪৮"	লম্বা	"	জুলাই-সেপ্টেম্বর	নানা রঙ, ডবল-সিংগল
স্টক	২৪"-৩০"	ঝোপ	"	আগস্ট-সেপ্টেম্বর	ডবল-সিংগল নানা রঙের
সুইটপি	৪"-৮"	লতানে	"	জুলাই-সেপ্টেম্বর	সাদা, লাল, হলদে, গোলাপী, নীল
হলিহক	৬০"-৯৬"	খাড়া	ছায়ায়	জুন-সেপ্টেম্বর	সিংগল-ডবল নানা রঙের
হেলিওট্রপ	১৮"-২৪"	ঝোপ	"	আগস্ট-অক্টোবর	সুগন্ধী ফুল

গরম ও বর্ষাকালের ফুল

নাম	উচ্চতা (ইঞ্চিতে)	গাছের আকার	লাগাবেন রোদে/ছায়ায়	ফুল ফোটার সময়	ফুলের রং ও গন্ধ
করিওপ্ সিস্	১৮"-৩৬"	ঝাড়ালো	রোদে	জুন-অক্টোবর	নানা রং, সিংগল ও ডবল
কসমস	৪৮"-৭২"	,,	,,	এপ্রিল-অক্টোবর	,, ,,
গমফেরেনা	২২"-২৮"	ঝোপ	,,	মে-জুলাই	সাদা, বেগুনে ও গোলাপী ছোট ফুল।
গিলার্ডিয়া	২৮"-৩০"	,,	,,	এপ্রিল-জুলাই	নানা রঙের সিংগল ও ডবল ফুল।
জিনিয়া	২৪"-৩৬"	শাখাওয়ালা	,,	এপ্রিল-জুলাই	নানা রঙের সিংগল ও ডবল ফুল হয়।
পরটুলেকা	৪"-৬"	ছড়ানো	,,	মার্চ-জুন	,, ,,
পিটুনিয়া	১৮"-২৪"	লতানে	রোদ বা ছায়া	আগস্ট-নভেম্বর	নানা রঙের থোকা থোকা ফুল হয়।
ভারবেনা	৬"-১০"	ছড়ানো	রোদে	জুন-আগস্ট	,, ,,
সূর্যমুখী	৪৮"-৭২"	খাড়া	রোদে	জুন-সেপ্টেম্বর	থালার মত হলুদ ফুল।
এসটার	১২"-৩০"	ঝোপ	দুই চলে	মে-জুলাই	তারার মত দেখতে।

কাজেই ভাল বীজ চিনতে হবে। বীজের ভাঁড়ার থেকে গুনে একশোটি বীজ নিয়ে স্পঞ্জ (sponge) বা ব্লটিং পেপারে মুড়ে জল দিয়ে ভেজান। তিন দিনের মাথায় গুনে দেখুন কটা বীজে অঙ্কুর এলো। ৭০ টা বা বেশী বীজ ফুটলে জানবেন আপনার সংগ্রহ খুব ভাল। ৩০-টার কম ফুটলে বীজ বাতিল করা দরকার। ভাল বীজ শুধু যোগাড় করলেই চলবে না। ভাল করে রাখতেও হবে। ঝেড়ে-বেছে রোদে শুকিয়ে নিয়ে, বীজগুলো গাঢ় কালো, নীল বা সবুজ রঙের শুকনো পরিষ্কার কাঁচের বোতলে এমনভাবে ছিপি এঁটে রাখতে হবে যাতে হাওয়া না ঢোকে। বোনবার আগে তুঁতের জলে ভিজিয়ে নেবেন। পোকা ধরবে না। এবার মাটি। সবজি চাষে দো-আঁশ মাটি দরকার। এতে ৪০ ভাগ কাদা, ৫ ভাগ পচা পাতা সার, ৫ ভাগ চুন ও ৫০ ভাগ বালি থাকে। কোনটার ভাগে কম-বেশী হলে পুরিয়ে নিতে হবে। ৫০ ভাগের বেশী কাদা থাকলে তাকে এঁটেল মাটি বলে। এঁটেল মাটিতে জল সরে না, ধানচাষের উপযোগী। ৫০ ভাগের বেশী বালি থাকলে তাকে বেলে মাটি বলে। বেলে মাটিতে জল তাড়াতাড়ি সরে যায়। তরমুজ, খরমুজ বা ফুটি চাষে বেলে মাটি ভাল কাজ দেয়। চাষের জমি বাছাইয়ের ৪ দফা নিয়ম আছে :

(১) জমির চারপাশে বিশেষ করে পুবে ও দক্ষিণে বড় গাছের আওতা থাকলে চলবে না। সবজি চাষে রোদ চাই অনেক।

(২) গরু-ছাগল যাতে ঢুকতে না পারে, সেভাবে শক্ত বেড়া দিয়ে জমি ঘিরে রাখতে হবে।

(৩) জমিটা একদিকে ঢালু হওয়া দরকার যাতে দরকার মত নালা কেটে দিলে জমির বাড়তি জল চট্‌ করে সরে যায়, আবার দরকার মত প্রচুর জল দেওয়া যায়। সেভাবে জমির উঁচু দিকে পুকুর, নদী বা টিউবওয়েল থাকা জরুরী। দরকার মত জল দিতে না পারলে চাষে সুফল মিলতেই পারে না।

(৪) একই জমিতে হরেক মরসুমে ফসল তুললে তার শক্তি কমে যায়। জমিকে দু'তিন চার বছর বাদে বাদে একবছর চাষ না করে ছুটি দিতে হয়। তাতে ফসলের জোর বাড়ে।

চাষের শেষ কথা সার। সার পাঁচ রকম :

(ক) উদ্ভিজ্জ সার—শীতে ঝরা পাতা ঝেটিয়ে একটা বড় খানায় ফেলুন। গরমকালে তাতে জল ঢেলে পচান। সামনের বছর খাসা

সার পাবেন। জমিতে ছিটোবার আগে রোদ খাইয়ে নেবেন। পোকা-মাকড় সরে পড়বে। আরেক রকম উদ্ভিজ্জ সার হচ্ছে সবুজ সার। ধনে, মটর, অড়হর, বরবটির চাষ করে ফসল তোলা হয়ে গেলে গাছগুলো কেটে জমিতেই মিশিয়ে দিলে জমির তেজ বেড়ে ওঠে। সব জমিতেই তিনবছর বাদ বাদ পালা করে সবুজ সারের চাষ করুন। তিন নম্বর উদ্ভিজ্জ সার হোল খোল। জমিতে দেবার আগে ১৪।১৫ দিন জলে পচিয়ে তেজ কমিয়ে নেবেন। নয়তো চারা মরে যেতে পারে।

(খ) প্রাণিজ সার—মরা পশুপাখীর পচা-গলা মাংস, গোবর, চোনা, জলে মেশানো শুকনো রক্ত, হাড়ের গুঁড়ো, হাঁস-মুরগীর পায়খানা, মাছের আঁশ ও নাড়িভূড়ি নাইট্রোজেনে ভরপুর। সার হিসেবে কাজে লাগালে ফসল বাড়বে।

(গ) খনিজ সার—নুন, সোরা, চুন। সাবধানে কম করে ছড়াবেন। মাটির নানা দোষ, পোকা-মাকড়ের উৎপাত কমে যাবে।

(ঘ) মিশ্র সার—উপরের তিন দফা সারের সঙ্গে ঘরের আবর্জনা ও তরকারীর খোসা মিশিয়ে জোরালো মিশ্র সার বানিয়ে নিন। ঝালে, ঝোলে, অম্বলে সবেতেই কাজে লাগবে।

(ঙ) রাসায়নিক সার—নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, ফসফরাস। নানারকম অনুপাতে বাজারে তৈরী সার কিনতে পাবেন। এক এক অনুপাত এক এক রকম চাষে লাগবে। নির্মাতার দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী মেশাবেন। রাসায়নিক সার জমির উপকারে লাগে না কিন্তু ফসল বাড়ায়। আর একটা কথা। নজর রাখবেন, গাছে বা পাতায় পোকা-মাকড় যাতে না লাগে। এদের তাড়াতে গ্যামাক্সিন বা ফলিডল জলে গুলে পিচকারী দিয়ে গাছের গায়ে ছিটিয়ে দিতে হয়। তবে পোক্ত চাষী না হলে ফলিডল নিয়ে নাড়াচাড়া না করাই ভাল। সাংঘাতিক বিষ।

● সবজি চাষের রোজনামচা

সবজি চাষ শেষ করবার আগে করণীয় কাজের একটা মাসওয়ারী তালিকা দিলাম। এভাবে কাজে এগুলে সুফল পাবেনই :

জানুয়ারী—

(১) শসা, ঝিঙে, বেগুন, উচ্ছে, লাউ, ফুটি, তরমুজ ও খরবুজের বীজ পুঁতুন যদি না আগেভাগে কাজ সেরে থাকেন।

(২) পাটনাই আলুর চাষ করুন।

ফেব্রুয়ারী—

(১) গত মাসের বীজগুলো পুঁতে না ফেলে থাকলে, এখনই লাগান। আর দেরী করা ঠিক হবে না।

(২) বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, সীম তৈরি হয়ে এসেছে। তুলতে শুরু করুন। ভাল বাজার পাবেন।

(৩) নৈনীতাল আলু ভেঙে ফেলুন। দেশী পেঁয়াজও বোধ হয় তৈরী হয়ে গেছে। ঘরে তুলুন। নভেম্বরে লাগানো করলা গাছে নজর দিন। ফলন শুরু হলে আপনিও তোলা শুরু করুন।

(৪) ভুট্টা চাষের ইচ্ছে থাকলে জমি তৈরী করুন।

মার্চ—

(১) করলা, উচ্ছে, শসা, কুমড়ো, চিচিঙ্গা, বরবটি, ধুঁধুলের বীজ পুঁতুন।

(২) গত মাসে পেঁয়াজ তৈরি না হলে, এ মাসে তুলবেন।

(৩) ওল লাগান। কচু গাছ থাকলে জল দিতে হবে।

(৪) ভুট্টার বীজ লাগিয়ে দিন।

এপ্রিল—

(১) ঢেঁড়শ, কাঁকরোল, লঙ্কা, কুমড়ো, চালকুমড়ো, বর্ষাতি মূলো, টেঁপারী, শাঁক-আলু ও নটে শাকের বীজ লাগান।

(২) আদা, হলুদ, মানকচু, আর্টিচোক, মেটে আলুর মূল বা কন্দ পুঁতে দিন।

(৩) বেগুনের চারা লাগাতে পারেন।

(৪) করলা, ওল ও কচু বনে নিড়েন ও সেচ দিন।

মে—

(১) গত মাসের বীজগুলো না লাগিয়ে থাকলে এখন লাগান।

(২) বেগুনের চারা লাগিয়ে গোড়ায় নালা কেটে দিন ও সেচ করুন।

(৩) বর্ষার জল পড়লেই খালি জমিতে খোল ছড়িয়ে কুপিয়ে দিন।

(৪) কচুবনে গোবর সার, নিড়েন ও সেচ দিতে হবে। ওলের বেলায়ও একই কাজ।

জুন—

(১) সীম, শাঁক-আলু, শালগম ও ফুলকপির বীজ লাগাতে পারেন।
(২) বেগুন ক্ষেতে একটু খোল মিশিয়ে দিন।
(৩) আদা ও হলুদের জমিতে নিড়েন দিন। খোল দিন।
(৪) টেঁপারীর গোড়া খুঁড়ে দিন।

জুলাই—

(১) শাক-পাতা, কুমড়ো, লঙ্কা, পুঁই, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, বাঁধাকপি, মুলোর বীজ লাগিয়ে দিন। এরপর দেরী হয়ে যাবে।
(২) কুলি বেগুন ফললে তুলতে শুরু করুন। করলা বোধহয় ফলেছে।
(৩) চারাগাছগুলোকে সকাল-বিকেল রোদ খাওয়ান।
(৪) ওলের জমিতে নিড়েন দিন।

আগস্ট—

(১) গাজর, বীট, লেটুস, টমাটো, মটর, স্কয়াস্, পার্শনিপ্, পালং, পেঁপে ও টেঁপারীর বীজ বুনে দিন। লঙ্কা ও তামাক বীজও লাগান।
(২) ফুলকপির চারা জমিতে উঠিয়ে আনুন। রোদ-বর্ষায় ঢেকে রাখবেন।
(৩) টমাটোর চারা গজালে ঢেকে রাখবেন।

সেপ্টেম্বর—

(১) বীট, পেঁয়াজ, টক পালং, নটে শাক, শীতের লাউ, শীতের কুমড়ো, মটরের বীজ লাগাতে পারেন।
(২) কপি চারার গোড়ায় মাটি দিন—নিড়েন দিয়ে, খোল মিশিয়ে।
(৩) বাঁধাকপির চারা তৈরী হলে বীজতলা থেকে জমিতে বসান।
(৪) মাসের শেষে শিলং আলুর আবাদ শুরু করুন। আর শুরু করুন পটলের চাষ।

অক্টোবর—

(১) করলার বীজ লাগাতে পারেন। আর লাগান আমেরিকান মটর, ফরাসী সীম।
(২) ওলকপি, ফুলকপি, টমাটোর চারা বসানো শেষ করুন।

(৩) জমিতে কম কম নিড়েন দিন ও জল সেচ করুন। ঘন চারা পাতলা করে দিন।
(৪) পাটনাই পেঁয়াজ, পটল ও আলুর চাষ শুরু না করে থাকলে শুরু করুন।

নভেম্বর—

(১) পটল, আলু বসাবার শেষ সময়। তরমুজ, খরবুজ ও শসার বীজ বুনে কাজ এগিয়ে রাখতে পারেন। ফসল পাবেন আগেভাগে। কাঁকুড়, কাঁকড়ী, ঝিঙ্গে, কুমড়ো ও উচ্ছের বীজও লাগাতে পারেন।
(২) সব রকম কপির জমিতে খোল ছড়িয়ে নিড়েন দিন। সেচ দিন।
(৩) বর্মী আলুর চাষ লাগান। দেশী আলুর ক্ষেতে নিড়েন দিন। খোল মেশান। পাটনাই আলুর বীজ লাগান।
(৪) পেঁয়াজ বীজতলা থেকে জমিতে বসান।

ডিসেম্বর—

(১) তরমুজ, ফুটি, খরবুজ, ঝিঙ্গে, বেগুন, উচ্ছে, শসা, লাউয়ের বীজ লাগান।
(২) কপি-বাগানে ৭।৮ দিন বাদ বাদ সেচ দিন তরল সার মিশিয়ে।
(৩) মূলো তৈরী হয়ে গেছে। তুলে ফেলুন। বীট, গাজর, শালগম তুলুন।
(৪) মটর ও সীমের জমিতে নিড়েন দিন।
(৫) মাসের শেষে শিলং আলু তুলে ফেলুন। ভাল বাজার পাবেন। আম-আদা এবং হলুদও তুলতে পারেন।

● ফলবাগান—ফলেন পরিচিয়তে !

ফল-বাগানের দরকার অনেকখানি জমি। বসত বাড়ীর লাগোয়া এতটা জমি খুব কমই পাওয়া যায়। তবে দু'তিন কাঠা খালি জমি থাকলে পছন্দমত দু' একটা ফলের গাছ লাগাতে পারেন। পরিচর্যা খুবই কম। পছন্দসই ফল নিজের গাছ থেকে পেড়ে খাওয়ার একটা বিশেষ আনন্দ আছে। ফল চাষের জরুরী নিয়মগুলো নীচে দেওয়া হল ঃ

(১) ফল-বাগান হবে উঁচু জমিতে। জঙ্গল থাকলে চলবে না। রোদ পাওয়া চাই।

(২) জমির মাটি হতে হবে দো-আঁশ। এ মাটি অন্তত দেড় মিটার পুরু হওয়া দরকার। জমিতে নাইট্রোজেন সারের সঙ্গে মাপ মতন ফসফরাস, পটাশ ও চুন থাকা দরকার।

(৩) দরকার মাফিক সেচের আয়োজন রাখতে হবে। বাগানের ভিতর পুকুর বা জলাশয় থাকলে ভাল হয়। তাতে রোদ-হাওয়াও খেলবে বেশী।

(৪) গাছগুলির মাঝে গাছের ব্যাস অনুযায়ী ফাঁক রেখে চারা পুঁততে হবে। এই ব্যাস চার্ট নং ১ ও ২-এ (১৯১ এবং ১৯২ পৃষ্ঠায়) দেওয়া আছে।

(৫) ফল-বাগানে বীজচারা থেকে কলমের গাছের কদর বেশী। এতে ফল উঁচু মানের হয় ও তাড়াতাড়ি ফলে। তবে কলমের গাছের বীজ চারার মত লম্বা জীবন হয় না। একটা কলমের গাছ যেখানে ৩০ বছর ফল দেবে, একটা আঁটি বা বীজের গাছে হয়ত সেখানে ৯০ বছর ফল ধরবে।

● হাতে চাই হাতিয়ার !

ফুল, সব্জি ও ফল-বাগান নিয়ে মোটামুটি একটা আলোচনা হল। উদ্দেশ্য আপনাকে উদ্যান-পণ্ডিত বানানো নয়, আপনার বাড়ীর লাগোয়া জমির টুকরোটাকে কাজে লাগিয়ে একটা ছোট্ট অথচ সুন্দর বাগানের গোড়াপত্তন করা। সত্যিকার চাষবাস শিখতে হলে আপনাকে আরো অনেক পড়াশুনা করতে হবে। হাতে-কলমে কাজ শিখতে হবে। 'জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার।' অতএব নেমে পড়ুন : জলে নয়, বাড়ীর লাগোয়া জমিতে বাগান করতে। সঙ্গে রাখতে হবে—(১) একটি বড় দাঁড়া কোদাল (২) একটা ছোট হেলা কোদাল (৩) একটা ছোট জমিতে মই দেবার মই (৪) ২।৩টি ছোট ও মাঝারী নিড়েন ও খুরপী, (৫) জল দেবার ঝারি বা বোমা (৬) গাছ ধোবার একটা বড় পিচকারি (৭) ২।১টি ছোট-বড় আঁচড়া (৮) ডাল কাটা ধারালো ছুরি (৯) ডাল কাটা স্প্রিং দেওয়া কাঁচি (১০) মোটা ডালের জন্য ২/২½ ফুট লম্বা বড় কাঁচি (১১) কলম তৈরী করার বেঁকানো ছুরি (১২) জমি মাপবার জন্য ৩০ মিটার লম্বা ফিতে (১৩) একটা ৩/৪ মিটার লম্বা আঁকশি (১৪) দুটি বালতি (১৫) গোটা কতক ছোটবড় নানান সাইজের ঝুড়ি (১৬) চালনা

চার্ট নং—১

ফলের নাম	গাছের খাড়াই	গাছের ব্যাস	ফল ধরার বয়স	কলমে ফল ধরার সময়	মন্তব্য
কালোজাম	১২ মিটার	১২ মিটার	৫ বছর	বর্ষায়	লাল ছোট ফল, হজমী
কাঁঠাল	১৭ ,,	২৪ ,,	৭ ,,	বর্ষায়	দু-জাতের খাজা ও গিলা
আম	১২ ,,	১৪ ,,	৬ ,,	গরমে	আঁটির গাছ বাজে হয়
আনারস	১ ,,	১ ,,	২।৩ ,,	বর্ষায়	যে কোন মাটিতে চাষ চলে
আখ	১২ ,,	১ ,,	২ ,,	গরমে	ধল সুন্দরী, কাজলী, B-২০৪ ভাল জাত
আতা	৫ ,,	৫ ,,	৫	শরৎকালে	পাকলে ফলের গায়ে ফাট ধরে
আমলকী	১৪ ,,	৮ ,,	৮ ,,	শীতে	আচার, মোরব্বা তৈরী হয়
কলা	৪ ,,	৩ ,,	১ ,,	সারাবছর	তেউড় থেকে চারা হয়
কমলা	৭।৮ ,,	৭ ,,	৬।৭ ,,	শীতে	দক্ষিণ বাংলায় ফলে না
করমচা	১½ ,,	১ ,,	৩ ,,	গরমে	কাঁটা থাকায় বেড়া হয়
কৎবেল	১০ ,,	৬।৭ ,,	১০ ,,	বসন্তকালে	চাটনী, ঔষধ তৈরী হয়
কামরাঙগা	৭ ,,	৬ ,,	৬ ,,	শীতে	চাটনী ও আচার হয়
কুল	১২ ,,	৭ ,,	৪ ,,	শীতে	দু-জাতের দেশী ও নারকেলী
গোলাপজাম	৫ ,,	৬ ,,	৪।৫ ,,	গরমে	ফলে গোলাপের গন্ধ থাকে
চালতা	১০ ,,	৮ ,,	৪।৫ ,,	শরৎকালে	চাটনী ও আচার হয়
জামরুল	১১ ,,	৭ ,,	৪ ,,	গরম/বর্ষায়	লাল ও সাদা দু-জাতের হয়
ডালিম	৪ ,,	৬ ,,	৩।৪ ,,	শীতে	চুনা জমিতে ফলন ভাল হয়

চার্ট নং—২

ফলের নাম	গাছের খাড়াই	গাছের ব্যাস	ফল ধরার বয়স	কলমে ফল ধরার সময়	মন্তব্য
তাল	১৪ মিটার	৭ মিটার	৭।৮ বছর	শীতে	গুড়, পাটালী, মিছরী হয়
নারকেল	১৬ "	৭।৮ "	৭।৮ "	সারাবছর	গোড়ায় নুন দিলে ভাল ফলন হয়
নোনা	৭ "	৮ "	৬ "	বসন্ত	কচ্ কচে্ মিষ্টি ফল
পেয়ারা	৭।৮ "	৬ "	৩ "	বর্ষায় ও শীতে	কাশী, এলাহাবাদ, ভবনগরী ভাল জাত
পেঁপে	৬ "	২½ "	১ "	সারাবছর	স্ত্রী গাছের দলে ২।১টি পুরুষ দরকার
ফলসা	১৫ "	১০ "	৮ "	বর্ষায়	ফলে সরবৎ হয়
ডুমুর	৮ "	৭ "	৫ "	বর্ষায়	কলমের গাছে ফল ভাল হয়
বৈঁচি	২ "	১½ "	১½ "	গরমে	মিষ্টি কালো ফলে সরবৎ হয়
বাতাবী	৫ "	৬ "	৪ "	বর্ষায়	কলমের গাছে ভাল ফল হয়
বাদাম	১৭ "	১৫ "	৫ "	গরমে বা বর্ষায়	দেশী ও কাশ্মীরী, দু জাতের হয়
বেল	১৬ "	১০ "	১০ "	গরমে	পেটের অসুখে উপকারী
লকেট	১৫ "	৮ "	৩ "	গরমে	টক মিষ্টি ফল। কলমী চারা দরকার
লিচু	১০।১২ "	৭ "	৪ "	গরমে	চুনা মাটিতে হয়
লেবু	২ "	২।২½ "	১।২ "	সারাবছর	পাতি, কাগজী, সরবতী, গোড়া নানাজাত
সুপুরী	৮।১০ "	৩ "	৭ "	শরৎ ও শীতে	পাঁকমাটি সার হিসেবে কাজ দেয়
ক্ষীরণী	৮।১০ "	৮ "	১৫ "	গরমে	গাছ খুব ধীরে ধীরে বাড়ে

(১৭) একটা মাঝারী সাইজের ধারালো দা বা কাটারী (১৮) শাবল (১৯) ছোট গাঁইতি (২০) খানিকটা নারকোল ছোবড়া ও দড়ি।

● **ব্যাস!**

জমি, বাড়ী, ঘর সাজানো মায় বাগান অবধি সব জমজমাট। আর কি! এবার শুভ দিন দেখে গৃহপ্রবেশ করে ফেলুন। উৎসবের দিনে এই হতভাগাকে ভুলবেন না যেন। ছেরাদ্দে খাওয়া গুরুর বারণ। বাকি এই একটাই উৎসব যাতে গাঁটের কড়ি না খসিয়েও চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সেঁটে আসা যায়।

মধ্যবিত্তের বাড়ী ঃ নকশার অ্যালবাম

এটি তৃতীয় সংস্করণের একটি বিশেষ সংযোজন। গৃহীর গাইড (১ম খণ্ড)-য়ের প্রথম প্রকাশনা ১৯৮২ সালে। এরপর ছ' বছর কেটে গেছে। এই ছবছরে শতাধিক পাঠকের চিঠি পেয়েছি…বাস্তবে গড়ে উঠেছে, এমন কিছু ভাল নকশা গৃহীর গাইডের পরবর্তী সংস্করণ বা পরবর্তী খণ্ডে সংযোজনের অনুরোধ জানিয়ে। ইতিমধ্যে প্রায় একশ পাঠক সুযোগ দিয়েছেন তাঁদের বাড়ীর নকশা তৈরী করারও। এই দুয়ে মিলিয়েই এই নকশার অ্যালবাম।

এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিমত, এ ধরনের অ্যালবাম অবশ্য সরাসরি আপনার বাড়ীর জন্য নক্শা সরবরাহ করতে পারবে না কারণ আপনার সঙ্গতি, আপনার চাহিদা, আপনার রুচিবোধ একান্ত ভাবেই আপনার নিজস্ব। আপনার আঙ্গুলের ছাপের মত এগুলি অন্য কোন মানুষের সঙ্গতি, চাহিদা ও রুচিবোধের সাথে হুবহু মিলে যেতে পারে না। কাজেই এক্ষেত্রে বেশ স্থির নিশ্চিত ভাবেই বলে দেওয়া চলে যে অন্যের ফরমাসী নকশায় আপনার প্রয়োজন ষোলআনা মিটবে না।

তবু পাঠকের অনুরোধ মেনে নিয়ে পরের বারো পৃষ্ঠায় চৌদ্দটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ির নকশা এলবাম ভুক্ত করা হল। গত ছ' বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব মধ্যবিত্ত পাঠকের বাড়ির নকশা প্রস্তুত করেছি আমাদের ৭এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের অফিসে তার থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই চৌদ্দটি নকশা। বেছে নেওয়ার মাপকাঠি অবশ্যই নকশার শ্রেয়তা নয়। সে ভাবে কোন পাইকারী হারের গ্রেডিং করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বাড়ীওয়ালার নিজস্ব আর্থিক ও মানসিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সঠিক ভাবে খাপ খেয়ে যাওয়াতে প্রত্যেকটি বাড়ীর মালিকের কাছে তাঁর নকশাটিই শ্রেষ্ঠ। এই চৌদ্দটি নকশাই বাঙ্গালী মালিকের ; বাড়ীগুলি পশ্চিমবঙ্গেরই কোন না কোন জেলায় অবস্থিত। নির্বাচনের সময় নজর দেওয়া হয়েছে নানা ধরনের প্রযুক্তিগত বৈচিত্র্যের দিকে। যেমন, পরিবারের রকমারী আয়তন, আয়, রুচি ও আর্থিক সঙ্গতি। যেমন, হরেক রকম মাপের ভিন্নমুখী ও ভিন্ন আকৃতির জমি। যেমন, বিভিন্ন ধাঁচের জীবন যাত্রার দরুণ ঘরের সমাবেশে নতুনত্ব

ও বৈচিত্র্য। জগদ্দলের শ্রীনির্মলরঞ্জন মৌলিকের খুব কম বাজেটে চাই বড় পরিবারের উপযোগী পাঁচ ছয় কামরার বাড়ী। বড়িশার অরুণকুমার চ্যাটার্জির ছোট পরিবার। মিঞা, বিবি এবং এককে-বাদ-কভি-নেহি। তবে শোবার ঘরের আলো-বাতাস-আব্রু-নিরাপত্তা ও সর্বোপরি একান্ত পরিবেশ সম্পর্কে তাঁরা বিশেষ সচেতন। অধ্যাপক সুদর্শন রায়চৌধুরীর পরিবারটির মাপ এক হলেও পকেটের মাপ কিঞ্চিৎ খাটো। সরস্বতীর প্রিয়পাত্ররা লক্ষীর কৃপালাভে বঞ্চিত চিরকালই। তাই অধ্যাপক মশাইয়ের বাড়ীটি অনেক বেশী আঁটো সাঁটো। ডঃ এস. কে. সেন বারাসতের নাম করা সার্জেন। কথায় কথায় রুগীকে ফাঁসাচ্ছেন। উভয়ার্থে। তাই বাড়ীতে অপারেশান চেম্বার আবশ্যিক। বহরমপুরের প্রফেসার গুহর বাজেট কম হলেও সৌন্দর্যজ্ঞান বড় বেশী। তাই ছোটোর মধ্যেও বাড়ীটিকে করতে হয়েছে ছিমছাম, নয়ন-লোভন। বালীর পার্থবাবুর চাহিদা বিশাল ড্রইং-ডাইনিং রুম। একই চাহিদা ছিল সরসুনার বিশ্বনাথ বাবুর পুত্র সুব্রতরও। উভয় ক্ষেত্রেই দৃশ্যতঃ হলের মাপ বড় করতে সিঁড়িটাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে তার সাথে। বিশ্বনাথ-বাবুর রান্নাঘর কমপ্লেক্সটিও নজর করবেন। অনেক মাথা ঘামিয়ে, বিস্তর বখেড়া মেটাতে হয়েছে এই রন্ধন মহলে। দুটি বাড়ন্ত বাড়ীর নকশাও রয়েছে। কল্যাণীর সুনীল বাবু এবং কোন্নগরের সুদর্শন বাবুর নকশা। বলাগড়ের মানবেন্দ্র ব্যাঙ্কে চাকরী করেন। অফিসের দেয়া ঋণের সাহায্যে খুব কম বয়সে গড়ছেন মনের মত ছোট্ট বাড়ীটি। কম বাজেটে বড় ঘরের মানসিকতার তৃপ্তি সাধনার্থেই অন্যঘরগুলির আয়তন কমিয়ে গৃহকর্তার শয়নকক্ষের মাপ করা হয়েছে ১০´×১৪´ ফুট।

অ্যালবামের বাড়িগুলি প্রায় সম পরিমাণে ছড়িয়ে আছে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলায়। ভৌগোলিক কারণে আবহাওয়ার পার্থক্য কিছুটা নিজস্ব ছাপ ফেলেছে নকশাগুলিতে। খরচের দিক দিয়ে আনুমানিক ব্যয় এক লক্ষ টাকা থেকে তিন লক্ষ টাকা অবধি ওঠানামা করেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে মধ্যবিত্তের আর্থিক সঙ্গতি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু লাখ প্রশ্নের এক প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে সরাসরি যদি নকশা টুকলিফাই না করতে পারেন তা হলে আপনার অ্যালবামটা কোন কম্মে লাগবে ?…খুঁটিয়ে দেখলে আপনি এর থেকে বিস্তর পছন্দসই আইডিয়া পাবেন যা আপনার নিজের নকশায় তাক মাফিক ব্যবহার করে সেটিকে

আরো আকর্ষণীয়, আরো মন-পসন্দ করে তুলতে পারবেন। অনেকটা যেমন আমাদের ঠাকুর্দারা প্রেম করার আইডিয়া নিতেন বঙ্কিমচন্দ্র রবিবাবুর লেখা পড়ে, আমরা নিতাম সুচিত্রা-উত্তমকে দেখে আর আমাদের নাতি নাত-নীরা নেবে—(দুর্ মশাই, সব কথা কি ছাপার অক্ষরে লেখা যায় !)—বুঝে নিন।
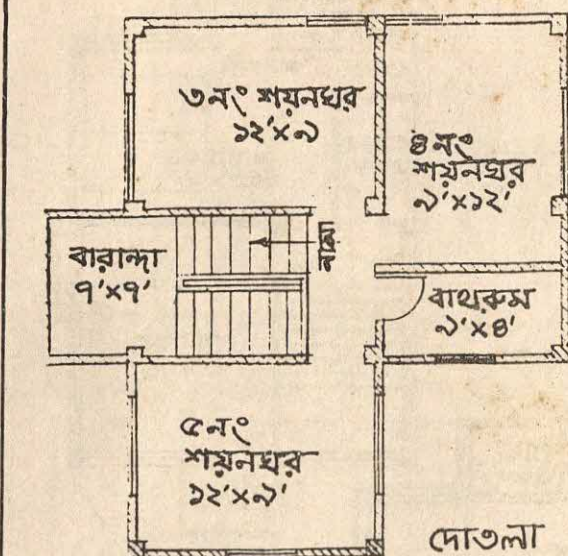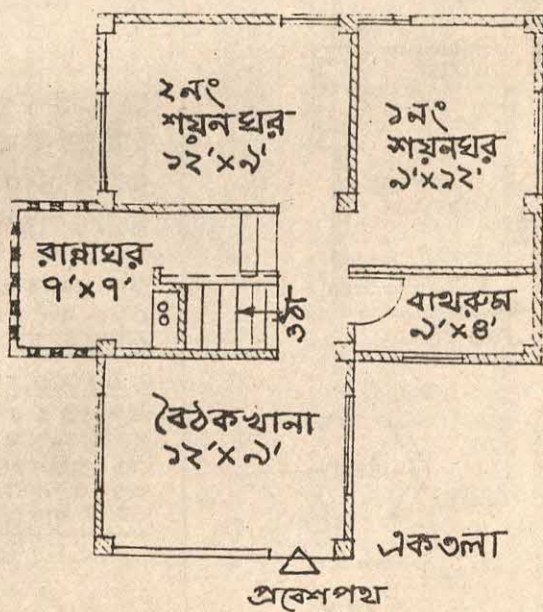
শ্রী নির্মল মৌলিকের বাড়ি, কামালপুর, জগদ্দল, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

প্রতি তলায় ৫৪০ বর্গফুট আয়তনে দেড় লক্ষ টাকার মধ্যে ৫টি শোবার ঘর যুক্ত প্রায় অসম্ভব একটি বাড়ির প্রযুক্তি। দোতলার ছাদ অ্যাসবেস্টসের। ১০"×১০" পিলার যুক্ত ৫" দেওয়াল।

বারান্দা
৬'×৪'
পূজা
৫'×৫'
আলমারী
বাথরুম
৫'×৭'
শয়ন ঘর
১৪'৫"×১০'
সিঁড়ি
সেপটিক ট্যাঙ্ক
স্নান ধোয়ানো উঠোন
টিউবওয়েল
ওঠা
নামা
শয়নঘর
১১'×১৩
আলমারী
পাম্প
৬'×৩'৬"
OO COUNTER
VER
6'×4'
রান্নাঘর
৮'×৬'৬"
খাবার ঘর
১১'×১০'
দোতলার নকশা
বাথরুম
৮'×৫'
পর্দা
আলমারী
ওঠা
বসার ঘর
১১'×১৩'
সিঁড়ির তলায় পার্চ
গেট
১২' ফুট চওড়া রাস্তা
বারান্দা
৬'×৪'
বাগান
৩৪'×১৯'
উত্তর
৬৪'০"
৩৪'০"
১৮' ফুট চওড়া রাস্তা
শ্রী অরুণ কুমার চ্যাটার্জির বাড়ি। পূর্ব বড়িশা, দঃ ২৪ পরগণা ॥
প্রতি তলার আয়তন ৫৮৫ বর্গ ফুট
দোতলার মোট ব্যয় ২,০০,০০০ টাকা
বিশেষত্ব : কর্ণার প্লটের ৭৪% বাগান দিনে প্রধানতঃ এক তলা ও রাতে দো তলার ব্যবহার।

অধ্যাপক কামাখ্যাপ্রসাদ গুহর বাড়ি, ২৬/৩৬ শহীদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।
আয়তন-৯৭৫ বর্গফুট, আনুমানিক ব্যয় ১,২৫,০০০,(১৯৮৫)।

৩৬'-০"
টিউব ওয়েল
৭'-০"
৬'-০"
১১'-০"
শয়নঘর ১১'×১৪' (গৃহকর্তার)
৪'-৬"
রান্নাঘর ৮'×১০'
আলমারী
৭'-৬"
হল ১২'×১৩'
দেয়াল
বেসিন
পায়খানা ৪'×৫'
স্নান ৪½'×৬'
বারান্দা ৪'×১২'
৪৭'-০"
৬'
৬'-০"
শয়নঘর ১৫'×১০'৬" (এ ঘরেই চলবে পঠন-পাঠন)
প্রবেশ
বারান্দা ৪'×১২'
৩৮'-০"
উঃ

প্ল্যানিংয়ের বিশেষত্বঃ কোন ঢালাই পিলারের ব্যবহার নেই অথচ ভিতরের দেয়াল গুলি ৫ ইঞ্চি পুরু পার্টিশান। এতে খরচ ও জায়গা দুয়েরই সাশ্রয়।

রান্নাঘর
১০'×১২'
পাইখানা
খাবারঘর
১২'×১৪'
আলমারী
বাথরুম
৫'×৮'
শয়নঘর
১৪'×১২'
আলমারী
বাথরুম
৫'×৮'
প্রবেশপথ
বসারঘর
১২'×১২'
আলমারী
শয়নঘর
১৪'×১২'
অপারেসান
চেমবার
১৩'×১২'
বারান্দা
১৮'×৬'
উঃ
ডঃ এস. কে. সেনের বাড়ি
৬২,৬৪/১ ৩৬২/৩, যশোর রোড
(উত্তর), বারাসত, উঃ ২৪-পরঃ।
আয়তন : ১৫৭০ বর্গফুট
ব্যয় : কম বেশী ৩ লক্ষ টাকা
গৃহকর্তার
শয়নকক্ষ
১০'×১৫'
ছেলের
শয়নকক্ষ
১২'×১০'
১০"×১০"
পিলার
রান্নাঘর
৬'৬"×৮'
HALL
বারান্দা
৫'×৮'
স্নান
৬'৬"×৪'
বেসিন
পাইখানা
ভবিষ্যত সিঁড়ি
উঃ
বর্তমান আয়তন ● ৬০০ বর্গফুট।
ভবিষ্যত আয়তন ● ৭০০ বর্গফুট।
বর্তমান ব্যয় ● ১১০,০০০ টাকা
আর এক অধ্যাপক সুদর্শন
রায় চৌধুরীর বাড়ি, ৬৬ নং
ডঃ এস. পি. মুখার্জি রোড,
কোন্নগর
বিশেষত্ব ● একটি মাত্র
ঢালাই পিলারের
সাহায্যে ভারসাম্য
রক্ষা করা হয়েছে।
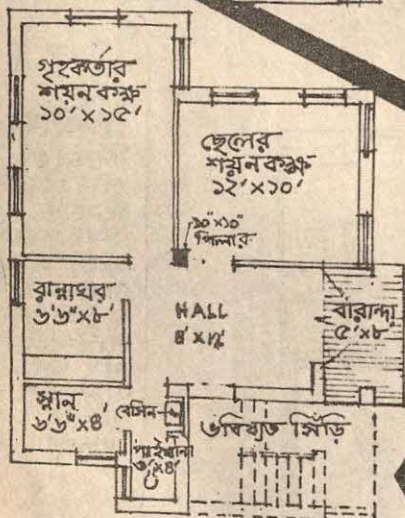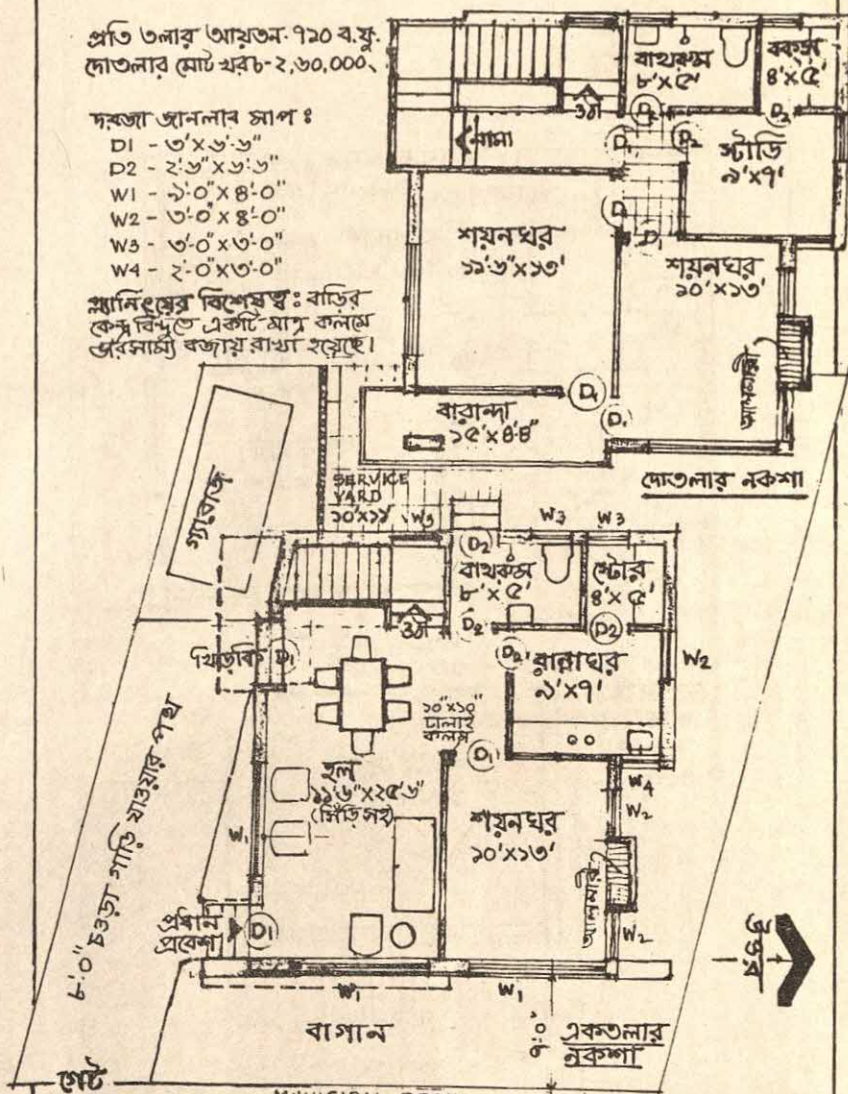
শ্রীপার্থ গোস্বামীর বাড়ি, ৪৯/২ শান্তিরাম রাস্তা, বালী।

বাড়ির মালিক একজন তরুণ বিজ্ঞানী। বাড়িতে প্রচুর পড়াশুনো করেন।
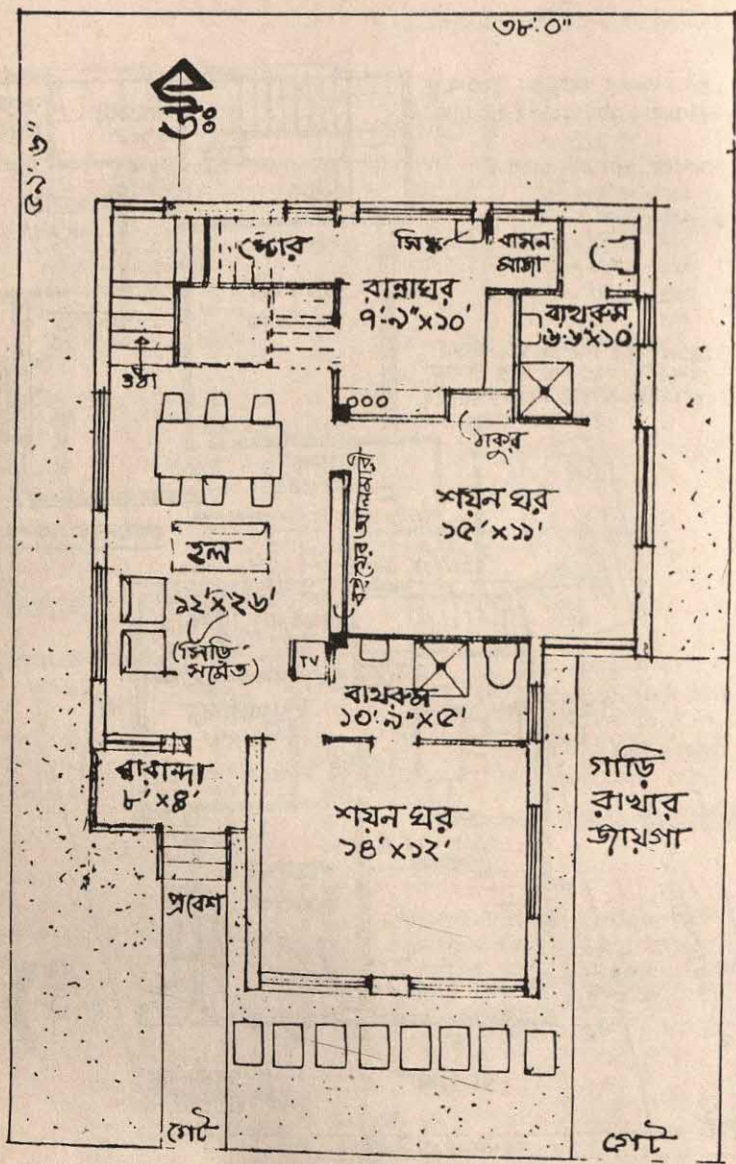
আয়তন ● ১০২৫ ব.ফু
আঃ ব্যয় ● ১,৮৫,০০০৲

২০'-০" চওড়া পথ

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জির বাড়ি, প্লট নং ১৪৩, ক্লাস্টার বি-এ, ফেজ-১, সরসুনা স্যাটেলাইট টাউনশিপ, বেহালা, দক্ষিণ ২৪-পরগণা ॥
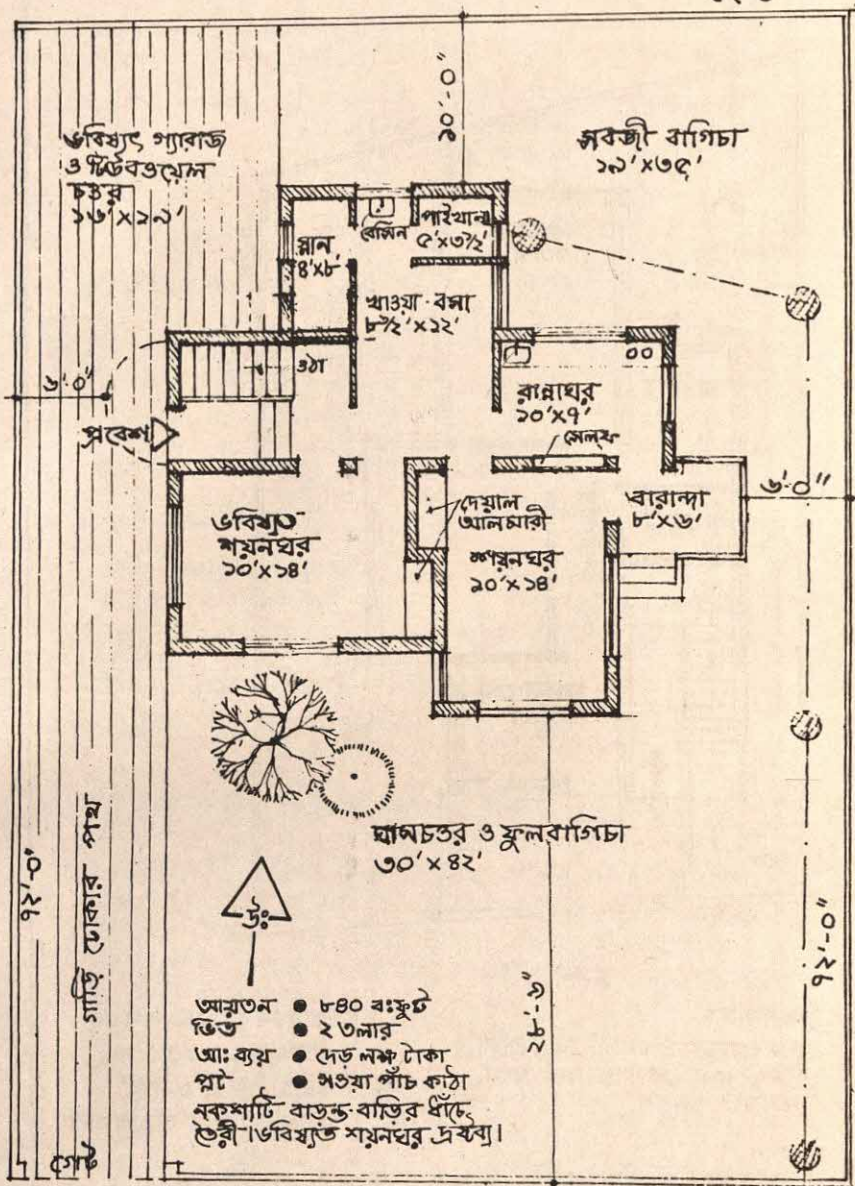
শ্রীসুনীল চৌধুরীর বাড়ি, বি-১০/২০২, কল্যাণী টাউনশিপ, নদীয়া॥

রাস্তা

বিশেষত্ব :
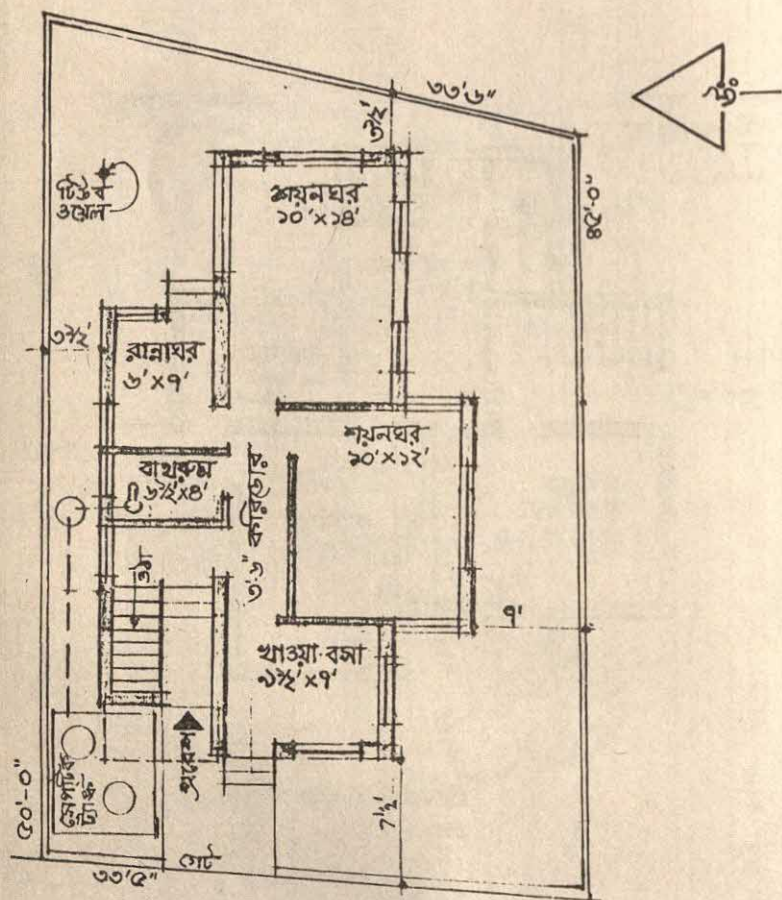
কম খরচের উপযোগী গঠন শৈলী, দক্ষিণ খোলা নকশায় ঘরে আলো বাতাসের প্রাচুর্য।

আয়তন : ৬২৫ বর্গফুট
আ: খরচ : ১.১০.০০০৲
ভিত : ২ তলার
জমি : প্রায় সওয়া কাঠা

শ্রীমানবেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ি, সোমরা, বলাগড়, হুগলী জেলা ॥
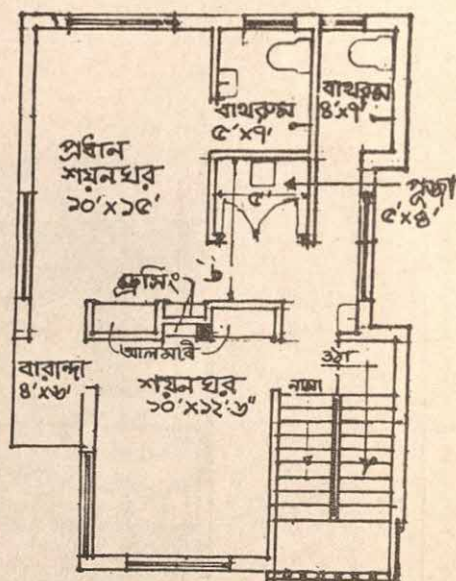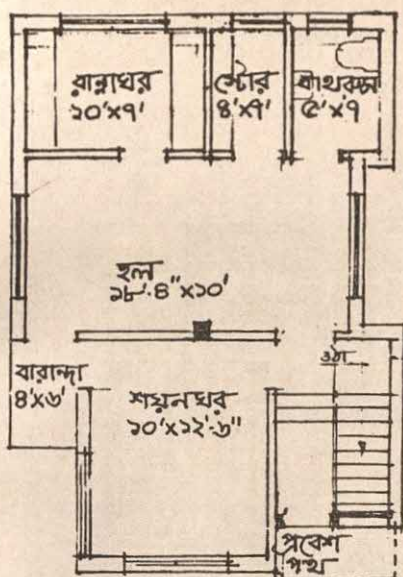
এক তলার নকশা
আয়তন ৬৬৩ বর্গফুট

দোতলার নকশা
আয়তন ৬৬৩ বর্গফুট

সম্পূর্ণ বাড়ির মোট আনুমানিক বর্তমান ব্যয় = ২,৩৫,০০০৲

শ্রী সিদ্ধার্থ সেনের নকশা
ব্রহ্মপুর, টালিগঞ্জ ॥
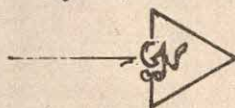
ব্যক্তিগত কারণে শ্রীসেন নকশা করবার পর বাড়ি তৈরী করা থেকে বিরত থাকেন। তা হলেও নকশার নানান বিশেষত্বের জন্য সেটি এখানে ছাপানো হল। এই সব বিশেষত্বের মধ্যে রয়েছে - একটি মাত্র ঢালাই পিলারের ব্যবহার। সমস্ত ঘর দক্ষিণ খোলা, ক্রশ ভেন্টিলেশান যুক্ত, দুদিক খোলা লম্বা হল, পুজার ঘর ও প্যাসেজের সংযুক্তি সম্ভাবনা।

● বাড়িটির সম্ভাব্য চেহারা
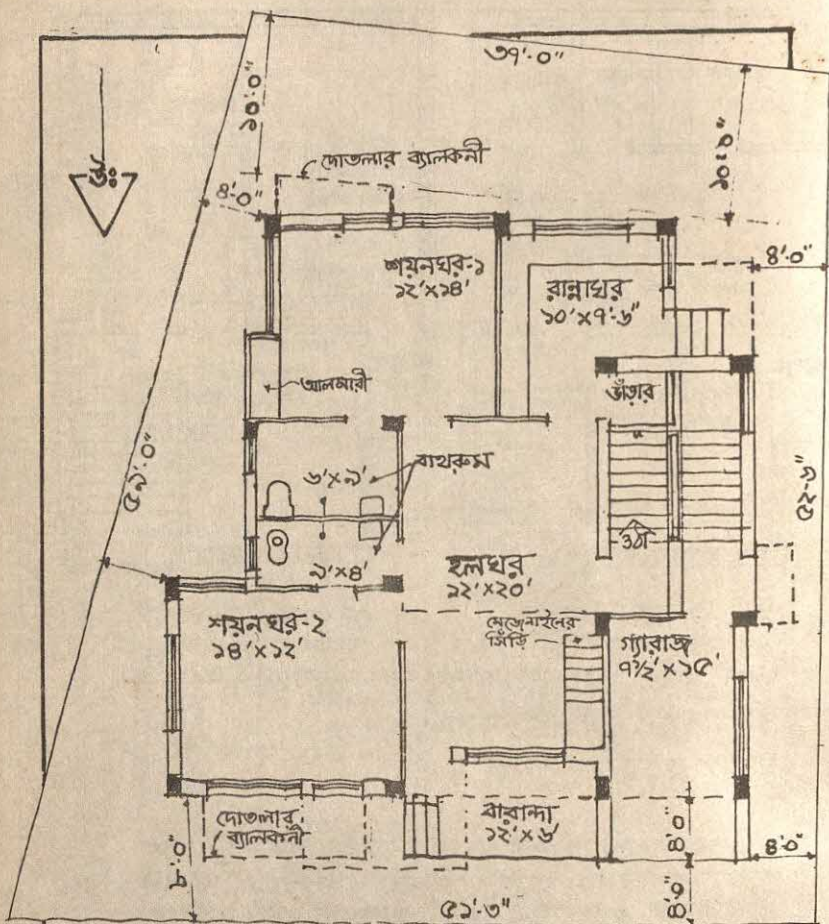
শ্রীমতি ইভা করের ঢালাই পিলারে তৈরী তিনতলা বাড়ি, নন্দন কানন, সন্তোষপুর, দঃ ২৪ পরগণা।

এক তলার নকশা ●●● আয়তন = ১২২০ বঃ ফুট

আঃ ব্যয় = ২,৪০,০০০ টাকা

প্লট = ৩ কাঠা সাড়ে ৬ ছটাক

দ্রঃ ৮৫ সালে তৈরী নকশা/আনুমানিক ব্যয় ৮৮-সালের হারে।

শ্রীসুধীর মুখার্জির বাড়ি, ৭৩বি, ডঃ এস. পি. মুখার্জি স্ট্রীট, কোন্নগর ॥ আয়তন ৯৪৩ বর্গফুট, আনুমানিক খরচ ১,২৩,০০০্ টাকা ॥ জমি কম বেশী আড়াই কাঠা ॥ ভিত ঃ তিন তলার ॥ সব প্রধান ঘর ও বারান্দাই দক্ষিণ মুখী ॥ স্নান-পাইখানার আলাদা মহল ॥
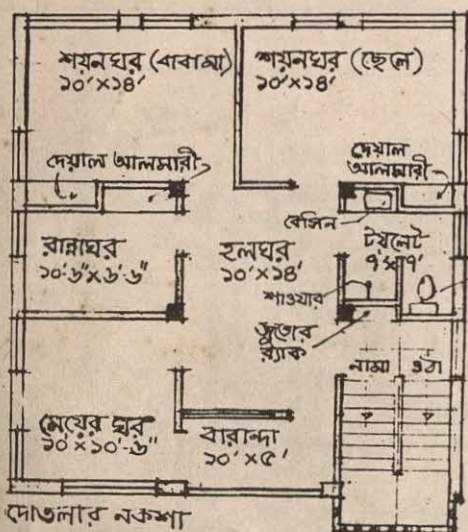
চতুষ্কোণ (স্কোয়ার) নকশায় আয়তনের তুলনায় দেয়ালের বর্গক্ষেত্র হয় সর্বাপেক্ষা কম। হবুচন্দ্র ও গবুচন্দ্রের প্রতিযোগিতা দ্রষ্টব্য। এ ধরনের প্ল্যানের দুটি উদাহরণ ঃ

①

শ্রীমতি গীতা রায়ের বাড়ি, ৭৭/কে, জে. এম. লাহিড়ী রোড, শ্রীরামপুর।

আয়তন ● ৯৪৬ বর্গফুট
আঃ ব্যয় ● ১,৬০,০০০

এবং

SERVICE ENTRY

রান্নাঘর
৭'×৫'৬"
বাথরুম
৭'×৪'৩"
খাবারঘর
১০'×১০'
শয়নঘর
১৪'×১০'
1ST FL. ENTRY
ওঠা
আলমারী
বাথরুম
৭'×৫'
বসারঘর
১০'×১৪'
শয়নঘর
১০'×১৩'
গ্যারাজ
১১'×১৪'
মিটার পাম্প ইত্যাদি
বারান্দা
৪'×৯'
BED
10'×13'
একতলার নকশা
MAIN ENTRY

②
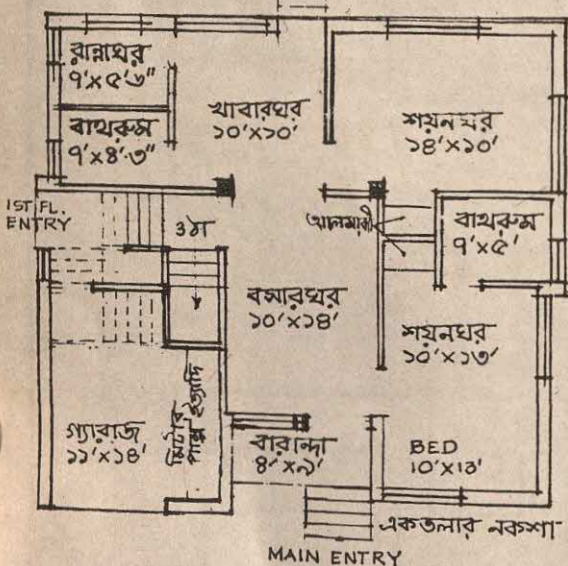
শ্রী দীপ্তি কুমার ঘোষের বাড়ি, ডাঃ হাঃ বাই রোড বেহালা, দঃ ২৪ পর.।

আয়তন ● ১০৭২ ব.ফুট
ব্যয় ● প্রায় ২ লক্ষ টাকা

উঃ

বিশেষত্ব : মালিক ও ভাড়াটের প্রবেশ পথ আলাদা। গ্যারাজ মালিকের।

যে সব বই থেকে সহায়তা পেয়েছি

১. বাস্তু বিজ্ঞান : নারায়ণ সান্যাল—ভারতী বুক স্টল।
২. জল সরবরাহ প্রযুক্তি বিদ্যা : নীহারকান্তি সামন্ত—ভারতী বুক স্টল
৩. শুচি প্রযুক্তি বিদ্যা : ঐ —অশোক পুস্তকালয়
৪. বাঁশ, বেত, পাতা, শোলার কাজ : ননীগোপাল চক্রবর্তী [ঐ]
৫. কাঠ ও কাঠের কাজ (১ম ও ২য় ভাগ) : দ্বারিকানাথ ঘোষ—ভারতী বুক স্টল
৬. পুষ্পবৃক্ষ : ডাঃ এম. এস. রনধবা—ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট
৭. পুষ্পোদ্যান : অমরনাথ রায়—দি গ্লোব নার্শারী
৮. বাংলার সবজি : ঐ ঐ
৯. আদর্শ ফলকর : ঐ ঐ
১০. Water-proof Rendering for Mud walls : National Building Organisation,
১১. Electrical Wiring, Estimating & Costing : Dr. S. L. Uppal—Khanna Publishers
১২. Seminer on L. C. Housing, 1971 : Builders Association of India
১৩. Gobar Gas & Why & How : Khadi and Village Ind. Commission
১৪. Home Maintenance : Martin Sara—Colliers Book
১৫. Planning and Planting Designs of Home Garden : Bhanu L. Desai. I. C. A. R.
১৬. Bye-Laws : West Bengal State Housing Finance Coop. Soc. Ltd.
১৭. Bye-Laws of the Cooperative Housing Society Ltd.

লেখক পরিচিতি

জন্ম ১৯৩৬এ, কোলকাতায়। পিতা স্বর্গীয় সন্তোষকুমার বসু ছিলেন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। স্কুল, কলেজের সব পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ দুর্গাবাবু ১৯৫৯-এ শিবপুর থেকে প্রথম শ্রেণীর স্থপতি ডিগ্রী পান। কৈশোর থেকেই যুক্ত ছিলেন নানান ছাত্র ও যুব আন্দোলনে। '৫৬-'৫৭-তে ছিলেন ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশান অব স্টুডেন্ট আর্কিটেক্টসের কনভেনার। '৫৭-'৫৮ বি. ই. কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি।

১৯৪৮ থেকে '৫৪ অবধি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এন. সি. সি.-র সাথে। '৭২ সাল অবধি কোলকাতা ও দিল্লীর নানান আর্কিটেক্টস অফিসে দায়িত্বশীল পদে কাটিয়ে, ১৯৭৩-এর পয়লা জানুয়ারী থেকে প্র্যাকটিশ করছেন 'দুর্গা বাসু অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটস' নামে। কোলকাতার বুকে অসংখ্য ছোট-বড় বাড়ীর মাঝে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর প্রতিভার ছাপ, স্থপতি হিসাবে তাঁর সুনাম। ১৯৬৯এ লো কস্ট ডিজাইন কম্পিটিশানে ভারত সরকার তাঁকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার দেন।

'৭১ অরোভিলের ভারত নিবাস ডিজাইন প্রতিযোগিতায় মাদারের আশীর্বাদ লাভ করে তাঁর পরিকল্পনা। ওই বছরই ভারতীয় স্থপতি সংস্থা তাঁকে ফেলো রূপে নির্বাচিত করেন। ১৯৭৪-এ অ্যাসোসিয়েট রূপে নির্বাচিত করেন ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইন্টিরিওর ডিজাইনারস। ১৯৭৮-এ কোলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে ভ্যালুয়ার হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৯৭৯-এ ভারত সরকার তাঁকে স্থাবর সম্পত্তির মূল্যায়ক রূপে রেজিস্ট্রেশন দেন।

শিক্ষাজগতের সংগে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। '৭১ থেকে খড়্গপুর আই. আই. টি.-র ভিজিটিং লেকচারার। সম্প্রতি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নিযুক্ত করেছেন স্থাপত্যের পরীক্ষক হিসেবে। উইমেন পলিটেকনিক ও স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিকাল স্টাডিজের সংগে তাঁর যোগাযোগ বহুদিনের। গৌহাটি পলিটেকনিকের পাঠ্য নির্ধারণ কমিটির তিনি ছিলেন সবচেয়ে উৎসাহী সদস্য।

লক্ষ্মীর সংগে সরস্বতীরও চলছে আরাধনা। 'অমৃত', 'ধনধান্যে' ও 'যুগান্তরে' নিয়মিত বেরোয় তাঁর প্রবন্ধ। ছোট বেলায় লিখতেন 'পরিচয়' ও 'বসুমতী'তে। অধুনা প্রকাশিত মাসিক পত্র 'মালিনী'র বিভাগীয় পরিচালক। 'সাজাই গোছাই' বিভাগটি নিয়মিত চালাচ্ছেন একেবারে গোড়া থেকেই। নীরস টেকনিক্যাল বিষয়কে সরস সহজ-পাঠ্য করে তোলার যে সুন্দর সাহিত্যিক-সুলভ ক্ষমতা তাঁর রয়েছে তার প্রমাণ 'গৃহীর গাইড'।